উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা পর্যায়

তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পত্র ৩০৪

মঙ্গলকাব্য ও আখ্যান কাব্য

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:

The Registrar,

University of North Bengal,

Raja Rammohunpur,

P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,

West Bengal, Pin-734013,

India.

Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008

Fax: (0353) 2776313, 2699001

Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in

Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner

whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় – ক

একক ১ - আখ্যান কাব্য বা কাহিনী সম্পর্কে ধারনা

একক ২ - মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে ধারনা

একক ৩ - মনসা মঙ্গল কাব্যধারার পরিচয়

একক ৪ - জগজ্জীবন ঘোষালের মঙ্গলকাব্য

একক ৫ - জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের চরিত্র-রস-ভাষা ও অলংকার

একক ৬ - শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যের পরিচয়

একক ৭ - রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব সংকীর্তন বা শিবায়ন

পর্যায় – খ

একক ৮ - চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার পরিচয়

একক ৯ - মানিক দত্ত ও তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয়

একক ১০ - মানিকদত্তের ক্যাবের বিশিষ্টতা ও স্বতন্ত্রতা

একক ১১ - মানিকদত্তের চন্ডীমঙ্গলের শিল্পরীতি

একক ১২ - ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার পরিচয়

একক ১৩ - ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য

একক ১৪ - ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য বিশিষ্টতা

ঐচ্ছিকপত্র – ৩০৪ মঙ্গলকাব্য ও আখ্যানকাব্য

একক ৮: **চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার পরিচয়-** উদ্দেশ্য, চন্ডী দেবীর উৎস, মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ।

একক ৯: **মঙ্গলকাব্য সম্পর্কে ধারনা-** কবি পরিচয় ও কাব্য রচনা কাল, মানিক দত্তের দেবী চণ্ডীর পরিচয়, মানিক দত্তের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গ, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী নির্মাণ তত্ত্ব, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়।

একক **১০: মানিক দত্তের কাব্যের বিশিষ্টতা স্বতন্ত্রতা-** লোকপুরাণের স্রষ্টা মানিক দত্ত, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলে গৌড়বঙ্গের সমাজজীবন, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র-চিত্রন, চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় মানিক দত্তের স্বতন্ত্রতা।

একক **১১: মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের শিল্পরীতি** - মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের হাস্যরস, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের ভাষা , মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের ছন্দ, মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের অলংকার।

একক ১২: **ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় পরিচয়** - উদ্দেশ্য, ধর্ম ঠাকুরের উৎস ও বৈশিষ্ট্য, ধর্মমঙ্গলের কবিগন, ধর্মমঙ্গল : রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য, ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিকতা, ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যতা।

একক ১৩: **ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য** - কবি ঘনরাম চক্রবর্তী পরিচয়, কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য প্রতিভা, ঘনরামের পৃষ্ঠপোষক ও রচনাকাল, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল গ্রন্থের পরিচয়, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কাব্য নাম ও পালা বিন্যাস।

একক ১৪ **ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্টতা** - ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্র, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কাব্য ভাষা, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ছন্দ, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে অলংকার ও চিত্রকল্প ।

একক ৮ । চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৮.১ : উদ্দেশ্য

৮.২ : চন্ডী দেবীর উৎস

৮.৩ : মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি

৮.৪ : চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

৮.৫ : চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ

৮.৬ : অনুশীলনী

৮.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

৮.১: উদ্দেশ্য

মঙ্গলকাব্য গুলি দেব পূজা এবং ধর্মচিন্তা কেন্দ্রিক আখ্যানকাব্যের এক বিশেষ শাখা। মনসা, চন্ডী, ধর্ম প্রমুখ দেবতার কাহিনী বিভিন্ন আসরে, ঘরোয়া উৎসবে গান করা হত। বিবাহ, সন্তানজন্ম, ফসলের জন্য গৃহের যেকোনো আনন্দ অনুষ্ঠানে এবং দেবতার পূজায় গাওয়া হতো মঙ্গল গান। মঙ্গলকাব্য ধারায় চন্ডীমঙ্গল একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। দীর্ঘকাল ধরে কোন কবিগণ কোন সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন, কিভাবে দেব কথা মানব কথাকে যুক্ত করে জনপ্রিয় আখ্যান গড়ে তুলেছেন- সেই বহু কথিত কবিকাহিনী ও বহু আয়াসসাধ্য গবেষণালব্ধ মঙ্গলকাব্য কথাকেই নতুন করে দেখা আমাদের এই আলোচনার উদ্দেশ্য। এর ফলে বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে জনজীবনের পরিচয় আমাদের সামনে অনেকটা স্পষ্ট হবে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে সৃষ্ট হওয়া চন্ডীমঙ্গল কাব্য গুলি পরবর্তী কবিদের কিভাবে প্রভাবিত করেছে, দেবী চণ্ডীর

উৎস,চন্ডী নামের উৎপত্তি, চন্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও পরবর্তী কবিদের পরিচয়, কাব্যটির চরিত্র বিচার, সমাজ চিত্র ও কবিদের প্রতিভা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবগত করাই এই এককের মূল উদ্দেশ্য।

৮.২: চন্ডী দেবীর উৎস

দেবী চণ্ডী (চন্ড + ঈ) দুর্গার রূপবিশেষ । মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্যকথাকেও চণ্ডী বলা হয়। এখানে অবশ্য চণ্ডী বলতে দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকাকেই বোঝান হয়েছে। চণ্ড নামে দানব বিশেষকে বিনষ্ট করেছেন বলেই তিনি চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণের আনুমানিক রচনাকাল খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক। ঐ গ্রন্থের মধ্যে চণ্ডীর বিষদ পরিচয় আছে । অবশ্য তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কালের রচনা মহাভারতেও চণ্ডী নামের উল্লেখ আছে । আবার উৎসের সন্ধানে প্রাগার্য সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রকৃতি পূজায় অনেক গবেষক পৌঁছেছেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চণ্ডীর মিল আবিষ্কার করেছেন ।

বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য থাকলেও নারীশক্তির পরিকল্পনা সেখানে আছে । দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত ইত্যাদির মধ্যে নারীশক্তি বা নারীদেবতার অস্তিত্ব প্রমাণিত। বিভিন্ন উপনিষদ ও আরণ্যক শাস্ত্রেও নারীদেবতার উল্লেখ আছে । তবে পুরাণ সাহিত্যে আমরা, নারীদেবতার প্রাধান্য লক্ষ্য করি। বৈদিক নারীদেবতারা প্রধানা নন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ঋকবেদের দশম মণ্ডলে অরণ্যানী দেবীর কথা আছে । ঐ দেবীকে ‘মৃগাণাম মাতরম্’ বলা হয়েছে । কোন কোন পণ্ডিত মনে করেছেন অরণ্যানীই বহু শতাব্দীপার হয়ে নানা কবি- কল্পনার রঙে ডুবে ও নানা লোকভাবনার পাকে জড়িয়ে চণ্ডীমঙ্গলের দেবী মঙ্গলচণ্ডীরূপে দেখা দিয়েছে ।

শুধুদ্রাবিড় সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতিতেও চণ্ডীদেবীর মত নারী-দেবী পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় । বৌদ্ধ দেবী তারা, মারীচী, বা পর্ণশবরী, হারীতী, চুণ্ডা প্রভৃতির সঙ্গে চণ্ডীদেবীর মিল লক্ষ্য করা যায় । চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় । চণ্ডিকা যেমনঃ পৌরাণিক শিবের গৃহিনী, তেমনি কিরাতের দেবী, আবার বৌদ্ধদের মারীচী বা

পর্ণশবরী। মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী যে এক মিশ্রদেবী এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" গ্রন্থে প্রচুর তথ্যের উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন লোকায়ত সংস্কার বিশ্বাসী বাঙালি এবং নিকটবর্তী অনার্য শ্রেণির মানুষেরা অনুরূপ নানা লোকদের তার পুজো করত। চান্ডী নামে পরিচিত ওরাঁওদের শিকার ও যুদ্ধের দেবীর কথার উল্লেখ করেছেন মঙ্গলকাব্যের গবেষক। কালকেতুর কাহিনি থেকে বোঝা যায় চন্ডী প্রকৃতই পশুকুলের দেবী এবং ব্যাধ জাতির মানুষরা এই দেবী চন্ডীর উপাসক। কিন্তু ধনপতির গল্পের মধ্যে চন্ডীর সঙ্গে ব্যাধ অথবা পশুকুলের যোগ নেই। এখানে তিনি "যোষিতামিষ্ট দেবতা"। মেয়েদের তুষ্টিবিধাত্রী দেবী চণ্ডী। তিনি এখানে হারানো জিনিস ফিরে পাবার দেবতা । কালকেতুর কাহিনির মধ্যে দেবী যেন অরণ্যের রক্ষাকর্ত্রী। ধনপতি সওদাগরের গল্পের ক্ষেত্রে চণ্ডী যেন গৃহস্থ ঘরের কল্যাণসাধিকা দেবী। মনে হয় স্বতন্ত্র দেবপরিকল্পনা থেকে এই উভয় কাহিনির ভিত্তিভূমিটি গঠিত হয়েছে।

ড. সুকুমার সেনের বক্তব্যও লোক-উৎসের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে। ড. সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন "দুইটি কাহিনিরই দেবী কান্তারবাসিনী দুর্গা, তবে একটু তফাত আছে। কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনির মঙ্গলচণ্ডী বনপশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গোধিকা তাঁহার বাহন এবং প্রতীক। ধনপতি খুল্লনার মঙ্গলচন্ডী গৃহপালিনী দেবী। তাঁহার পূজার প্রতীক ঘট বা ঝারি এবং উপকরণ আটগাছি দুর্বা ও আটটি ধান। ইনি হারানো বস্তুকে ফিরে পাওয়ার দেবী। খুল্লনা এই দেবীকেই পুজো করে প্রথমে হারানো ছাগলটিকে ফিরে পায়, পরে ফিরে পায় নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ও পুত্রকে।" চন্ডীর লোক-উৎসবের তত্ত্বটিই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়। বাংলাদেশের ব্রত-আরাধনায় চণ্ডী ও মঙ্গলচন্ডীর প্রচুর নাম পাওয়া যায়। এদের মধ্যে নাটাই চন্ডী, গোর চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভ চণ্ডী বা সুবচনী, কলাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী এবং আরও অনেক নাম পাওয়া যায়। ড. ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর 'বাংলাসাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "এই ব্রতের পদ্ধতি এবং লক্ষ্য একান্তভাবেই অবৈদিক

অব্রাহ্মণ্য অস্মার্ত অপৌরাণিক।" তবে কমলে কামিনীর বৃত্তান্তে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গজলক্ষ্মীর কথাই মনে পড়ে। গজলক্ষ্মীর রূপটি অনেকটা লৌকিক রূপ লাভ করে লোকসমাজের দেবীর সঙ্গে মিশে যায়। দেবী হাতি গ্রাস করে আবার তা উদগীরণ করে দিচ্ছেন, শাস্ত্রীয় মনোভঙ্গী দিয়ে দেখলে এটি দেবীর সৃজন ও সংহার শক্তির রূপক, তবে প্রকাশভঙ্গি কতকটা 'লোককল্পনাসম্মত। ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য "অরণ্যানীই বহু শত শতাব্দের পথ বাহিয়া নানা কবিকল্পনার রঙে ডুবিয়া ও নানা লোকভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে চন্ডীমঙ্গলের অধিদেবী মঙ্গলচন্ডীরূপে দেখা দিয়েছিলেন । চন্ডীমঙ্গলে বন্দিত দেবী মুখ্যত অভয়া। মনসার মতো তিনি ক্রুর ও হিংসাপরায়ণ নন।

দেবী চন্ডীর পৌরাণিক রূপের পরিচয় মুকুন্দের কাব্যে পাওয়া যায় ঠিকই, তবে তিনি যে ব্যাধ ও অনার্যের দেবী সেকথা অস্বীকার করা যায় না। তিনি প্রথমে ব্যাধসমাজে পূজিতা হয়েছেন, পরে বণিক পরিবারের নারীসমাজে পূজিতা হয়েছেন। ছোটনাগপুরের উপজাতিদের উপাস্যা দেবী চান্ডীর পূজা এবং নারীসমাজের মঙ্গলচন্ডীর ব্রত এখনও প্রচলিত আছে। চন্ডীদেবীর পরিকল্পনায় মুকুন্দ ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য উভয় সংস্কৃতিরই সমন্বয় ঘটিয়েছেন। দুর্গামঙ্গল, ভবানীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যগুলিতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের আদর্শে যেভাবে দেবীর রূপ পরিকল্পিত হয়েছে, চন্ডীমঙ্গলের দেবীরূপ তা থেকে স্বতন্ত্র। সেগুলিতে তন্ত্র ও মার্কন্ডেয় চন্ডীকে পুরাপুরি অনুসরণ করা হয়েছে। দূর্গামঙ্গল ও ভবানীমঙ্গলের দেবী এবং চন্ডীমঙ্গলের দেবী এক নয়। চন্ডীমঙ্গলের চণ্ডীদেবীর পরিকল্পনায় বিবিধ সংস্কৃতির সমন্বয় আছে। মুকুন্দের কাব্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কবি যদিও দেবীর পৌরাণিক মহিমার কথা উচ্ছ্বসিত ভাবে বহুবার কাব্যমধ্যে বলেছেন তথাপি তাঁর কাব্যের দেবী ভবানীমঙ্গলের ভবানী বা দুর্গামঙ্গলের দুর্গার অনুরূপ নন। মেয়েলী ব্রতকথার চন্ডী, কিরাত পূজিতা চন্ডী ও বৌদ্ধ পর্ণশবরীর সংমিশ্রণ সেখানে আছে। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীদেবী কালকেতুকে মহিষমর্দিনী রূপে দেখা দিয়েছেন আবার কলিঙ্গ রাজের স্বপ্নে তিনি চামুন্ডারূপ ধারণ করেছেন। কিন্তু তিনি যে অরণ্যের পশুদের ত্রানকর্ত্রী সেকথা উল্লেখ করতে কবি ভোলেন নি।

৮.৩: মঙ্গলচণ্ডী নামের উৎপত্তি

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চন্ডীকে সাধারণভাবে শিবপত্নী চন্ডী বা দুর্গা বলে মনে করা হলেও চন্ডীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু ধারণাই বর্তমান। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ থেকেই স্ত্রী দেবতার বা মাতৃকা শক্তির পুজা প্রচলিত আছে। বেদ উপনিষদ-এ উমা, হৈমবতী, কাত্যায়ণী, কন্যাকুমারী প্রভৃতি শক্তিরূপা দেবীর উল্লেখ আছে। মহাভারতের যুগে দেবী দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুরবিনাশিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এ দেবী চন্ডীর বর্ণনা আছে। তবে তা প্রধানত দেবী দুর্গা রূপেরই বর্ণনা। এই গ্রন্থের দেবী মাহাত্ম্য অংশ বা ‘দুর্গাসপ্তশতী’ অংশই ‘চন্ডী’ নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। এখানে দেবী দুর্গাই চন্ডী নামে অভিহিত।

দশম শতাব্দী থেকে দেবী চন্ডীকার প্রভাব ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে লক্ষ করা গেছে। চন্ডীর কিছু প্রাচীন মূর্তিও পাওয়া যায়। চন্ডী ও দুর্গা দুই পৃথক দেবীকে ক্রমে অভিন্নরূপেই পাওয়া গেছে পুরাণ ও সাহিত্যে। তবে চন্ডীমঙ্গল এর চন্ডী অনার্য সমাজ থেকে উদ্ভুত বলেই মনে করা হয়। ‘চণ্ডী’ শব্দটি অষ্ট্রিক ভাষার শব্দ।

ছোটোনাগপুরের আদিবাসী ওরাওঁ জাতির ভাষায় ‘চাণ্ডী’ নামে এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। ইনি শিকারের ও যুদ্ধের দেবী। কালকেতুর কাহিনিতে এই দেবীকেই দেখা যায়। ইনি আবার পশুদেরও দেবী। অভয়া গোধাবাহনা। পশুদের যেমন রক্ষা করেন তেমনই মেয়েদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন। তাঁর পুজা করলে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায়। এখানেই তিনি মঙ্গলচন্ডী। প্রথমে নারী সমাজের ব্রতকথায় ছিলেন, পরে বণিক সমাজে পূজা পেয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন।

৮.৪: চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

চন্ডীমঙ্গলের তিনটি কাহিনি আছে। 'দেবখন্ড'-এ আছে শিব কাহিনি। দক্ষ যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় গৃহে উমার জন্ম, উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ কথা এই অংশের

বিষয়। 'নরখন্ড'-এ আছে দুটি কাহিনি- 'আখেটিক খন্ড' ও 'বণিক খন্ড'। কাব্যের কাহিনিটি গড়ে উঠেছে এভাবে- দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনে শিবপত্নী সতী দেহত্যাগ করে আবার উমা-পার্বতীরূপে হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্মেও তিনি শিবকেই পতিরূপে লাভ করেন। পার্বতীকে বিবাহের পর শিব স্বশুরগৃহে ঘরজামাইরূপে অবস্থান করেন। এখানে মা মেনকার সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে কন্যা পার্বতী স্বামীসহ কৈলাসে চলে যান। শিব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের সংসারে অভাব নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলে দু'জনেই যার যার মতে সংসার ত্যাগ করতে চান। তখন পার্বতীর সখী পদ্মাবতী দেবীকে মর্তলোকে পুজা প্রচার করতে উপদেশ দেন। তদনুযায়ী পার্বতী মহাদেবকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন শাপ দিয়ে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে মর্তালোকে পাঠিয়ে দেন-তিনিই মর্তালোকে দেবীর পূজা প্রচার করবেন। মহাদেবও নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। এই পর্যন্ত 'দেবখণ্ড”। নীলাম্বর মর্ত্যে ব্যাধসন্তান কালকেতুরূপে এবং নীলাম্বরপত্নী ছায়া ব্যাধকন্যা ফুল্লরারূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাদের বিয়ে হয়। এদিকে দেবী চণ্ডী মর্ত্যে প্রথম পুজা গ্রহণ করেন কলিঙ্গ- রাজের। তারপর বনের পশুদের পূজা গ্রহণ করে সিংহকে পশুদের রাজা করে দিয়ে তাদের অভয় দান করেন। এদিকে কালকেতু শিকার করতে গেলে বনের পশুদের মধ্যে ভয়ানক ত্রাসের সঞ্চার করে। দেবী সুবর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ ক'রে কালকেতুকে ছলনা করেন। কালকেতু গোধিকাকে ঘরে নিয়ে এলে দেবী প্রথমে ষোড়শীরূপে এবং পরে মহিষমর্দিনীরূপে দেখা দিয়ে কালকেতুকে প্রচুর ধন পাইয়ে দিয়ে তাকে গুজরাট বন কেটে রাজা হতে নির্দেশ দান করেন। সেখানে দেবীর দেউল নির্মিত হল এবং মর্ত্যলোকে দেবীর পুজা প্রচারিত হল। এই পর্যন্ত 'আখেটিক পর্ব'।

এরপর দেবীর ইচ্ছা হলো- তিনি নারীর এবং বণিক সমাজের পূজা গ্রহণ করবেন। এই উদ্দেশ্যে গন্ধর্বকে শাপগ্রস্ত করে ধনপতি সদাগর ও তৎপত্নীকে ফুল্লরা রূপে মর্ত্যলোকে প্রেরণ করেন। এটি ‘বণিক পর্ব'। দেবী এখানে প্রথমে মঙ্গলচন্ডীরূপে এবং শেষ পর্যায়ে কমলে-কামিনী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই কাহিনিটি কালকেতু কাহিনি

অপেক্ষা অনেক বেশি বিস্তারলাভ করেছে। কালকেতু কাহিনির মধ্যে কোন সংযোগ-সূত্র নেই- একমাত্র চন্ডীর নামটি ছাড়া। উভয় কাহিনিতে চন্ডীর প্রকৃতিও ভিন্ন তবে তার উপকার করবার ইচ্ছা উভয়ত্র বর্তমান।

৮.৫: চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ

দ্বিজ মাধব :

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ মাধবের পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তির কারণ রয়েছে। মধ্যযুগে মাধব নামে একাধিক কবি বর্তমান ছিলেন- কেউ 'দ্বিজ মাধব', কেউ বা 'মাধবাচার্য', আবার একই ব্যক্তি উভয় নাম ব্যবহার করতেন কিনা, তা-ও নিশ্চিতভাবে জানবার উপায় নেই। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কৰি দ্বিজ মাধব আত্মপরিচয়সূত্রে বলেছেন-'পরাশর পুত্রজাত মাধব যে নামে'| আবার 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' রচয়িতা মাধবাচার্যও পরিচয় দিয়েছেন-

'পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার ।

মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার।।'

জন্মস্থানরূপে কবি নবদ্বীপের কথা উল্লেখ করেছেন, কোন গ্রন্থে নবদ্বীপ-স্থলে সপ্তগ্রামের নাম পাওয়া যায়। মাধবাচার্যের বংশধরদের নিকট 'মাধববংশতত্ত্ব' নামক যে কুলপঞ্জিকা আছে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কবি মাধব গঙ্গাতীর থেকে বাস উঠিয়ে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার কবি-পরিচয় মেঘনা তীরে বাসভূমি স্থাপন করেছিলেন। 'গঙ্গামঙ্গল'-রচয়িতারূপেও এক মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধব-রচিত চন্ডীমঙ্গলের যাবতীয় পুথি পাওয়া গেছে চট্টগ্রাম অঞ্চলে- নবদ্বীপ সপ্তগ্রাম বা ময়মনসিংহ অঞ্চলে কোন পুথি পাওয়া যায়নি। অতএব কোন মাধব চন্ডীমঙ্গল রচনা করেন এবং তাঁর বাসস্থান কোথায় ছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভবপর নয়।

দ্বিজ মাধব কোনকালে বর্তমান ছিলেন তা নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকে আছে-

‘ইন্দুবিন্দুবাণধাতা শক নিয়োজিত।

দ্বিজ মাধব গাত্র সারদাচরিত।।’

এ থেকে তারিখ পাওয়া যায় ১৫৯১ শকাব্দ বা ১৫৭৯ খ্রী। গ্রন্থের অন্যত্র আছে

'পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।

একাব্বর নামে রাজা অর্জুনাবতার।।’

উক্ত সালে আকবর সিংহাসনাসীন থাকলেও পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়নি, অতএব কোথাও একটা গোঁজামিল থাকা সম্ভব। ডঃ সুকুমার সেন পূর্বোক্ত ‘ইন্দু-বিন্দু-বাণধাতা'- স্থলে ‘ইন্দুবিন্দুদানদাতা’ পাঠ গ্রহণ করে কবির কাব্য রচনাকাল নির্ণয় করেছেন ১৬৪৪-৪৭ খ্রী:। কিন্তু এতে আকবরের সঙ্গতি থাকে না এবং কাব্যের কতকগুলি অভ্যন্তর লক্ষণের জন্য একে অর্বাচীন বলেও মনে হয় না। অতএব অধিকতর প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রী: বলেই গ্রহণ করা সঙ্গত।

কবি দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যের নাম বলেছেন ‘সারদাচরিত' বা ‘সারদামঙ্গল'। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এটি ‘সুকবি মাধবাচার্য-বিরচিত জাগরণ’ নামক ব্রতকথা বা পাঁচালি জাতীয় গ্রন্থরূপে বহুল প্রচলিত। মাধবের কাব্য-পাঠে স্পষ্টতই অনুমিত হয় যে কবিকঙ্কণের কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, কাজেই তিনি যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রাগবর্তী- এই অনুমান যথার্থ হওয়াই সম্ভব। সাধারণভাবে কাহিনীর দিক থেকে কবিকঙ্কণের কাব্যর সঙ্গে এর বিশেষ পার্থক্য নেই। এতেও তিনটি খণ্ড দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড এবং বণিকখণ্ড আছে। তবে এতে একটি অতিরিক্ত কাহিনি যুক্ত হয়েছে- দেবী চন্ডী-কর্তৃক মঙ্গলাসুর বধ এবং এই কারণে 'মঙ্গলচন্ডী' নাম লাভ। এতে কালকেতু কাহিনি এবং ধনপতি কাহিনি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে আর কাব্যের শেষাংশে তত্ত্ব কথার ব্যাখ্যা অহেতুক বিস্তারলাভ করেছে। কাহিনী নির্মাণে কবি উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিতে না পারলেও বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি পরিচয় দিয়েছেন, তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তার বাস্তবচিত্র যে কবিকঙ্কণ অপেক্ষাও বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থাপিত

হয়েছে, তার দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে কালকেতু ফুল্লরাকে সংসার-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে বৃদ্ধবয়সে কালকেতুর পিতা-মাতা ধর্মকেতু-নিদয়া কাশীবাসী হলেন এবং তাদের ভরণ-পোষণের জন্য কালকেতু মাসে মাসে টাকা পাঠাতো। একজন ব্যাধের পক্ষে এ জাতীয় জীবনযাপন কি বিশ্বাস যোগ্য ? পক্ষান্তরে দ্বিজ মাধব দেখিয়েছেন কালকেতুর বিবাহের পর সংসার বৃদ্ধি পাওয়াতে পিতা ধর্মকেতু জীবিকা সংগ্রহের জন্য অরণ্যে গিয়ে সিংহের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। ব্যাধ-জীবনের সঙ্গে এই পরিণামই তো অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ কবি দ্বিজ মাধব তথ্যানুসন্ধনী দৃষ্টি নিয়ে জীবনকে দেখেছেন এবং সেই দৃষ্টিতেই কাব্যখানি রচনা করেছেন বলেই এর বাস্তবতা এত প্রখর হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি অসাধারণ কোন নৈপুণ্য দেখাতে না পারলেও তাঁর অঙ্কিত ভাড়ু দত্ত অতিশয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তার কুটবুদ্ধি, চাতুরী এবং বঞ্চনার চিত্রের মতই তার অপরাধ এবং শাস্তি বিধানের কাহিনীও সমভাবেই কৌতুকোদ্দীপক। দেবী চণ্ডী অনার্য সমাজ থেকে আগত হলেও কবিকঙ্কণ তাকে আর্যকল্পনার পৌরাণিক ছদ্মবেশে উপস্থিত করেছেন, কিন্তু দ্বিজ মাধবের কাব্যে দেবী যথাযথভাবে অনাযোচিত ভয়ঙ্করী দানবীরূপেই উপস্থাপিত হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রসষ্টিতেও কবি আনুপূর্বিক সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করলেও তা কবিকঙ্কণের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। দ্বিজ মাধবের দুর্ভাগ্য যে তাকে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল বলেই তাঁর তুলনায় নিষ্প্রভ প্রতিপন্ন হয়েছেন। কবিকঙ্কণকে বাদ দিয়ে অপর যে কোন মঙ্গলকাব্যকারের তুলনায় তাঁর প্রতিভা যে কোন অংশেই ন্যূন নয়, এ কথা নিঃসংশয়ে প্রকাশ করা চলে। কবিকঙ্কণকে যদি শিল্পী কবি আখ্যা দেওয়া যায়, তবে দ্বিজ মাধব স্বভাবকবির মর্যাদা অবশ্যই পেতে পারেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীকবিরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকেন কবিকঙ্কন মুকুন্দ চক্রবর্তী। অথবা অন্যতম কবি না বলে তাঁকেই মধ্যযুগের প্রধানতম কৰি বলে চিহ্নিত করা চলে, যিনি একটি লোককাব্যধারাকে রূপ দিয়েও মৌলিকতায়,

চরিত্রচিত্রণে, বাস্তব রস সৃজনে এমনকি উপন্যাসিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশে আধুনিক সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছেন।তাঁর গ্রন্থে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায়, মানসিংহ যখন বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার ছিলেন, তখন ডিহিদার মামুদ সরীফের অত্যাচার-আশঙ্কায় কবি পিতৃপুরুষের ভিটা দামুন্যা ত্যাগ করে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণভূমি আরবার রাজা বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ এবং রাজা রঘুনাথের অনুরোধেই কবি তাঁর চণ্ডী মঙ্গল কাব্য রচনা করেন।মানসিংহ ১৫৯৬ খ্রিঃ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন-অতএব কবির স্বীকারোক্তি-অনুযায়ী তিনি এর পর দামুন্যা ত্যাগ করেছিলেন। গ্রন্থ রচনাকাল আরো কিছু বিলম্বিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই অনুমান করা চলে যে, কবিকঙ্কন সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকেই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন; কবিকঙ্কণের কোন কোন পুঁথিতে গ্রন্থ রচনাকাল-বিষয়ক একটি শ্লোকে আছে-

‘শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্কগণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা।।'

এতে তারিখ পাওয়া যায় ১৪৬৬ শকাব্দ (১৫৪৪ খ্রিঃ) অথবা ১৪৯৯ শকাব্দ (১৫৭৭ খ্রিঃ) কিন্তু একালে আকবরের সুবেদার মানসিংহকে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া কবিকঙ্কন মুকুন্দ রচিত 'বাসুকীমঙ্গল' ক্যাবে এই শ্লোকটি বর্তমান থাকায় অনুমান করা হয় যে নাম-সাদৃশ্য শ্লোকটি কবিকঙ্কণের গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পারে।

কবি গ্রন্থের নাম বলেছেন 'অভয়ামঙ্গল'। গ্রন্থটি অপরাপর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতোই তিনটি খণ্ডে বিভক্ত-দেবখণ্ড, আখেটিক খণ্ড এবং বণিক খণ্ড। কাহিনী গতানুগতিক, তাতে মৌলিকত্ব প্রদর্শনের কোন সুযোগ না থাকলেও কৰি ঘটনা-বর্ণনায়, চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দেবখণ্ডে তিনি হরগৌরীর জীবনযাত্রার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে দৈবী মহিমা ক্ষুণ্ণ হলেও তা মানবিক মহিমায় সমুজ্জ্বলতা লাভ করেছে। বস্তুত এই জীবনযাত্রায় নিম্নবিত্ত বাঙালী গৃহস্থ ঘরের যে চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে, ঐতিহাসিকদের পক্ষেও এমন

নিখুঁত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর নয়। বস্তুত এই বাস্তবতার জন্যই কবিকঙ্কণের কাব্য এত উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা চলে যে দ্বিজ মাধবের কাব্যেও বাস্তবতা আছে, তা বস্তুসঞ্চয় মাত্র, কবিকঙ্কণ একই উপাদানকে জীবনরসে নিষিক্ত করে বাস্তবরসে পরিণত করেছেন।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর অপর বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে চরিত্রসৃষ্টিতে। তিনি দেবদেবীর চরিত্রেও মানবিকতার সার্থক প্রকাশ দেখিয়েছেন। মানব চরিত্রগুলিকেও মানবিক দোষগুণে সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন তিনি। চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত। বেনে মুরারি শীল তৎপত্রী বেনেনী অতি স্বল্প পরিসরেই এমন বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে, যার তুলনা শুধু একালের ছোটগল্পেই পাওয়া যেতে পারে। ভাঁড়ু দত্তের চরিত্রটিও চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতা এককথায় অনবদ্য। তার পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন এবং কার্যকলাপ একালের সার্থক 'খলচরিত্র'-র সঙ্গেই শুধু উপমিত হ'তে পারে। দুর্বলা দাসীও কবিকঙ্কণের হাতে একটি অতিশয় আকর্ষণযোগ্য চরিত্রে পরিণত হয়েছে। অপরাপর চরিত্রগুলি এতটা স্ফুটোজ্জ্বল না হলেও সেকালের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কবি আখেটিক খণ্ডের নায়ক কালকেতুকে যে ভদ্রবীর করে না তুলে ব্যাধসন্তানরূপেই অঙ্কন করেছেন, তাতে তাঁর স্বাভাবিক বাস্তববুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতুর পরিচয়ে তিনি বলেন

‘শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।

ছোট গ্রাস গেলে যেন তে-আঁটিয়া তাল।'

তেমনি ফুল্লরা তার সখী বিমলার বাড়ি গেলে পর বিমলা যখন বলে-

‘আস্য গো প্রাণের সই বস্যগো বুহিনি।

মোর মাথায় গোটা কত দেখত উকুনি।।'

তখন তার স্বাভাবিকতায় সন্দেহ করবার উপায় থাকে না। সব মিলিয়ে চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁর সার্থকতা-বিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেনঃ “মুকুন্দরাম বিস্ময়কর খুব বৃহৎ বিশাল চরিত্র সৃষ্টি করিতে না পারিলেও সাধারণ, প্রত্যক্ষ, পরিচিতি

ও পাঁচা-পাঁচি বাস্তব চরিত্রাঙ্কনে অসাধারণ কুশলতা দেখাইয়াছেন।"   বাস্তবতাবোধ, চরিত্র-সৃষ্টি ক্ষমতা এবং মানবিকতাবোধের যে পরিচয় কবিকঙ্কন কাব্যে পরিলক্ষিত হয়, এদের অসাধারণ সমন্বয়ের ফলে একালের সমালোচকদের দৃষ্টিতে কবিকঙ্কন- চণ্ডী প্রায় উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। সেকালের প্রখ্যাত মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত কবিকঙ্কনের কাব্য বিষয়ে মন্তব্য করেছেন,"The phought and feelings and sayings of his men and women are perfectly,natural,recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali literature." বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় বলেনঃ "দক্ষ উপন্যাসিকদের অধিকাংশ গুণই তাঁহার ছিল।

এ যুগে জন্মগ্রহন করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।" বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনও এ বিষয়ে অভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন "নিপুণ পর্যবেক্ষণ, জীবনে আস্থা, ব্যাপক অভিজ্ঞতা ইত্যাদি যে সব গুণ ভালো উপন্যাস-লেখকের রচনায় আমরা প্রত্যাশা করি, সে সব গুণ সেকালের পক্ষে যথোচিত পরিমাণে মুকুন্দরামের কাব্য পাই।" মধ্যযুগের একজন কবির পক্ষে এই সমস্ত গুণ তাঁর অসাধারণত্বেরই পরিচায়ক।

কোন কোন সমালোচক মুকুন্দরামকে 'দুঃখবাদী' বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু এই উক্তির পেছনে কোন তথ্যনিষ্ঠ যুক্তি নেই। সত্য বটে, গ্রন্থ রচনায় বাস্তবতার প্রয়োজনে কবি যে কয়টি দুঃখদারিদ্র্যগ্রস্থ জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাদের যথার্থতা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ থেকে কবির জীবনদর্শনের পরিচয় আশা করা মূঢ়তা। তাঁর প্রখর বাস্তবানুভূতির জন্যই দুঃখের চিত্রগুলি এত সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখকেই যে তিনি জীবনের সত্য বলে গ্রহণ করেন নি, তার পরিচয়ও সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর নিজের কিংবা কোন কাহিনীর পরিণামই দুঃখময় নয়। প্রতিটি দুঃখের শেষেই তিনি আশার আলো দেখিয়েছেন। অতএব তিনি যে দুঃখবাদী ছিলেন না, এটিই সত্য। বরং দুঃখ বর্ণনার মধ্যদিয়ে আসলে তিনি জীবনের প্রতি অপরিমিত মমত্বেরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাই অনেকে তাঁকে 'দুঃখবাদী' না বলে, 'দুঃখরসের

কবি’ বলাই সঙ্গত মনে করেন। কবিকঙ্কন সম্বন্ধে সর্বশেষ কথা-তিনি ছিলেন বাঙালী জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। প্রসঙ্গক্রমে হরগৌরীর জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করা চলে। না বলে দিলে এটিকে দেবতার লীলা বলে বোঝার কোন উপায় নেই। এটিকে গদ্যভাষায় রূপান্তরিত করে অনায়াসে একালের ছোটগল্প বলে চালিয়ে দেওয়া চলে। বস্তুত মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে এই যে শাশ্বত বাঙালী জীবনের কাহিনী রচনা করেছেন, এটিকেই তাঁর কবিকৃতির সর্বোত্তম সম্পদ বলে গ্রহণ করা চলে।

অন্যান্য কাব্যকারগণঃ-

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের সংখ্যা একেবারেই মুষ্টিমেয় এব কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী ও দ্বিজ মাধব ছাড়া অন্য কোন কবির রচনাই তেমন উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হয় না।

মাণিক দত্ত:-

কবিকঙ্কন তাঁর কাব্যে মাণিক দত্তকে আদি কবির সম্মান দান করেছেন। এইক্ষেত্রে মাণিক দত্ত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান মতো ত্রয়োদশ শতকের লেখক হতে পারতেন। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করেছে প্রাপ্ত মাণিক দত্তের পুঁথি। মাণিক দত্তের ভণিতাযুক্ত যে পুঁথি পাওয়া যায়, তাতে চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরদের বিবরণ থাকায় ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন, “প্রাপ্ত পুঁথির মাণিক দত্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার লোক না হওয়াই সম্ভব। তিনি খানিকটা পুরানো মালমসলা ব্যবহার করেছিলেন।” অতএব অনুমান করা চলে, প্রাপ্ত পুথির মানিক দত্ত মুকুন্দ কথিত আদি মাণিক দত্ত নন। সম্ভবত এই মাণিক দত্ত প্রথম মাণিক দত্তের রচনা থেকে কিছু উপাদান আহরণ করেছিলেন। এঁর আত্মপরিচয়ে জানা যায় ইনি খঞ্জ ও বধির ছিলেন, দেবী চণ্ডীর বরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। মাণিক দত্তের কাব্যে 'সৃষ্টিপত্তন' অংশে বৌদ্ধপ্রভাব বর্তমান-অনুরূপ বৌদ্ধপ্রভাব একমাত্র সমসাময়িক কালের ধর্মমঙ্গল কাব্যেই লক্ষ্য করা যায়। ভাঁড়ু দত্তকে কবি শিবভক্তরূপে বর্ণনা করেছেন-এরি ফলে তিনি চণ্ডীর কোপে পড়েন এবং পরে দেবী দুর্গার শরণ গ্রহণ করে নিষ্কৃতি লাভ করেন। কবির কাব্যের নাম ছিল ‘ভবানীমঙ্গল’ বা ‘দুর্গামঙ্গল’।

দ্বিজ জনার্দন:-

দ্বিজ জনার্দন-রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি ‘পাঁচালি’ রূপেই পরিচিত। এর মধ্যে ধনপতি সদাগরের কাহিনীই প্রধান কালকেতু কাহিনী এরই অঙ্গীভূত। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেন যে দ্বিজ মাধব-আদি কবিগণ এ জাতীয় কোন কাব্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল।

দ্বিজ রামদেব:-

গ্রন্থে প্রদত্ত রচনাকাল থেকে জানা যায় যে কবি দ্বিজ রামদেব, ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রিঃ তার ‘অভয়ামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থকার সম্ভবত পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্যে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক শতাধিক উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির সমগ্র অংশ এখনও পাওয়া যায়নি।

মুক্তারাম সেন:-

গ্রন্থে প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে বৈদ্যবংশীয় কৰি মুক্তারাম সম্ভবত ১৭৪৭ খ্রিঃ ‘সারদামঙ্গল' গ্রন্থটি রচনা করেন। কবির কোন এক পূর্বপুরুষ যশোহর থেকে চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এঁর কাব্যটি পাঁচালি জাতীয় ক্ষুদ্রকায়-এর ভাষা সরল সহজ, পাণ্ডিত্যবর্জিত।

দ্বিজ হরিরাম:-

দ্বিজ হরিরাম রচিত কাব্যটি আকারে সুবৃহৎ। তিনি বিদ্রোহী শোভা সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন। অতএব সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের সন্ধিকালে বর্তমান ছিলেন তাঁর কাব্যে মুকুন্দরামের প্রভাব সুস্পষ্ট।

ভবানীশঙ্কর:-

১৭৭৯ খ্রীঃ ভবানীশঙ্কর ‘মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা’ নামে নাতিবৃহৎ কাব্যটি রচনা করেন। কবি পণ্ডিত লোক ছিলেন- রচনায় কবিত্ব অপেক্ষা পান্ডিত্যের ভারই ছিল অধিক।

রামানন্দ যতি ও লালা জয়নারায়ণঃ-

রামানন্দ যতি ‘রামায়ণ’ এর লেখক মুকুন্দরামের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে নিজের কাব্যের উৎকর্ষ প্রতিপালনের চেষ্টা করেছেন। লালা জয়নারায়ণ দেবের ‘চণ্ডিকামঙ্গল' কাব্যে কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান ছাড়াও মাধব সুলোচনার আখ্যান আছে। কবি বিক্রমপুরের বৈদ্যবংশজাত। ভবানীশঙ্করের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য পাওয়া গেছে চট্টগ্রামে এই কবির কাব্যটি রচিত হয় ১৭৭৯ খ্রিঃ।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সজীব ধারা শুকিয়ে যায় মুকুন্দর পরেই ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য : “দুঃখের বিষয় মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যসাহিত্যে যে নতুন বাস্তবতার ধারা প্রকাশিত করিয়াছেন, পরবর্তীদের রচনায় তাহাতে আবার চড়া পড়িয়াছে। চণ্ডী , কালিকা ও অন্নদায় রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের কুরুচিপূর্ণ কেলিবিলাসের প্রশ্রয়দাত্রী ও সমর্থনকারিণীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।” চণ্ডীমঙ্গলের পর ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । শিবায়নের উপাখ্যান লোকজীবনসম্ভূত।

৮.৬ : অনুশীলনী

১। দেবী চণ্ডীর উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। মঙ্গল চন্ডী নামের উৎপত্তি কিভাবে হয়- সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। চন্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন কবিদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

১. চন্ডীমঙ্গল- সুকুমার সেন

২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- (প্রথম খন্ড) সুকুমার সেন

৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫. কবি মুকুন্দরাম- ক্ষেত্র গুপ্ত

৬. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- সনৎ কুমার নস্কর

৭. কবিকঙ্কণচণ্ডী- তরুণ মুখোপাধ্যায়

৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা- সুখময় মুখোপাধ্যায়

১০. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- পার্থ চট্টোপাধ্যায়

একক ৯ । মানিক দত্ত ও তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয়

বিন্যাসক্রম

৯.১ : কবি পরিচয় ও কাব্য রচনা কাল

৯.২ : মানিক দত্তের দেবী চণ্ডীর পরিচয়

৯.৩ : মানিক দত্তের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গ

৯.৪ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী নির্মাণ তত্ত্ব

৯.৫ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

৯.৬ : অনুশীলনী

৯.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

৯.১: কবি পরিচয় ও কাব্য রচনাকাল

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যধারার আদি কবি মানিক দত্ত। এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবতী তাঁর 'অভয়ামঙ্গল' বা ‘চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে অগ্রজ কবি মানিক দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে লিখেছেন-

‘মানিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।

যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়।।’

মুকুন্দের এই উল্লেখ থেকে অনুমিত হয়, মানিক দত্ত নামীয় কোনো কবি তাঁর আগে ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যরচনা করেছিলেন এবং কবি মুকুন্দ তা জানতেন।

মানিক দত্ত কোথাকার কবি? এই বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কাব্যের মধ্যে কোনো উল্লেখ নেই। কাব্যের 'বোলাম' অংশে পদ্মা চন্ডীকে মর্ত্যে গীত প্রচারের জন্য ফুলফুল্যা নগরের অধিবাসী কানা খোড়া মানিক দত্তকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে কাব্যের বিষয় বলে দেওয়ার পরামর্শ দেন-

'পদ্মা বোল শুন মা সর্ব্বমঙ্গল।

মানিক দত্ত কানা খোড়া ফুলফুল্যা নগর।।

তাকে স্বপ্ন দেখাহ সব্বমঙ্গল।

তোমার গীত গান করুক পৃথিবী ভিতর।।'

অতঃপর পদ্মার কথামতো দেবী মানিক দত্তের শিয়র দেশে স্বপ্ন দিয়ে কবিকে নিজের গীত প্রচারের কাজে রত হতে বলে তার অঙ্গবিকৃতি সারিয়ে দেন-

'মানিক দত্তের শিরে নাথীকার ঘা।

কানাখোড় দূর গেল দিবব্য হৈল গা।।

চাও বাছা মানিক দত্ত পাএ কর বল।

আমার মঙ্গল পুঁথি শিওর ওপর।।

আমি দুর্গা মঙ্গল পুঁথি দিলাম তো তোমারে।

পুঁথি পড়ি গান কর কলিঙ্গ মাঝারে ॥'

দেবীর কৃপা পেয়ে মানিক দত্ত দেবীর গান গাওয়ার উদ্দেশ্যে দল গঠন করে দেবীর কথামতো কলিঙ্গ নগরে গান গাওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন-

'তিনশত বত্তীশ নাচাড়ী রচিত হইল গান।

পদ দিশা তাথে অনেক করিল মূর্তিমান।।

তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।

রঘু রাঘব পালী আইল দুইজন।।

তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা করিল।

কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।'

কলিঙ্গ নগরে উপস্থিত হয়ে মানিক দত্ত কলিঙ্গরাজের কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর বাড়ি প্রফুল্ল নগর-

'রাজা বোলে মানিকদত্ত কোন দেশে ঘর।

দত্ত বোলে আমার বাড়ী প্রফুল্লা নগর।।'

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কবি মানিক দত্ত-র বাড়ি ফুলফুল্যা নগর বা প্রফুল্ল নগর। এখন প্রশ্ন, এই "ফুলফুল্যা নগর" বা "প্রফুল্ল নগর" বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত? ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, এই ফুলফুল্যা নগর আসলে মালদহের ফুলবাড়ী গ্রাম। কবিকে মালদহ নিবাসী বলার পক্ষে তাঁর যুক্তি- মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এখনও উৎসব-অনুষ্ঠানে গীত বা পঠিত হইয়া থাকে। উপরন্তু ইহাতে যে সমস্ত গ্রাম, নদনদী, মঠ-মন্দিরাদির উল্লেখ আছে, তাহাতে মালদহের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ধনপতি সদাগর বাণিজ্যে বাহির হইয়া গৌড়ে উপনীত হইলে যে সমস্ত গ্রাম-নদ-নদীর পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ঝাড়গ্রাম, বড়গাছা, আগলা, কাঞ্চননগর, সন্ন্যাসী পাটন, ছাত্যাভাতার বিল (যাহা লইয়া ভাতিয়া পরগণা হইয়াছে), কেন্দুয়ার নালা গৌড়েশ্বরীর মন্দির, দ্বারবাসিনীর ভগ্নস্তূপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এ সমস্তই মালদহের নিকটবর্তী, উপরন্তু পুঁথির ভাষায় বহুলাংশে মালদহের বাকরীতির প্রভাব দেখা যায়। অতএব হরিদাস পালিত এবং রজনীকান্ত চক্রবর্তী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১১, ১৩১৭) কবিকে মালদহের অধিবাসী বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের এ অনুমান অযৌক্তিক নহে। কাজেই সিদ্ধান্ত করা গেল, মানিক দত্ত মালদহ নিবাসী ফুলবাড়ী নগরের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু এতে নতুন এক সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যা হল, মালদহ জেলায় একাধিক ফুলবাড়ী গ্রামের অস্তিত্ব আছে।

মালদহ জেলায় বর্তমানে চারটি ফুলবাড়ী গ্রামের অস্তিত্ব আছে। একটি চাঁচল থানার কলিগ্রাম নিকটস্থ ফুলবাড়ী গ্রাম এবং অপর তিনটি হল-

১) ইংরেজবাজার পৌরসভার অন্তর্গত ফুলবাড়ী।

২) গৌড়ের অদূরে কমলাবাড়ী যদুপুরের নিকটস্থ ফুলবাড়ী গ্রাম।

৩) ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত অমৃতির পাশের গ্রাম নঘরিয়া ফুলবাড়ী।

তবে গ্রামটি পরিদর্শন করে দেখেছি, দেবী দুর্গা, শিব, চন্ডী ও মনসা মন্দিরগুলির গায়ে ফুলবাড়িয়া স্থানে নামের উল্লেখ আছে।

নঘরিয়া ফুলবাড়ীতে একাধিক চন্ডী ও দুর্গার মন্দির আজও বর্তমান। এখনও সেই সব মন্দিরে বলিদান সহকারে দেবীর পূজা মহাধূমধামে সাধিত হয়। দূরত্বের দিক থেকে যদি দেখা যায়, তবে নঘরিয়া ফুলবাড়ী গৌড়ের এমনকি সাদুল্লাপুরের থেকে খুব বেশি দূরে অবস্থিত নয়। নঘরিয়া ফুলবাড়ীও গৌড়বঙ্গে অবস্থিত। সুতরাং মানিক দত্ত গৌড়বঙ্গের কবি এবং তাঁর বাসস্থান বর্তমান ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত অমৃতি গ্রামের পাশে নঘরিয়া ফুলবাড়ী গ্রামেও হওয়া সম্ভব।

আত্মবিবরণী থেকে দেখা যায়, মানিক দত্ত প্রথমে কানা ও খোঁড়া ছিলেন এবং পরে দেবীর কৃপায় স্বাভাবিক দেহ লাভ করেন। বিদ্যাবুদ্ধির কোনো কথা জানা না গেলেও স্বপ্নাদেশে প্রাপ্ত চণ্ডীপুথির প্রথমে না পড়তে পারার ঘটনা থেকে-

‘একমাসে সেই পুঁথি পড়িতে নারিল।

দত্ত বোলে এমত পুঁথি কোন স্থানে ছিল।।

এমন পুস্তক আমি না পারি পড়িতে।

বান্ধিল মঙ্গল পুঁথি সাধ নাই মোর গীতে।।’

অনুমান করা যায়, মানিক দত্ত প্রথাবদ্ধ পড়াশোনায় খুব একটা পারদর্শী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও চণ্ডীকথা সম্বন্ধীয় ব্রতকথা থেকে কাহিনিগুণ গ্রহণ করে নিজস্ব চিন্তা দ্বারা তাকে

সাজিয়ে গানের উপযোগী করে গড়ে তুলে গানের দল গঠন করে বিভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন।

অনেকে মানিক দত্তক মুকুন্দ চক্রবতীর পূর্ববর্তী কবি বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁদের যুক্তিগুলি হল-

১॥

মানিক দত্তের কাব্যে ব্যবহৃত ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যে-

'নিদ্রায় আছিল শুইয়া আইল দেবী মহামায়া

আইল দেবী হেমন্ত নন্দিনী।

-এরূপ ভাষা প্রয়োগ সম্ভব নয়।

২॥

মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুচর পরিকরদের উল্লেখ করেছেন। পঞ্চদশ শতকের কোনো কবির পক্ষে এমনটা করা সম্ভব নয়।

৩ ॥

মানিক দত্ত কিছু আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে 'ফিরিঙ্গী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে 'ফিরিঙ্গী' বলতে পোর্তুগীজ জলদস্যুদের কথা বোঝানো হয়েছে। এই উল্লেখ পঞ্চদশ শতকের কবিদের পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু উপরের এই যুক্তিগুলি খণ্ডন করে বলা যায়-

প্রথমত॥

ভাষায় যে আধুনিকতার কথা এবং 'ফিরিঙ্গী' শব্দের উল্লেখের কথা সমালোচকেরা বলেছেন, তা লিপিকর ও গায়েনদের দ্বারা কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এই রকম প্রক্ষেপ শুধু মানিক দত্তের কাব্যের ক্ষেত্রেই ঘটেনি; মধ্যযুগের আরও অনেক কবির ক্ষেত্রে ঘটেছে। মনসাকবি বিপ্রদাস, রামায়ণকবি কৃত্তিবাসের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। কৃত্তিবাসের

আত্মপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকের মধ্যেই 'তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস'। এই প্রক্ষেপের নমুনা পাওয়া যায়। 'লইলাম' এই ক্রিয়াপদের ব্যবহার কৃত্তিবাসের যুগে ছিল না।

দ্বিতীয়ত ॥

মানিক দত্তের কাব্যে চৈতন্য অবতার ও চৈতন্যপরিকরবৃন্দের যে প্রসঙ্গ পাওয়া যায় তাও প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। কেননা, এই উল্লেখ কেবলমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে পাওয়া যায়। কাব্যের সম্পাদক ড. ওঝা যে পুথির উপর ভিত্তি করে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন সেই পুথিতে এইসব প্রসঙ্গ নেই। সুতরাং, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে যে চৈতন্যপ্রসঙ্গ আছে তা প্রক্ষেপই।

সুতরাং আমাদের অনুমান, মানিক দত্ত মুকুন্দরামের অনেক আগের কবি। এখন জিজ্ঞাসা, মানিক দত্ত মুকুন্দের থেকে কত আগের কবি?

প্রথমত ॥

মুকুন্দ চক্রবর্তী ছিলেন ষোড়শ শতকের শেষ পাদের কবি, আমাদের অনুমান, মানিক দত্ত তাঁর থেকে অন্তত শতাধিক বছর আগের কবি। এই অনুমানের পিছনে আমাদের যুক্তি হল: প্রাচীন ও মধ্যযুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার এত উন্নতি হয়নি। তখন গায়কেরা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। তাছাড়া, মানিক দত্ত ছিলেন উত্তরবঙ্গের কবি। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে কাহিনির সর্বত্র প্রসার ও খ্যাতিলাভ করা অন্তত শতাধিক বছরের আগে সম্ভব নয়। সুতরাং মানিক দত্ত পঞ্চদশ শতকের শেষপাদের কবি।

দ্বিতীয়ত ॥

ষোড়শ শতকের কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে নবদ্বীপ বোঝাতে প্রাচীনতর নাম 'নদীয়া', অর্বাচীন সংস্কৃতায়িত নাম 'নবদ্বীপ' দুই-ই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মানিক দত্ত শুধু 'নদীয়া' শব্দেরই ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও 'নদীয়া' বোঝাতে 'নুদিয়া' শব্দের ব্যবহার করেছেন। সুতরাং মানিক

দত্ত শুধু মুকুন্দ চক্রবর্তীরই নন, বৃন্দাবন দাসেরও পূর্ববর্তী কবি। বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তিনি কাব্যে যে সংস্কৃতায়িত 'নবদ্বীপ' শব্দের ব্যবহার করেছেন তা চৈতন্যদেবের প্রভাবেরই ফল।

সুতরাং বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যপ্রভাব পড়ার আগেই মানিক দত্ত তাঁর কাব্যরচনা শেষ করেন। বাংলাদেশে চৈতন্য প্রভাব শুরু হয় ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে। এর আগের পাদকে যদি মানিক দত্তের আবির্ভাব কাল বলে ধরে নিই তবে তা হবে পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদ। তাই যদি হয় তবে মানিক দত্তের আবির্ভাবকাল ১৪৭৫-১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের আশেপাশে হবে এবং কবি তাঁর পরের দশকে অর্থাৎ ১৪৯০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে কাব্যরচনা করেন।

তৃতীয়ত ॥

মানিক দত্ত কাব্যের বন্দনাংশে 'ধর্মমঙ্গলে'র অনুরূপ 'সৃষ্টিপতনে'র যে বর্ণনা দিয়েছেন, অনুরূপ বর্ণনা 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অন্যতম প্রাচীন কবি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যেও আছে। বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল ১৪৯৫-৯৬খ্রি.। মনে হয় মানিক দত্ত ও বিপ্রদাসের কাছাকাছি সময়ে কাব্যরচনা করেন। সর্বোপরি, মানিক দত্ত যে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যধারার আদি কবি এবং চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

৯.২: মানিক দত্তের দেবী চণ্ডীর পরিচয়

মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত- দেবখন্ড, কেতুখণ্ড বা আখেটিকখণ্ড এবং বণিকখণ্ড। কবি মানিক দত্ত এই তিন আখ্যানেই দেবীর লৌকিক রূপের উপর পৌরাণিক রূপের প্রলেপ দিয়ে দেবী চন্ডীর প্রকৃত আদলটা গড়ার চেষ্টা করেছেন। 'কেন' উপনিষদের হিমবত পর্বতের (হিমালয়) কন্যা হৈমবতীর কাহিনি ও কালীদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যের দক্ষ-সুতা সাধ্বী সতীর কাহিনি, নিজস্ব ভাবনার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে উত্তরবঙ্গের সমাজ প্রচলিত নাথধর্মের শূন্য বা নিরঞ্জন

দেবতার কাহিনির নর কনে দেবখতের কাহিনিকে সাজিয়েছেন। কবি মানিক দত্ত দেখিয়েছেন, প্রথম জন্মে ধর্ম নিরঞ্জনের হাম্বিতে দেবী আদ্যা জন্ম লাভ করেন-

'মনেতে ভাবিঞা ধর্ম হাম্বি ছারিল।

ধর্মের হাম্বিতে আদ্যা তখনি জন্মিল।।'

এবং তাঁর বিন্দু থেকে জন্ম নেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ধর্ম্মের অনুরোধে শিব আদ্যাকে সপ্তম জন্মে বিয়ে করতে রাজী হন। এই জন্মে দেবী হিমালয় কন্যা গৌরীরূপে পরিচিত হন। গৌরীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হন এবং নারদের মধ্যস্থতায় তাঁদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর গৌরী নিজ গাত্রমল থেকে একটি পুতুল তৈরি করে জীবনদান করেন এবং তাঁর নাম রাখেন গণেশ। অন্যদিকে, শিবের ঔরসে তাঁর গর্ভে অন্য এক সন্তান কুমার কার্তিকের জন্ম হয়।

অতঃপর দেবী দেখেন স্বর্গে অন্যান্য দেবতার পূজা হলেও তাঁর কোনো পূজা নেই। তিনি তাঁর জ্যোতিষী পদ্মাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন ধ্রুম্রাসুর স্বর্গে তাঁর পূজা প্রচারের প্রধান অন্তরায়। তিনি ধ্রুম্রাসুরকে নিধন করলেন। দেবতারা তখন খুশি হয়ে দেবীর পূজা করলেন। দেবী দুর্গা এবার মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য অগ্রসর হলে সঙ্গী পদ্মা মর্ত্যের রাজা সুরথের আশ্রয় নিতে বলেন। পদ্মার প্রস্তাব মতো দেবীর নির্দেশে সুরথ মর্ত্যে মহাধূমধাম সহকারে দুর্গার পূজা করেন। দেবী রাজা সুরথকে পূজার সময় যে মূর্তি দেখান তা দশভূজা রূপ। এই দ েবী সুরথের কাছে সিংহ পৃষ্ঠে পা দিয়ে, বৃষে গা হেলিয়ে, পৃষ্ঠে সুবর্ণ ঝাপানি, পায়ে নূপুর, মাথায় মালতী মালা ও কপালে অধর্চন্দ্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন-

'সিংহ পৃষ্ঠে দিয়া পা বৃষে হেলাইয়া গা

পঞ্চদাসী সঙ্গের সঙ্গিনী।।

মঙ্গল চন্ডিকা রূপে আইলা দুর্গা মোর ঘরে

বাক্য বলে কোকিলের ধ্বনি।

দেখিয়া লাগএ ডর গাও কাপে থরে থর

পৃষ্ঠে শোভে সুবর্ণ ঝাপানি।।

তরাসে না চলে পা নফুরে কারএ রা

শুনিতে মধুরস ধ্বনি।

শিরতে মালতির ফুল গন্ধে ফিরে অলিকুল

অদ্ধচন্দ্র ললাট উপরি।’

দেবীর অনুগামী কবি মানিক দত্ত একবার সুরথ রাজার কাছে বন্দি হন। নিজ অনুগামীকে মুক্ত করার প্রয়োজনে এই দেবীই যখন সুরথ রাজাকে স্বপ্ন দেখিয়ে ভয় দেখান তখন সংহার মুর্তি ধারণ করেন-

‘বুকেতে বসিয়া কোপে দেবি মহামায়

মূর্তি ধরে বিকট বদন।।

ষোলশত দৈত্য দানা সঙ্গেতো করিয়া

কোপে হইল চৌদ্দতাল।।

রাজাকে তুলিয়া মারে শেল ধরে বাম করে

ত্রাশে রাজা কাপে থরে থর।

দেবীর এই রূপে ভয় পেয়ে দেবীর কাছে মিনতি জানালে দেবী পুনরায় পূর্বের রুপে তাঁকে দেখা দেন।

মানিক দত্ত তাঁর চন্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীর এই পৌরাণিক রূপ যেমন এঁকেছেন, তেমনি তাঁর লৌকিক পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। তাই এই দেবীই যখন নিজ স্বামী শিবের উপর রুষ্ট হন তখন আমাদের বাঙালি ঘরের গৃহবধূর মতো রাগ করে বাপের বাড়ির অভিমুখে ‘নাই হরে’ অগ্রসর হতে পিছুপা হন না-

'দুর্গা বলে শিব ভাঙ্গড়া কথা শুন তুমি।

সকল ভক্ত তুমি নিবে পর হৈলাঙ আমি।।

কন্দল করিঞা দুর্গা চলে নাই হরতে।

পশ্চাতে চলিল শিব দুর্গাকে ফিরাতে।।'

শুধু তাই নয়, রুষ্টা দেবী শিবের উপর চক্রবাণ নিক্ষেপ করেন, কখনও বা চাটিরূপে (কীটরূপে) দেবতা শিবের মাথায় হুল ফোটান- 'চাটিরূপে দুর্গা শিবের মাথে কামরাল্য।' দুর্গার এসব আচরণ সবই লৌকিক রসে সিক্ত। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার একটি আঁটোসাঁটো ছবি পাওয়া যায় শিব দুর্গার কলহচিত্রে। কবি মানিক দত্ত শিব-দুর্গার যে পারিবারিক ছবি এঁকেছেন, শিব চরিত্রকে ভিখারি করে দেখিয়েছেন তা সম্ভবত তৎকালীন লোকজীবনের নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা নির্বিত্ত পরিশীলিত কোনো পরিবারের ছবি। নগরে ফিরে ফিরে শিবের ভিক্ষার চিত্র, পিতাকে ভিক্ষাদ্রব্য বাড়িতে নিয়ে আসতে দেখে পেটপুরে দুমুঠো অন্ন খেতে পাবে ভেবে দুই ভাই কার্তিক-গণেশের উল্লাস, উল্লাস দেখে শিবের মানসিক তৃপ্তি-

'কার্তিক বোলেন বাণী মহাজোগী পিতা তুমি

কিছু দ্রব্য দেহ খাইবারে।।

শিব ঝাড়িল থলি চালু পড়িল কথকগুলি

নানা দ্রব্য থুইল ঠাই।'

হৃষ্ট চিত্তে চন্ডীর রান্না চাপানোর দৃশ্য-

'পুত্রেক প্রবোধ করি রন্ধন চড়ান গৌরী

সুখে আজি চড়াব ভোজন।'

শিবের চণ্ডীকে 'রিশীর ঝি' বলে সম্বোধন সবই বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। চন্ডীকে শিবের 'রিশির ঝি' বলে এই সম্ভাষণ বাঙালি সমাজে সুপ্রচলিত

রেওয়াজ। কবি নিজের চেনাজানা পরিসর থেকে এই সব উপাদান সংগ্রহ করে পৌরাণিক রসের সঙ্গে একাত্ম করে চণ্ডী চরিত্রের বিমিশ্র রূপকেই প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনি কেতুকাহিনি বা ব্যাধকাহিনি। এই খন্ডের কাহিনিতে গড়ে নিয়েছেন। 'আখেটিক খণ্ডে' মাংস বিক্রয়ে বহির্গত ফুল্লরার সম্মুখে ছলনাময়ী দেবীর আবির্ভাব হয় বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী রূপে-

'মাথায়ে মাংসের ডালি চলিল ফুলুরা নারী

রথে ভরে আইল নারায়ণী।

বিধবা ব্রাহ্মণি মূর্তি ধরণ ধরিয়া ডাকে

হের আইস ব্যাধের ব্যাধিনী।।'

তারপর তিনি কালকেতুর গৃহে উপস্থিত হন নবযৌবনা সুন্দরী সধবা গৃহবধূ রূপে। ফুল্লরা দেবীকে এরূপ দেখে সপত্নী ভেবে নানা ফন্দি-ফিকির করে বিদায় দিতে চেয়েছে-

'ফুল্লরা বলে শুন অধম দুচারিণী।

তোর তুল্য পাপীষ্ট নারী অন্য নাহী জানী।।

কুন রূপ গুণ মোর পতিতে দেখিলে।

ছাড়িয়া স্বামীর ঘর জাতি কুল মজাইলে।।'

ছলনাময়ী দেবী এর প্রস্তর দিয়েছেন এভাবে-

'পরপুরুষ না জানি আমি না জানি পর নারী।

জে পুরুষ আমার পতি সেহত ভিখারী

অল্প দুখে আমি ছাড়িলাঙ গৃহবাস।

কেবল পুত্রের কারণ এহি আমার আশ।।

দুইটি পুত্র লৈঞা আসিবো তোমার ঘরে।

কত না নিষ্ঠুর বাণী বোলোহ আমারে ।।’

ফুল্লরা পরাস্ত হলে কালকেতু এবার হাল ধরে। কালকেতুর রহস্যভেদ প্রক্রিয়ায় দেবী একসময় রুষ্ট হয়ে কালকেতুকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দেখান-

‘ক্রোধে কালিকা জে মরায়ে দিল পাও।

বিকট দশন হৈল দশভুজা মাও ॥

জিহবা হৈল লহ মুখ ঘোরতর ।

দেখিতে এরি জায়ে জম ঘর।।

হইয়া লাঙ্গুট দারা কমরে ঘাগর।

বামে শোভিত খাণ্ডা দক্ষিণে খাপর।।

তিন চক্ষ শোভা করে বিম্বুকের ছটা।

মুকুট গগনে ঠেকে পৃষ্ঠে দোলে জটা।।

মাথার কুন্ডল শোভে পড়িছে জঘনা।

পতিপর নৃত্ত করে আপনে মগনা।।

শিব স্তুতি করে আপনে দেবগণ।

মস্তকের কিরিট ঠেকে আকাশ ভুবন।।

খগপতি জিনি নাশা উদর সমুদ্র।

মুণ্ডমালার মধ্যে কত রুদ্র।।

হস্তে মুণ্ড পাএ মুণ্ড কমরে হাতের মাল।

শ্যামার পদভরে নড়ে সপ্ত পাতাল।।'

'আখেটিক' খণ্ডের এই দুই দৃশ্যে দেবীর যে দুই রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায় দেবীর দুই রূপ এক নয়- তা দুই ভিন্ন উপাদানের (লৌকিক ও পৌরাণিক) মিশেলে সম্পৃক্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তৃতীয় কাহিনি বণিককাহিনি। মানিক দত্ত তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনির এই অংশে দেবীর খাঁটি পৌরাণিক রূপের পরিচয়টাই বড় করে এঁকেহেন। দেবী এই আখ্যানে বনে পঞ্চবিদ্যাধরীর উপদেশে পূজারতা খুল্লনাকে যে মূর্তি দেখিয়েছেন তা দশভুজার মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই সময় দেবীর মাথার উপর শিব, বৃষারোহী হয়ে দন্ডায়মান। দেবীর বাম পা মহিষের পিঠের উপর, ডান পা সিংহের পর, বাম হাতে মহিযাসুরের চুল ধরা, ডান হাতে ধরা মহিষাসুরের বুকে বিদ্ধশূল এবং তার দুই পাশে কার্তিক গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী-

'খুলনা বলেন মাতা দুর্গা জদি হও।

দশভূজা রূপ ধরি মোকে দেখা দেও।।

খুলনার কথাএ দুর্গা নিজ মন্ত্র জপে।

খুলনাকে দেখা দিল দশভূজারূপে।।

সিংহ পিষ্টে দিল দুগা দক্ষিণ চরণ।

মহিষের পিষ্টে বাম পদ য়ারহন।।

বাম করে মহিষাসুরের ধল্য চুল।

দক্ষিণ করে তার বক্ষে আরোপিল শূল।।

দুই দিগে হইল কার্তিক গণপতি।

ডাহিন বামেতে হৈল লখি সরস্বতী।।

বৃষে য়ারহন শিব মস্তক উপর।

নানা বেষ ধরি দুর্গা হৈল ভয়ঙ্কর।।'

ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে খুল্লনার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী একইরূপ খুল্লনাকেও দেখান। তবে এখানে খুল্লনার সঙ্গে তিনি মানুষের মতো কথা বলেন-

'দুর্গা খুলুনায়ে কথা ঘরের ভিতরে।

টুকা দিয়া লহনা দেখিল খুলনারে।।'

ধনপতির দৃষ্টিতে এই দেবী তাই মায়ারূপিনী রূপে প্রতিভাত হন। ধনপতি দেবীকে অপমান করেন। দেবী এর প্রতিশোধ স্বরূপ কমলে কামিনী রূপ ধারণ করে তাঁর ও তাঁর পুত্রের সামনে মায়িক চিত্রভ্রম সৃষ্টি করেন। মশাল যুদ্ধে চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে প্রবল পরাক্রমশালী বিরুদ্ধ শক্তিকেও দমিয়ে দেন-

'ধাঃ ভয়ঙ্করী বেষে পাবর্বতী।

ফুৎকারি সিংহনাদ পুরি

ধুমু ধুমু নাচন্তি।।

চামুণ্ডার মূর্তি ধরি পার্ব্বতী ভয়ঙ্করী

অট্টঅট্ট হাসন্তি।

খাপর ভরি পিএ মাহেশ্বরী

ঘোট ঘোট ঘোটন্তি

রক্তবীজ তনু বদনে না ফনু

চুম চুম চুমন্তি।

ঐরি করে ধরি খাপর ভরি

চক চক চিবান্তি।।'

কাব্যের এই আখ্যানে দেবীর দশভূজা রূপের পাশাপাশি চতুর্ভুজা রূপটির পরিচয় পাওয়া যায় খুল্লনা,শ্রীমন্ত, জয়া ও সুশীলাকে নিয়ে স্বর্গগমনের ঘটনায়-

‘চতুর্ভুজ হৈয়া দেবি ভোবানি আইল

চারিভক্ত তুলিল রথেতে।’

সমগ্র কাব্যে দেবীর এই চতুর্ভুজা রূপের পরিচয় এই একবারই পাওয়া যায়। অনুমান করা যায়, নবম শতকে মালদায় দেবী চণ্ডীর যে চতুর্ভূজা মূর্তি পাওয়া যায় সেই মুর্তিরূপই হয়তো কবিকে এরূপ বর্ণনায় প্রভাবিত করে থাকতে পারে। সর্বোপরি বলা যায়, কবি মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে দেবী চণ্ডীর স্বরূপ কল্পনায় বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান নিয়ে দেবীর মিশ্ররূপকেই জীবন্ত রূপ দিয়েছেন।

৯.৩: মানিক দত্তের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গ

পুরাণে বলা হয়েছে, সত্ব, রজ ও তম- এই তিনটি গুণের সহায়তায় দৃষ্টিগ্রাহ্য সব বস্তুর সৃষ্টি। অর্থাৎ বিশ্বও ত্রিগুণের আধার সৃষ্টির প্রারম্ভে শিবের এক ফোঁটা রক্ত প্রলয়ের জলে আদি ডিমে পরিণত হয়। এই ডিম ভাঙলে এক টুকরোয় আকাশ ও অন্য টুকরোয় পৃথিবী গঠিত হয়। ওদিকে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মার অজ্ঞাতে জন্ম হয় বিদ্যার। এরপর ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু। এটি তির্যক স্রোত- এরপর সৃষ্টি হয় ঊদ্ধস্রোতের, উদ্ভূত হন দেবতারা এবং নিম্নস্রোতে আবির্ভূত হয় মানুষ। ব্রহ্মার রজোগুণ গ্রহণ করে মানুষ পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ব্রহ্মার শক্তি থেকে সৃষ্টি হয় পাখি, মেষ, ছাগ, গরু, অশ্ব, হস্তী, গাধা, বৃষ, উট প্রভৃতি নানা প্রকার জীবজন্তু। পুরাণের এই সৃষ্টি বর্ণনার অনুকরণ করেই মঙ্গলকাব্যের কবিরা ‘সৃষ্টিপত্তন’ অংশের বর্ণনা দিয়েছেন। মঙ্গল কাব্যধারায় মনসামঙ্গলের তিনজন প্রাচীন কবি (নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই) মধ্যে একমাত্র বিপ্রদাস পিপিলাই ‘সৃষ্টিপত্তন’পালা বর্ণনা করেছেন। সমসাময়িক কবি মানিক দত্ত এই একই প্রসঙ্গকে তাঁর কাব্যের প্রারম্ভ অংশে বর্ণনা করেছেন।

মানিক দত্তের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আদিদেবতা নিরঞ্জন প্রথমে শূন্যরূপে বিদ্যমান ছিলেন। জীবসৃষ্টির কারণে তিনি মায়ারূপ ধরেন এবং মাংস-পিণ্ডের আকারে শূন্য থেকে গোলোক অভিমুখে ধাবিত হন। এই সময় তাঁর দেহে চোখ, কান, নাক ইত্যাদি মানব অঙ্গের বহিঃপ্রকাশ হয়। গোলোকে এসে ধর্ম জলের উপরে যোগনিদ্রায় মগ্ন হন। যোগনিদ্রা সমাপ্ত হলে সম্মুখে উলুককে দেখে ধর্ম কতকাল যোগ্নিদ্রায় অতিবাহিত করেছেন তার সময়কাল সম্বন্ধে জানতে চান। উলুক ধর্মের সদ্ উত্তর না দিতে পেরে ধর্মকে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য অনুরোধ করেন-

‘উলুক বোলে চোদ্দ যুগ গেল ব্রহ্ম গিয়ানে।

তখন আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিয়ানে।।

উলুক বলেন ধর্ম শুন তত্ব সার।

তুমি সৃষ্টি কর ধর্ম্ম সকল সংসার ।।’

উলুকের কথায় উৎসাহিত হয়ে আদ্য দেবতা ধর্ম তখন সৃষ্টি কাজে মনোনিবেশ করবেন বলে স্থির করলেন-

‘উলুকের কথাএ ধর্ম ভাবিল তখন।

সৃষ্টি করিতে ধর্ম করিলেন মন।।’

সৃষ্টিকাজের প্রথম পর্যায়ে ধর্ম মন্ত্র পড়ে পদ্ম ফুল সৃষ্টি করে সেই পদ্মের উপরে আদ্যমূল জপ করলেন। জপ শেষে ধর্ম পাতালে প্রবেশ করলেন। পাতালে প্রবেশ করার পর মৃত্তিকা-পিন্ডের সৃষ্টি করলেন। তারপর সেই মৃত্তিকা পিন্ডের উপর আঙুলের নখ দিয়ে চাপ দিলে মাটির তালটি তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। ধর্ম এবার ভাবতে শুরু করলেন তিনি এই মৃত্তিকা-পিন্ডগুলি অর্থাৎ বসুমতীকে কার উপর সংস্থাপন করবেন। শেষে বরাহ অবতার এগিয়ে এসে ধর্মের সমস্যার সমাধান করলেন। বরাহ নিজ দণ্ডের উপর পৃথিবীকে সংস্থাপন করলেন। কিন্তু ধর্মের তা মনঃপূত হল না। শেষে তিনি নিজেই গজরূপ ধারণ করে পৃষ্ঠে পৃথিবীকে ধারণ করলেন। কিন্তু এক

বিপদ এসে উপস্থিত হল। গজরূপী ধর্ম পৃথিবীর ভার সহ্য করতে পারলেন না। এবার তিনি কূর্ম রূপ ধারণ করলেন; কূর্মেরও গজের মতো অবস্থা হল। কিন্তু কূর্ম পৃথিবীকে ছাড়লেন না, পৃথিবীর সঙ্গে রসাতলে চলে গেলেন।

ধর্ম অতঃপর নিজ কনক উপবীত ছিঁড়ে ফেললেন। সেই উপবীত থেকে সপ্তমস্তক বিশিষ্ট এক নাগ জন্মগ্রহণ করল। ধর্ম এই নাগের নাম রাখলেন বাসুকি। ধর্মের আজ্ঞায় বাসুকি পৃথিবীকে নিজ মস্তকে ধরলেন-

‘সেইত নাগের নাম বাসুকি বলি থুইল।

পৃথিবী ধরিতে আজ্ঞা তাহাকে করিল।।

অমর বর নাগকে দিঞা বলে বিদ্যমান।

আমি জাকে জন্ম দেই তুমি দেহ স্থান।।’

পৃথিবী সৃষ্টির পর ধর্ম, চন্দ্র, সূর্য, স্বর্গ মত্ত্য, পাতাল, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃজনের বাসনা প্রকাশ করলেন। তাঁর হাই উঠল, সেই হাই থেকে জন্মালেন আদ্যা। আদ্যা থেকে একে একে চন্দ্র,সূর্য, নক্ষত্র,স্বর্গ, মর্ত্য,পাতাল জীবজগৎ গাছপালা ইত্যাদির সৃষ্টি হল-

‘আদ্যাকে দেখিল ধর্ম মনের হরিষে।

স্তনে হস্ত দিতে আদ্যা রূপবতি হাঁসে।।

আদ্যার ঊরু ধরি ধর্ম নখের রেখ দিল।

সংসারের স্ত্রী পুরুষ সেই হৈতে হৈল।।

নখের রেখ পাঞা রক্ত মাংস হৈল।

চন্দ্র সূর্য্য আকাশে তাহাতে সৃজিল।।

নখের রেখ পাঞা পৈল কিছু ধার।

গাছ বৃক্ষ হৈল তাতে এ মেরু মন্দার।।

সর্গ মর্থ পাতাল সকল সৃষ্টি হৈল।'

স্বর্গ মর্ত্য, পাতাল, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি সৃষ্টির পর ধর্ম আবার যোগাসনে মত্ত হলেন। এদিকে দেবী আদ্যার রূপ পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো দিন দিন বাড়তে থাকল। যোগ শেষে আদ্যার এই রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে ধর্ম কামাসক্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর বীর্য স্বলন হল। ধর্ম বাম হাতে ধরে সেই বীর্য তিন জায়গায় রাখলেন। এই তিন স্থান থেকে ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার সৃষ্টি হল। জন্মের পর এই তিন দেবতা নদীতীরে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তপস্যা শুরু করলেন। ধর্ম এঁদের তপস্যার নিষ্ঠা যাচাইয়ের জন্য ছলনা করার কথা ভাবলেন। ধর্ম এজন্য মরারূপে মায়া পেতে জলে ভেসে প্রথমে ব্রহ্মার ঘাটে উপস্থিত হলেন। মরার পচা গন্ধে ব্রহ্মা তিল, কুশ ছেড়ে দিয়ে ঘাটের উপরে উঠে বসলেন। ধর্ম নিরঞ্জন এবার বিষ্ণুর ঘাটে গেলেন। বিষ্ণুও ব্রহ্মার মতো ধর্মের সঙ্গে আচরণ করলেন। সবশেষে আদ্যদেব গেলেন শিবের ঘাটে। শিবও ব্রহ্মা-বিষ্ণুর মতো ঘাট ছেড়ে উঠে গেলেন ঠিকই কিন্তু তপস্যা ছাড়েননি। তিনি ধ্যানে ধর্মের স্বরূপ বুঝতে পেরে ধর্মের শবকে ঘাড়ে তুলে পাড়ে নিয়ে এসে সৎকার করার বাসনা প্রকাশ করলেন। উলুকের পরামর্শে শিব নিজের ঊরুতে চুল্লি সাজিয়ে মৃতদেহ সৎকার করলেন।

সৎকারের পর ধর্ম নিরঞ্জন শূন্যে ফিরে এলে তাঁর আদ্যার কথা মনে পড়ে। তখন তিনি একে একে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজনকেই আদ্যাকে বিয়ে করার আহবান জানান। ধর্মের এই প্রস্তাব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পত্রপাঠ ফিরিয়ে দিলেও শিব শর্ত সম্মতভাবে বিয়েতে রাজী হলেন-

'শিব বোলে শুন তুমি তবে বিভা করি আমি
আদ্যা যদি সাত বার মরে।।
সাতবার মরিব সাতখান হার লব
হাড়মালা গলাএ পড়িব।
আদ্যা দেহা ছাড়িঞা পুনুজন্ম লঅ গিঞা

তবে তাকে বিবাহ করিবো।।'

ধর্ম, শিবের শর্ত মেনে নিয়ে আদ্যাকে মৃত্যুবরণের জন্য বললেন- আদ্যা ধর্মের কথা মেনে নিয়ে দেহত্যাগ করে শিবের বিবাহযোগ্যা করে নিজেকে গড়ে তুললেন-

'ধর্মের আঙ্গাতে আদ্যা দেহা ত্যাগ কৈল।

দেহত্যাগ করি আদ্যা জনমিতে গেল।।

জত ঠাই জনমিতে ধর্মের আঙ্গা ছিল।

সেখানে সেখানে আদ্যা জনম নইল।।'

আদ্যা সপ্তম জন্মে হিমালয়-মেনকার ঘরে দুর্গা বা চণ্ডী রূপে জন্মগ্রহণ করলে শিব পূর্বের শর্ত মতো দুর্গাকে বিয়ে করতে রাজী হলেন। এজন্য নারদকে তিনি ঘটকালির দায়িত্ব দিলেন। নারদের সুচারু ঘটকালিতে বিয়ের সম্বন্ধ জুড়ানিয়ার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। নারদ শিবকে বিয়েতে সকল দেবতাদের নিমন্ত্রণ করে আনার পরামর্শ দিলেন। নারদের পরামর্শ মতো শিব দেবতাদের নিমন্ত্রণ করলেন কিন্তু দেবতারা শিব ভূত-প্রেত সঙ্গে করে থাকেন বলে তাঁর বাড়িতে খেতে রাজী হলেন না। তবে শিব যদি গঙ্গাকে দিয়ে রান্না করাতে পারেন তবে দেবতাদের সেই ভোজসভায় অংশগ্রহণে কোনো আপত্তি নেই বলে জানালেন। শিব দেবতাদের এই কথায় তাঁদের কাছে সানন্দে অঙ্গীকার করলেন—'গঙ্গা আনিঞা আমি করাব রন্ধন।' গঙ্গা তখন মত্ত্যভূমে বাস করেন ঋষি শান্তনুর আশ্রমে । অতঃপর, দেবসভায় গঙ্গাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিব হাজির হলেন শান্তনুর আশ্রমে। শান্তনু তাঁর আশ্রমে হঠাৎ শিবের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শিব শান্তনুকে বলেন-

'তুমার নারি গঙ্গা যদি করএ রন্ধন।

তবেত আমার ঘরে খাএ দেবগণ।।'

শান্তনু সব শুনে শিবের কাছে শর্ত সাপেক্ষে গঙ্গাকে পাঠাতে রাজি হন-

'মুনি বোলে শুন শিব বলিএ তুমাকে।

এক রাত্রের তরে গঙ্গা আমি দিব তোকে।।

রাত্র মধ্যে গঙ্গা আনিঞা দিহ তুমি।

প্রভাত হইলে গঙ্গা না লইব আমি।।’

শিব শর্তে রাজী হয়ে গঙ্গাকে নিয়ে কৈলাসে এলেন। গঙ্গা রন্ধন করলেন। দেবতারা মহাসুখে ভোজনও করলেন। কিন্তু নারদ কৌশল করে সকলের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিলেন। ঝগড়ায় অনেক সময় অতিবাহিত হল, রাতের অন্ধকার ফর্সা হয়ে সকাল হয়ে গেল। গঙ্গা বিপদ বুঝে কাঁদতে শুরু করলেন। শিব গঙ্গাকে ফিরিয়ে দিতে শান্তনুর আশ্রমে গঙ্গাকে নিয়েও গেলেন। কিন্তু শিবের অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শান্তনু শিবকে ফিরিয়ে দিলেন। শিব তখন যথোচিত মর্যাদা দিয়ে গঙ্গাকে নিজ জটার মধ্যে স্থান দিলেন। এভাবেই শিব গঙ্গাধর হয়ে উঠলেন। অতঃপর শিব চন্ডীর বিবাহ হল।

মানিক দত্ত তাঁর ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে শিব-চণ্ডীর বিবাহের পরের কাহিনির গতিকে অন্যখাতে (দেবতার জন্মপ্রসঙ্গে) প্রবাহিত করিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর কাব্যের সৃষ্টি বর্ণনা প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গ বর্ণনায় মানিক দত্ত পৌরাণিক ও লৌকিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছেন। পুরাণ অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই স্বয়ম্ভূ সৃষ্টি-তত্ত্ব দিয়ে সৃষ্টি বর্ণনা শুরু করেছেন-_জল নামক কোনো মৌলিক বস্তু থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল বলে তিনি আমাদের জ্ঞাত করান। সৃষ্টির আদি পুরুষ প্রথমে স্বয়ংজাত হলেও পরে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ইচ্ছায় এবং পরবর্তী সৃষ্টি হয়েছে নরনারীর মিলিত সৃষ্টি। মানিক দত্তের এসব ভাবনা ও বর্ণনা সবই পুরাণ সম্মত।

৯.৪ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী নির্মাণ তত্ত্ব

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত- দেবখণ্ড, কালকেতু কাহিনি বা আখেটিক খণ্ড এবং বণিকখণ্ড। কবিরা এই তিন আখ্যানেই দেবীর লৌকিক রূপের উপর পৌরাণিক রূপের প্রলেপ দিয়ে চন্ডীর প্রকৃত আদলটা গড়ার চেষ্টা করেছেন। ‘কেন উপনিষদে’র দার্শনিক দৃষ্টিতে উমাকে বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিনী অর্থাৎ

দেবতাগণ তাঁরই ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁর আয়ত্ত বলে তিনি জ্যোতিরূপা সুবর্ণকান্তি-তিনি হৈমবতী। মনে হয় 'কেন উপনিষদে'র এই হৈমবতী ভাবনা পরবতীকালে হিমবৎ পর্বতের (হিমালয়) কন্যা হৈমবতী কল্পনার সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে উমা বা গৌরী হিমালয় কন্যারূপে অভিন্ন হয়ে গেছেন।

পর্বত কন্যা উমা বা হৈমবতী সম্বন্ধে আর এক আলোচনা পাওয়া যায় কালিদাসের **'কুমারসম্ভব'** কাব্যে। কালিদাসের মতে দক্ষসুতা সাধবীসতীই পিতৃকৃত অপমান সহ্য করতে না পেরে যোগবলে তনু ত্যাগ করে পুনরায় জন্মলাভের ইচ্ছায় শৈলবধূ মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করেন। এদিকে সতী যেদিন দেহত্যাগ করেন শিব সেদিন থেকে সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে দেবদারু বৃক্ষ পরিবৃত হিমালয়ের এক সানু প্রদেশে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। এরপর উমা কর্তৃক যোগেশ্বর মহাদেবের তপোভঙ্গ এবং উমা মহেশ্বরের পরিণয় এবং দেবকার্য সাধনের জন্য দেব সেনাপতি কুমার কার্তিকের জন্ম প্রভৃতি ঘটনা সর্বজনবিদিত। দেবখণ্ডের কাহিনি বর্ণনায় কবিরা এই সব পৌরাণিক সূত্র থেকে কাহিনি গ্রহণ করে সেগুলিকে নিজস্ব ভাবনায় জারিত করে ব্রতকথা আকারে প্রচলিত কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত করে কাহিনি গ্রন্থন করেছেন। তাই চন্ডীকাব্যের দেবখণ্ডের কাহিনিতে পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি একই সঙ্গে সহাবস্থান করেছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনি ব্যাধ কাহিনি। এই কাহিনিই বাংলাদেশে বহুপ্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। ড. সুধীভূষণ ভট্টাচার্য বলেছেন-

"কালকেতুর গল্পটি যে প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, বিশ্বসারতন্ত্রের নজির ছাড়াও মূর্তি-শিল্পের সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। একশ্রেণীর গোধাসনা দেবী মূর্তি বাংলাদেশের নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকা, মালদহ ও রাজশাহীর প্রত্নশালায় এবং কলিকাতা যাদুঘরে মূর্তিগুলি সংরক্ষিত আছে। মঙ্গলচন্ডীর গোধিকা-মূর্তি গ্রহণ করিয়াই কালকেতুকে ছলনা করিয়াছিলেন। সেজন্য গোধিকা-বাহনা দেবী-মূর্তি দেখিলে স্বভাবতই তাঁহাকে কালকেতু কাহিনি বর্ণিত দেবীর প্রস্তর-মূর্তি বলিয়া মনে হয়।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবী মূর্তিটি নবম শতকে খোদিত। বিশেষজ্ঞদের অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে তার দু-এক শতাব্দী আগে থেকে মালদহে বা তার আশপাশ অঞ্চলের লোকমুখে কালকেতুর কাহিনি প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে সূত্রধার রচিত 'রূপমণ্ডল' গ্রন্থে গোধাসনা গৌরীর বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন-

'অক্ষসূত্রং তথা পদ্মমভয়ং চ বরং তথা।

গোধাসনাশ্রিতা মূর্তিগৃহে পুজ্যা শ্রিয়েতদা।।'

অর্থাৎ শ্রী বা পার্থিব ধনসম্পদ অভীষ্ট হলে এই দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করা আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভক্তের ধনসম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই দেবীর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল। গোধার কথা বাদ দিলে, প্রকৃতির দিক থেকে এই দেবী চণ্ডীমঙ্গলের দেবীর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে মনে হয়। চন্ডীমঙ্গলের দেবীকে যারা প্রসন্ন করতে পেরেছেন তাঁরাই ধনজনের অধিকারী হয়েছেন, আবার চণ্ডী যেখানে ক্রুদ্ধ হয়েছেন সেখানে তাঁর সর্বনাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। পরবর্তীকালে রচিত বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়-

'নিরবধি নৃত্যগীতি বাদ্য কোলাহল।

না শুনে কৃষ্ণের নাম পরমমঙ্গল।।

বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।

মদ্যমাংস দিঞা কেহ যক্ষ পূজা করে।।'

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি মানিক দত্ত। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশে লোকপ্রচলিত ব্যাধ-কাহিনি ঝাড়াই-মোছাই করে তার উপর কল্পনা চড়িয়ে দিয়ে চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডের কাহিনি গ্রন্থনা করেছেন। তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছিল আদিম আদিবাসী অধ্যুষিত। পুরুষানুক্রমে তাদের পুরুষেরা গভীর বনে জঙ্গলে ঘুরে তীর-ধনুক-বল্লম-বর্শা নিয়ে পশু শিকার করত আর তাঁদের মেয়েরা সেই পশুর মাংস,

চামড়া, নখ, দাঁতের তাবিজ, কবজ হাটে বিক্রি করে কোনো রকমে দিন যাপন করত। তাঁরা পশুশিকারে বেরনোর আগে 'চান্ডী' নামক এক অরণ্যানি দেবীর পূজা করত। এই 'চান্ডী' দেবীর মাহাত্ম্য কথা দিয়ে নানা গালগল্প, কিংবদন্তী, ব্রতকথা আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তুর্কি আক্রমণের পরে এই সংক্রান্ত ব্রতকথাগুলির 'চান্ডী' ভাবনার সঙ্গে পৌরাণিক ভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে কবিরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আখেটিক খন্ডের চন্ডীদেবীর রূপটিকে গড়ে তুলেছেন।

মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে বণিক খণ্ডের কাহিনিটি কিভাবে নিমাণ করেছেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কোথাও কথা বলা না গেলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে একটা অনুমান খাড়া করা যায়। তন্ত্রগ্রন্থ 'বিশ্বসারতন্ত্রে' আখেটিক খণ্ডের কাহিনিকে তিন দিনের পালা বলা হয়েছে। কিন্তু রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্বে' মঙ্গলচন্ডীর পূজা বিধি বর্ণনা প্রসঙ্গে 'গীতদিভিঃ'র উল্লেখ করে তাকে আটদিনের পালা বলেছেন। মানিক দত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখ্যানকে 'আটদিনের পালা' বলেছেন। সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, তুলনায় প্রাচীনগ্রন্থ 'বিশ্বসারতন্ত্রে' যে তিনদিনের পালা ছিল তাকেই বাড়ানোর প্রয়োজনে কাহিনির পল্লবিত বিস্তার ঘটাতে হয়েছে। পরবর্তীকালের কাব্য 'তিথিতত্ত্ব'-এ (নবম শতক) তার উল্লেখ আছে।

আমরা জানি, প্রাচীনকালে বৌদ্ধ রাজাদের আমলে (চর্যাপদে) বাঙালি সদাগরেরা সপ্তডিঙ্গা, চোদ্দ ডিঙ্গার বহর নিয়ে বিভিন্ন পট্টনে বাণিজ্য যাত্রা করতে যেতেন। তাঁদের এই দুঃসাহসিক অভিযান নিয়ে যে সব কাহিনি তৎকালে প্রচলিত ছিল, সেই সব কাহিনিরই কোনো একটি কাহিনি হয়তো ধনপতি উপাখ্যানের আখ্যায়িকার অস্থিকঙ্কাল রূপে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। পরে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত কাহিনি, এই কাহিনির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। যেমন, কমলেকামিনী উপাখ্যানটি গজলক্ষ্মীর কিংবদন্তী থেকে এই কাহিনির মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। দক্ষিণ ভারত ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে গজলক্ষ্মীর মূর্তি খুবই প্রচলিত ও প্রাচীন। কিন্তু পূর্বভারতে কোনো যুগেই এর তেমন কোনো প্রসিদ্ধি দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করা যায় প্রাচীনকালে কোনো এক সময় বাঙালি মানস বাণিজ্যসূত্রে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে গিয়ে এই গজলক্ষ্মীর সঙ্গে

পরিচিত হয়ে এর রূপে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন, সেই বিস্ময়ের ঘোর থেকে নানা গালগল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই গালগল্পই চণ্ডী কবিদের হৃদয়রসে জারিত হয়ে কাব্যময় রূপে পরবর্তী সময়ে চন্ডীমঙ্গল কাব্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

এরকম অসংখ্য ঘটনা, কাহিনির সংযোগ ও সংমিশ্রণে দেবী চণ্ডী বাংলাদেশের মানুষের কাছে এক অলৌকিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ক্রমে রাজনৈতিক জীবনে পরাজয় ও অসহয়তাবোধ থেকে এই অলৌকিক শক্তিধর দেবীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ে। দেবতার সন্তোষের উপরেই মানুষের শুভাশুভ নির্ভর করে এই বোধ প্রবল হয়। তখন উচ্চবর্ণের কবিরাও এই দেবীর মাহাত্ম্য রচনা করতে উৎসাহবোধ করেন। কবিরা বাংলার এই লৌকিক দেবীর শক্তি ও প্রতাপের লোকপ্রচলিত আখ্যানের উপর শাস্ত্র ও পুরাণের প্রলেপ বুলিয়ে তাকে মঙ্গলকাব্যের গড়ন দেন।

৯.৫ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যধারার আদি কৰি মানিক দত্ত। কাহিনি কথায় পরবর্তীকালের চন্ডীকবিরা সকলেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য লিখেছেন- “মাধব ও মুকুন্দরামও আট দিনের পালাই রটনা করিয়াছিলেন। মুকুন্দরাম মানিক দত্ত নামে জনৈক কবিকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি-কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানিক দত্তের প্রদর্শিত পথেই মুকুন্দরাম অগ্রসর হইয়াছিলেন।” মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ রীতি দেবদেবী বন্দনা দিয়ে কাব্যারম্ভ হয়। দেবদেবীর এই বন্দনা অংশকে অনেকে মঙ্গলকাব্যের স্থাপনাপালা বলেছেন। সুকুমার সেন লিখেছেন- “বন্দনা অংশের সহিত কাব্যকাহিনীর কোন যোগ নাই, আনুষ্ঠানিকভাবে গীত হইবার বেলায় দেবতা-বন্দনা প্রথমেই আবশ্যক। তাই এই অংশ স্থাপনা পালা।” কিন্তু মানিক দত্তের কাব্যে দেখতে পাই তিনি কাব্যের প্রথমে স্থাপনা পালা বর্ণনা না করে সরাসরি দেবখণ্ডের বর্ণনা শুরু করেছেন। মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ডের বর্ণনা শুরু হয়েছে পুরাণের সৃষ্টি বর্ণনা দিয়ে। মানিক দত্ত অনুরূপে তাঁর কাব্যের কাহিনি শুরু করেছেন ‘সৃষ্টিবর্ণনা’ পালা দিয়ে।

সৃষ্টির প্রথমে শূন্যে মাংস পিন্ডরূপে ধর্মের জন্ম হয়। জন্মের পর তিনি বহুকাল তপস্যা করে পৃথিবী সৃজন করেন। পৃথিবী সৃজনের পর নারীরূপী আদ্যার সৃষ্টি হয় এবং বিন্দু থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জন্মলাভ করেন। জন্মের পর ধর্মের অনুরোধে শিব আদ্যাকে বিবাহ করার অনুরোধ করেন। ধর্মের অনুরোধে শিব আদ্যাকে সপ্তম জন্মে বিবাহ করতে রাজী হন। গৌরীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিবাহ করতে সম্মত হন। যথাসময়ে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর একদিন গৌরী বা চণ্ডী নিজ গাত্রমল থেকে একটি পুতুল তৈরি করে রাখলে কৌতুহলী শিব তাতে প্রাণ সঞ্চার করেন এবং গণেশ নাম দেন। পরে চণ্ডীর গর্ভে শিবের আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, নাম কার্তিক।

পতি ও দুই সন্তান (গণেশ ও কার্তিক) নিয়ে স্বর্গে গৌরীর দিন ভালোভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিল। একদিন দেবী তাঁর জ্যোতিষী পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন মর্ত্যে সকল দেবতার পূজা প্রচলিত থাকলেও তাঁর পূজা নেই কেন?

‘দুর্গা বোলে মর্থপুরে   কোন দেবের পূজা করে

আমার পূজা মর্থপুরে না হয় কেনে।’

পদ্মা উত্তর দেন, তিনি ধ্রুম্রাসুরকে বধ করতে পারলে পূজা পেতে পারেন। চণ্ডী নারদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তিনিও মর্ত্যে তাঁর পূজা না হওয়ার একই কারণ জানালেন-

‘মুনি বোলে অসুরক্ষয়   জদি মাতা মর্থে হয়

শুন মাতা চামুণ্ডা দশভূজা।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ   ভয় ঘুচিবে মনে

সকলে করিবে তোমার পূজা।।’

পদ্মা ও নারদের কথা মতো চণ্ডী ধ্রুম্রাসুরকে বধ করলেন, দেবতারা এতে ভীত হয়ে স্বর্গে চন্ডীর পূজা করলেন। পদ্মার পরামর্শে দেবী এবার মর্ত্যের কলিঙ্গরাজ সুরথকে পূজার নির্দেশ দেন এবং বিশ্বকমাকে তাঁর রাজ্যে দেবীর দেউল নিমার্ণের আদেশ দেন। দেবীর আদেশ পেয়ে বিশ্বকর্মা কলিঙ্গ রাজ্যে দেবীর দেউল নিমাণ করেন এবং দেবীর নির্দেশ মতো ধুমধাম সহকারে দেবীর পূজা করেন।

এরপর দেবীর মনে বাসনা জন্মে তিনি মর্ত্যে প্রতি ঘরে ঘরে নিজের পূজা প্রচার করবেন। সেই বাসনা পূরণে পদ্মার সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ফুলফুল্যানগরের অধিবাসী কানাখোড়া মানিক দত্তকে গান করে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য স্বপ্নে নির্দেশ দেন এবং ইন্দ্রের কাছে রাখা তাঁর পুথির এক অষ্টমাংশ পুথি মানিক দত্তের শিয়রদেশে রাখেন।

‘পদ্মা বোলে শুন মা সর্বমঙ্গল।
মানিক দত্ত কানা খোড়া ফুলফুল্যানগর ।।
তাকে স্বপ্ন দেখাহ সর্বমঙ্গল।
তোমার গীত গান করুক পৃথিবী ভিতর।।’

দেবীর নির্দেশ মতো মানিক দত্ত দেবী প্রদত্ত পুথি থেকে নিজে গান বেঁধে দল গঠন করে কলিঙ্গ নগরে গান করে বেড়াতে লাগলেন।

‘রথু রাঘব পালী আইল দুইন।।
তিন চারি জনে সম্প্রদা করিল।
কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।’

কলিঙ্গ নগরে মানিক দত্তের মধুর চণ্ডীগীতি উপস্থাপনায় প্রজাসহ রাজকর্মচারীরা আকৃষ্ট হয়ে পরলে রাজকার্য অচল হয়ে পড়ে।

‘ভবানীর গীতে জড়িত সভার মন।

রাজার দরবারে নাহি জায় কোনজন।।’

ক্রুদ্ধ কলিঙ্গরাজ মানিক দত্তকে কারাগারে বন্দি রাখেন। মানিক দত্তকে বন্দি করার ঘটনায় দেবী ক্রুদ্ধ হয়ে সেই রাত্রিতেই রাজাকে স্বপ্ন দেখালে রাজা মানিক দত্তকে যুক্ত করে তাকে আপ্যায়িত করে তাঁর নিকট থেকে 'অষ্টমঙ্গলা' গান শোনেন।

চন্ডীদেবী এবার পদ্মার উপদেশে পশুসৃজন করেন। কিন্তু পশুদের বাসযোগ্য বন বা পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় সহানুভূতিবশত শিব তখন পশুদের জন্য বন ও জঙ্গলের সৃষ্টি করে দেন। চন্ডী পশুদের জন্য সৃষ্ট বন দেখে শিবের প্রতি রুষ্ট হন এবং পদ্মাকে তাঁর ব্রত আরো প্রচার করার উপায় নিধারণ করতে বলেন। পদ্মার উপদেশে দেবী যোগিনী বেশে ইন্দ্রের নিকট গিয়ে তাঁকে পুত্রবর দেন। এই পুত্রের নাম নীলাম্বর। যথাকালে নীলাম্বরের সঙ্গে ছায়াবতীর বিবাহ হয়।

একবার নীলাম্বরের পূজা কার প্রাপ্য এ নিয়ে শিব ও চন্ডীর মধ্যে কলহ শুরু হয় চন্ডী শিবালয় ত্যাগ করেন । বেগতিক দেখে শিব চন্ডীর পশ্চাদানুসরণ করতে থাকেন।

ক্রমে কালকেতুর ভয়ে বনের পশুরা ভীত হয়ে দেবীর শরণাপন্ন হলে দেবী গোধিকামূর্তি ধারণ করে কালকেতুর সম্মুখে আসেন এবং তাঁর চোখে ধুলো ছিটিয়ে দেন।

‘য়েক মুঠা ধুলা দুর্গা হস্তে করিআ।

কালকেতুর চক্ষেতে মাতা মারিল ছিটিআ।।’

এতে পশু শিকারে ব্যর্থ হয়ে কালকেতু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কালকেতুর কান্নায় দেবী পুনরায় সদয় হয়ে মুগরূপ ধারণ করে কালকেতুর সামনে উপস্থিত হলে কালকেতু মায়ারূপী মৃগয়াকে উদ্দেশ্য করে বাণ নিক্ষেপ করলেন। দেবী আবার গোধিকা রূপ ধরলেন। কালকেতু গোধিকাকে ধরে বাড়ি নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে রেখে ফুল্লরাকে রান্না করতে বলে স্নানে গেলেন। দেবী তখন ব্রহ্মমন্ত্র পড়ে পাশমুক্ত হলেন এবং পদ্মার উপদেশে চারখানি বক্ষের কাঁচুলি নিমাণ করিয়ে মোহন সাজে সজ্জিত হয়ে কালকেতুর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। ফুল্লরা চাল ধার করে বাড়ি ফিরে সুন্দরী রমণী

দেখে হতবুদ্ধি হলেন এবং পড়শী মাসির উপদেশে কালকেতু ফিরে আসার পূর্বেই গালাগালি দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করলেন। ফুল্লরার সামনে দেবী কালকেতুর বাড়িতে থাকার ইচ্ছাই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করলেন-

'দুইটি পুত্র লৈঞা আসিবো তোমার ঘরে।

কত না নিষ্ঠুর বাণী বোলোহ আমারে।।'

ফুল্লরা তখন তাঁর বারো মাসের দুঃখের কথা দেবীকে শোনাতে লাগলে দেবী বললেন এই দুঃখ বর্ণনা আসলে ফুল্লরার চাতুরী। দেবীর কথায় ফুল্লরা রেগে গেলেন, দেবী তখন ফুল্লরার উদ্দেশ্যে বললেন তিনি কালকেতুকে ধন দিতে এসেছেন-

'তুমি জে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।

দিয়া আপনার ধন দুঃখ নেবারিব।।

কালু হবে মহারাজা তুমি হবে রাণী।

তোমার মহিমা হবে ভরিয়া মেদিনী।।'

ফুল্লরা মাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে তখন কালকেতুকে ডেকে আনার জন্য রওনা দিলেন। ফুল্লরার মুখে দেবীর সমস্ত বিবরণ শুনে কালকেতু মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেও গৃহে ফিরে দেবীকে দেখে প্রণত হলেন। তারপর তিনি দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে দেবী তাঁর বাড়িতে বসবাসের অভিপ্রায় জানালেন। দেবীর এই অভিপ্রায় শুনে কালকেতু ধনুবাণ তুলে দেবীকে হত্যার চেষ্টা করলে দেবীর হুঙ্কারে কালকেতুর বাণ ধনুতেই লেগে রইল।

'এত বলি ক্রোধ হৈল ব্যাধের কুঙর।

ভানু সাক্ষী করি বীর ধনুকে জোড়ে শর।।

একবাণে আজি পাঠামু যম ঘর।

ভয়ে ভবানীর গাও কাঁপে থর থর।।

এক সময়ে নারায়ণী হুংকার ছাড়িল।

ধনুকের পৃষ্ঠে বাণ লাগিয়া রহিল।।'

দেবী তখন নিজের অঙ্গুরী খুলে কালকেতুকে দিলেন এবং তাঁর ও ফুল্লরার সামনে শবারূঢ়া কালিকামূর্তিতে অবতীর্ণ হলেন।

দেবীর এই রূপ দর্শনে উভয়ে মূর্ছিত হলেন। অতঃপর দেবীর পাদস্পর্শে উভয়ে চৈতন্য পেলে দেবী তাঁদের সাত মাঠ ধনের সন্ধান দিলেন। কালকেতু তখন দেবীর হাতের কঙ্কণ প্রার্থনা করলেন এবং তা দিয়ে পুরাই দত্তের নিকট থেকে তাঁর বদলে খনতা কোদাল এনে পুনরায় দেবীকে নিজমূর্তি ধারণ করতে বললেন এবং দেবীর চরণ ধরে সেখানেই থাকতে অনুরোধ করলেন।

দেবীর কৃপায় কালকতে সাত মাঠ ধনে আশিমন স্বণমুদ্রা পেলেন। দেবী কালকেতুকে সেই অর্থে নগর পত্তন করে শনি-মঙ্গলবারে বলিদান সহকারে পুজার নির্দেশ দিয়ে কৈলাসে ফিরে গেলেন। দেবীর নির্দেশ মতো গুজরাটের বনজঙ্গল কেটে নগর পত্তন করে কালকেতু রাজা হয়ে বসলেন এবং দেবীর সহায়তায় কলিঙ্গ নগরের প্রজাদিগকে এনে গুজরাট নগরীতে নানা জাতির বাসস্থান করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

ভাঁড়ু দত্ত এসে ভিক্ষা করার ছলে বাজারে নানা উৎপাত শুরু করলেন। কালকেতু ভাঁড়ুকে শাস্তি দিলেন। এতে ভাঁড়ু সুরথ রাজার শরণাপন্ন হয়ে গুজরাট নগর আক্রমণের ব্যবস্থা করলেন কিন্তু কালকেতু সুরথ রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন। দেবীর সহায়তায় কালকেতুর এই জয়ের কারণ অথচ কালকেতু একথা স্বীকার না করে ফুল্লরার কাছে যুদ্ধ জয়ের কারণ হিসেবে নিজ বাহুবলের কথা ঘোষণা করলেন। দেবী এতে রুষ্ট হয়ে সুরথ রাজাকে নির্দেশ দিলেন কালকেতুকে বন্দী করে আনতে। ভাঁড়ু ফুল্লরাকে ছলনা করে কালকেতুকে বন্দি করে আনেন এবং.সুরথ রাজা কালকেতুকে বন্দী রাখেন। অভাগিনী ফুল্লরা কান্নায় ভেঙে পড়লেন-

'তখন বলিলাম তোমারে না শুনিলা কানে।

প্রাণ হারাইলে তুমি মাঞা দুর্গার ধনে।।

ধনের কারণে প্রভু হারাইলে প্রাণে।

য়নাথিনী করিলেক ফুলুরা অভাগিনে।।’

বন্দিশালায় বহু দুঃখ-কষ্ট পেয়ে কালকেতু দেবী চন্ডীর স্তব শুরু করলেন, কালকেতুর স্তবে দেবী সন্তুষ্ট হলেন। দেবী সুরথ রাজাকে কালকেতুকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। মুক্তি পেয়ে কালকেতু গুজরাটে ফুল্লরার নিকটে ফিরে ভাড়ুর শাস্তিবিধান করলেন। অতঃপর ফুল্লরা ও কালকেতু পুত্র কামনায় দেবীর আরাধনা করতে থাকলে দেবী তাঁদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, দেবীর নির্দেশে তাঁরা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করলেন এবং দেবী তাঁদের দেব শরীর দান করে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন।

মানিক দত্তের কাব্যে দেখা যায়, কালকেতুর কাহিনি অবলম্বনে চার দিনের ব্রতগীতির ব্যবস্থা হওয়ার পর দেবী ভাবেন তাঁর অষ্টমঙ্গলায় বাকী চার দিনের গানের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি যখন এই চিন্তা করছেন তখন নারদ উপদেশ দিলেন নলকুবের পুত্র কর্ণমুনিকে মর্ত্যে নিয়ে গিয়ে দেবী বাকী চার দিনের মঙ্গলকাব্যের উপযোগী কাহিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন। নারদের কথায় দেবী উৎসাহিত হয়ে শিবের সঙ্গে কপট পাশাখেলায় মত্ত হলেন। এই পাশাখেলায় সাক্ষী ছিলেন কর্ণমুনি। দেবীর সঙ্গে শিবের পাশাখেলায় একবার চাল দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। দেবী কর্ণমুনিকে সাক্ষী রাখেন। দেবীর প্ররোচনায় কর্ণমুনি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দেবীর পক্ষ নেন। এতে শিব রুষ্ট হয়ে কর্ণমুনিকে নরজন্মের অভিশাপ দেন।

উজানী নগরের বণিক জয়পতির স্ত্রী উর্বশীর গর্ভে কর্ণমুনি ধনপতি নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে ইন্দ্রানীনগরের নিধুপতি বণিকের কন্যা লহনার সঙ্গে ধনপতির বিবাহ হয়।

লহনা বিবাহের আগে থেকে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করতেন কিন্তু বিবাহের পর তিনি দেবীর পূজা বন্ধ করে দেন।এতে দেবী রুষ্ট হয়ে মর্ত্যে উপস্থিত হয়ে লহনাকে অভিশাপ দিলেন-

‘দুর্গা বলে লহনা তোর কলির হৈল জ্ঞান।

আগে ভজন করি পাছে অপমান।।

কোপ দৃষ্টে শাপ দিল ত্রিপুরা ভবানী।

আমার শাপে হউক তোর দারুণ সতিনী।।

তোর কোলে জেন না হয়ে বংশধর।

বাঞ্ঝা হইয়া থাক তুমি পৃথিবী ভিতর ।।’

রত্নমালার নৃত্য দেখাতে ইন্দ্রলোকে গমন করলেন। সেখানে দেবীর মায়ায় দুইবার রত্নমালার তালভঙ্গ হলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে নরের উদরে জন্মলাভের অভিশাপ দেন। রত্নমালার অনুরোধে ইন্দ্র বলেন রত্নমালা আঠাশ বছর পর পুনরায় স্বর্গ ফিরে আসতে পারবেন। দেবী তখন ইন্দ্রলোক থেকে রত্নমালার জীব নিয়ে ইছানী নগরে নিধুপতির ভ্রাতা লক্ষপতির স্ত্রী রম্ভার উদরে স্থাপন করলেন। রম্ভা যথাসময়ে সন্তান প্রসব করলেন এবং কন্যার নাম রাখা হল খুল্লনা। এদিকে ধনপতি ও লহনার কোনো সন্তান না থাকায় স্বপ্নাদেশে উজানীর রাজা বিক্রমকেশরী আটকুঁড়ে অপবাদ দিয়ে ধনপতির রাজ দরবারে আসা বন্ধ করে দিলেন।

বাড়ি ফিরে ধনপতি স্ত্রীর নিকটও কটুক্তি শুনে মনক্ষুণ্ণ হয়ে পায়রা উড়াতে গেলেন। হারানো পায়রার সন্ধানে ধনপতি ক্রমে নিধুপতির বাড়িতে এলে খুল্লনাকে দেখে তাঁর রূপে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ধনপতি তখন খুল্লনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে ধনপতি নিজ ভাইঝির সতীন হওয়ার আশায় সেই বিবাহে সম্মত প্রদর্শন করেন। শেষে ঘটক ঠাকুরের মধ্যস্থতায় সেই বিবাহ নিষ্পন্ন হল।

বিবাহের পরপরই ধনপতি উজানী নগরে ফিরে গেলেন। এই সময় বিক্রমকেশরীর হাতে শুক-শারী দুটি পাখি এসে যাওয়ার সোনার খাঁচার প্রয়োজন হয়। উজানীর রাজা পাত্রমিত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে ধনপতিকে গৌড়দেশ থেকে সোনার খাঁচা গড়িয়ে আনার আদেশ দেন। ধনপতি রাজার কথায় প্রথমে অসম্মত হলে শেষে বাধ্য হয়ে গৌড়ে যেতে সম্মত হন,

বাড়িতে ধনপতির অনুপস্থিতিতে লহনা জাল চিঠি রচনা করে খুল্লনাকে ছাগল চড়াতে বাধ্য করেন।

চণ্ডীর মায়ায় বনে খুল্লনার ছাগল হারিয়ে যায়। ছাগলের অনুসন্ধানে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে পঞ্চবিদ্যাধরীর চণ্ডীব্রত পূজা দেখে ছাগল প্রাপ্তির আশায় খুল্লনাও দেবীর পূজা করেন।

দেবী মহিষমর্দিনীরূপে খুল্লনাকে দেখা দেন এবং দেবীর কৃপায় খুল্লনা ছাগল ফিরে পান। দেবী অতঃপর লহনাকে স্বপ্নে খুল্লনার ব্যাপারে সতর্ক করেন। লহনা খুল্লনার প্রতি দুর্ব্যবহার বন্ধ করেন। ধনপতি গৌড়নগর থেকে ফিরে এলে খুল্লনার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়। চণ্ডী এই সময় ইন্দ্রকে দিয়ে স্বর্গের নর্তক মালাধরকে তালভঙ্গের অপরাধে বারো বছরের জন্য মর্ত্যবাসের অভিশাপ দেওয়ালেন। ইন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত মালাধর দুই স্ত্রী সহ প্রাণত্যাগ করলেন। চন্ডী এই তিনজনের জীব নিয়ে মর্ত্যে এসে মালাধরের জীব খুল্লনার গর্ভে এবং তাঁর দুই স্ত্রীর জীব যথাক্রমে সিংহল রাজের স্ত্রী নীলাবতী ও উজানীরাজ বিক্রমকেশরীর স্ত্রী জয়াবতীর গর্ভে স্থাপন করেন। পরে খুল্লনার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে নাম হয় শ্রীমন্ত, সিংহল রাজকন্যার নাম সুশীলা এবং উজানীরাজ বিক্রমকেশরীর কন্যার নাম জয়া।

এদিকে দেবীর চক্রান্তে রাজ প্রয়োজনে অনিচ্ছা সত্বেও ধনপতিকে সিংহল অভিমুখে যাত্রা করতে হল। খুল্লনা ধনপতির বাণিজ্য যাত্রাকালে পতির মঙ্গল কামনায় ঘট পেতে দেবীর পুজা শুরু করলেন, লহনা তা দেখে ধনপতিকে জানালে, ক্রুদ্ধ হয়ে ধনপতি দেবীর ঘটে বাম পদাঘাত করলেন।

‘লহনার বাক্য শুনি সাধু ক্রোধযুক্ত হইল।
জাত্রা ভঙ্গ করি সাধু নিজঘর য়াইল।।
য়ন্তরে জানিল দুর্গা ক্রোধিত ধনপতি।
ঘটছাড়ি যন্তধান হৈল্যা পার্বতী।।
ঘট পূজা দেখে সাধু কাপে থর থর।
বাম পাএ মারে লাথি ঘটের উপর।।’

এর ফলে যাত্রার শুভলগ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, নানা অমঙ্গলের ইঙ্গিত দেখা দিল। কিন্তু ধনপতি এই দুর্লক্ষণের মধ্যেও যাত্রা করলেন। খুল্লনা পুনরায় পূজার আয়োজন করলেন এবং একে একে নানা অঙ্গ কেটে দেবীকে উপহার দিলেন তা সত্ত্বেও দেবী সদয় হলেন না। শেষে খুল্লনা গলায় কাটারি দিয়ে মরতে উদ্যোগী হলে দেবী দেখা দিয়ে খুল্লনাকে জানালেন, তিনি ধনপতিকে প্রাণে মারবেন না, তবে বিপদে ফেলবেন-

'নহে প্রাণে মারিতাম নহে পাইতাম রুধির

সকল পাষুরিলাম তোমার কারণ।

প্রাণে না মারিমু য়ামি করিমু দুর্গতি

মগরাতে ডুবাইমু বুহিতের ধন।।

কালিদহে দেখাইমু কমলের বন।।'

দেবী তারপর মগরাদহে ধনপতির নৌকা কালিদহে পৌঁছালে দেবী ধনপতিকে কমলেকামিনী ও গজমূর্তি দেখালেন।

শেষে ধনপতির নৌকা সিংহলের রত্নমালার ঘাটে পৌছাল। সিংহল রাজের সঙ্গে দেখা করে ধনপতির কাছে কমলেকামিনীর কথা উত্থাপন করলে সিংহলরাজ তা বিশ্বাস না করে মিথ্যা বলার অপরাধে ধনপতিকে বন্দী করলেন। ধনপতির কাতর প্রার্থনায় দেবী ধনপতির মস্তকে হাত বুলিয়ে অনাহারে তাঁর বারো বছর বেঁচে থাকার শক্তি সঞ্চার করে দিলেন।

ধনপতির অনুপস্থিতে খুল্লনা শ্রীমন্তকে গুরুগৃহে বিদ্যাচচার জন্য পাঠালেন। সেখানে শ্রীমন্তের হঠকারিতায় পন্ডিত একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে জারুয়া বলে গালি দিলেন। এতে মমাহত ও ক্রুদ্ধ শ্রীমন্ত মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে দক্ষিণ পাটনে যাবেন বলে স্থির করলেন। পুত্রের এই যাত্রা উপলক্ষে খুল্লনা দেবীর পুজা করলে দেবী খুশী হয়ে হনুমান ও বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সাতটি ডিঙ্গা ভ্রমরার ঘাটে সোনার শিকলে বেঁধে রাখলেন।

'সাতখানি ভাসে ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।

গজে বাধ্যাছে ডিঙ্গা সোনার শিকলে।।’

শ্রীমন্ত চন্ডীপূজা করে জয়পত্র ও একটি অঙ্গুরী নিয়ে মাতাকে প্রবোধ দিয়ে সেই নৌকায় উঠলেন।

পথে ধনপতির মতো শ্রীমন্তও কমলেকামিনী এবং গজমূর্তি দেখলেন। শ্রীমন্ত পিতার মতো সিংহলে পৌঁছে সে কথা সিংহলরাজকে জানালে সিংহলরাজা পূর্বের মতো তা অবিশ্বাস করলেন। শ্রীমন্ত তখন সিংহল রাজাকে জানালেন তিনি যদি রাজাকে তা না দেখাতে পারেন তাহলে রাজা যেন তাঁর ধন লুঠ করে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণ মশানে নিয়ে গিয়ে তাঁর মস্তক ছেদন করেন। রাজাও শ্রীমন্তের কাছে অঙ্গীকার করলেন শ্রীমন্ত তাঁকে কমলেকামিনী ও গজমূর্তি দেখাতে পারলে তিনি রাজকন্যাসহ অর্ধেক রাজত্ব তাঁকে দেবেন। উভয়ে প্রতিজ্ঞ পত্র লিখে রাখলেন। দেবীর মায়ায় শ্রীমন্ত প্রথমে সিংহল রাজকে কমলেকামিনী মূর্তি দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় রাজা তাঁর প্রতিজ্ঞা মতো নগর কোটালকে তাঁর মস্তক ছেদনের জন্য দক্ষিণ মশানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। শ্রীমন্ত তখন দেবীর চৌতিশা স্তব শুরু করলেন। শ্রীমন্তের ‘চৌত্রিশ' স্তব শুনে দেবীর আসন টলল, দেবী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। দেবতারা অস্ত্র দিয়ে দেবীকে সাহায্য করলেন।

দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী বেশে কোটালের কাছে উপস্থিত হয়ে শ্রীমন্তকে দান হিসেবে পেতে চাইলেন। কোটাল দেবীর সেই আর্জি প্রত্যাখান করলে দেবী রূপ পরিবর্তন করে কোটালের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। কোটালের সঙ্গে যুদ্ধে দেবী জয়ী হয়ে চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে রক্তপানে নিরত হলেন। রাজা খবর পেয়ে মশানে গিয়ে দেবীর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

‘গলে বস্ত্র দিঞা রাজা বলে স্তুতি বাণী।

অপরাধ ক্ষেম মাতা জগত জননী।।’

দেবী সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে কমলেকামিনী মূর্তি ও কমল দেখালেন-

‘জলে সৃজে কমল   কামিনী কুঞ্জর বল।

সৃজন করিল শীঘ্রগতি ।

ইন্দ্রের ঐরাবত দেখ্যাছিল শ্রীমন্ত

দশগজ দেখ সাবধানে ।

কন্যা হঞা গজ গিলে দেখি রাজা পড়ে পেলে

কমল দেখিল শালবনে।।'

শ্রীমন্ত রাজাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণের কথা বললেন। রাজা নিজ কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিবাহ দিলেন। দেবীর কৃপায় পিতা ধনপতিকে শ্রীমন্ত চিনতে পারলেন, পিতা-পুত্রের মিলন হল-

'শ্রীমন্ত বলেন সাধু আমি তোমার পো।।

নিজ বিবরণ কথা শ্রীমন্ত কয়ে।

পিতা পুত্রে দুইজনে হইল পরিচয়ে ।।

শ্রীমন্ত বলেন পিতা করি নিবেদন।

আমি তোমার পুত্র না কর ক্রন্দন।।'

দেবীর স্বপ্নাদেশে ধনপতি, শ্রীমন্ত ও সুশীলা ফেরার পথে মগড়াদহে উপনীত হলে ধনপতির নৌকাডুবির কথা শুনে সুশীলা সেখানে, দেবীর পূজা করলেন এবং দেবীর কৃপায় ধনপতির সপ্তডিঙ্গা পুনরায় জেগে উঠল।

ধনপতি ধনজন পুত্রবধূসহ উজানীতে ফিরে এলেন। উজানীতে ফিরে ধনপতি রাজা বিক্রমকেশরীকে চন্দন নিয়ে দেখা করতে গেলে রাজা শ্রীমন্তের সমৃদ্ধি দেখে নিজ কন্যা জয়াকে শ্রীমন্তের হাতে তুলে দিলেন।

খুল্লনা, সুশীলা-শ্রীমন্ত ও জয়াকে একত্রে পেয়ে দেবীর পূজা করলেন। ধনপতিও গড়াগড়ি দিয়ে দেবীকে প্রণাম করলেন-

'আদ্য মন্ত্রে ধনপতি দুর্গাকে স্মরিল।

ভগতবচ্ছলা দুর্গা দরশন দিল।।

ধরণী লুটাঞা সাধু চরণ বন্দিল।

প্রসন্ন হইঞামাতা আশীববাদ দিল।।

সদএ হইঞা বর দিলেন ভবানী।

গোদ হৈল দূর চক্ষের ছুটে ছানি।।'

ধনপতির সংসার সমৃদ্ধির উজ্জ্বলতায় ভরে উঠল। কিন্তু ধনপতির সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না। দেবী সুশীলা, জয়া, শ্রীমন্ত ও খুল্লনাকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর শিষ্যদের সকলকে কাছে পেয়ে আনন্দিত হলেন। দেবীও কৈলাসে ফিরে গেলেন। মানিক দত্তের কাব্যের কাহিনি এখানেই শেষ হয়।

৯.৬: অনুশীলনী

১। কবি মানিক দত্তের ব্যক্তি পরিচয় ও কাব্য রচনা কাল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। কবি মানিক দত্তের দেবী চণ্ডীর পরিচয় দিন।

৩। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী নির্মাণ তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

৫। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯.৭: গ্রন্থপঞ্জি

১. চন্ডীমঙ্গল- সুকুমার সেন

২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- (প্রথম খন্ড) সুকুমার সেন

৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫. কবি মুকুন্দরাম- ক্ষেত্র গুপ্ত

৬. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- সনৎ কুমার নস্কর

৭. কবিকঙ্কণচণ্ডী- তরুণ মুখোপাধ্যায়

৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা- সুখময় মুখোপাধ্যায়

১০. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১১. চণ্ডীমঙ্গলকাব্য সৃষ্টি ও নির্মাণ- আদিত্যকুমার লালা

একক ১০। মানিক দত্তের কাব্যের বিশিষ্টতা

স্বতন্ত্রতা

বিন্যাসক্রম

১০.১ : লোকপুরাণের স্রষ্টা মানিক দত্ত

১০.২ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস

১০.৩ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলে গৌড়বঙ্গের সমাজজীবন

১০.৪ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র-চিত্রন

১০.৫ : চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় মানিক দত্তের স্বতন্ত্রতা

১০.৬ : অনুশীলনী

১০.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

১০.১: লোকপুরাণের স্রষ্টা মানিক দত্ত

মানিক দত্ত তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'দেবখণ্ডে' 'সৃষ্টি-কথা' বর্ণনার পর পরই সর্ব দেবতার রাজা গণেশের জন্ম-প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। এই গণেশ প্রাচীন দেবতা । আমরা জানি, রামায়ণ- মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ হিন্দুধর্ম ও চর্যার প্রধান গ্রন্থ। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন- "বেদ-উপনিষদ্ আমাদের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চর্য্যার ভিত্তি-স্বরূপ পরোক্ষে লোকচক্ষুর অন্তরালে অরস্থিতি করিতেছে বটে, কিন্তু যে শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম অবস্থান করিতেছে, যে শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কায়া বলিতে পারা যায়, সে শাস্ত্র হইতেছে আমাদের ইতিহাস ও পুরাণ ।"

পৌরাণিক যুগের পরে মহাভারতের যুগে গণেশ দেখা দিলেন নতুন দেবতা রূপে। সিদ্ধিদাতা গণেশ হয়ে গেলেন লেখক গণেশ।

বেদব্যাসের পূজা পেয়ে তাঁর মনকল্পিত মহাভারত রচনায় গণেশ রাজী হয়ে গেলেন। অর্থাৎ মহাভারত পুথি রচনার সময় বেদব্যাসের স্টেনোগ্রাফার বা শ্রুতিলেখকের কাজ করেছিলেন গণেশ। আবার, মহাভারতের পরের প্রাচীন সমাজে রুদ্র শিবের মুখ্য অনুচররূপে গণেশকে কল্পনা করা হয়েছে। এই গণেশ ভয়ংকর, ভীষণ ভয়ের ও প্রচণ্ড বিঘ্নের অপদেবতারূপে পরিগণিত হয়েছে। এই দৃষ্টিতে তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধসমাজে 'জম্ভল' নামেও পূজা পেয়েছিলেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধরা “জাভল" নামে যে দেবতার পুজো করেন তাঁর সর্বদা ভুড়ো পেট কিন্তু মুখ সব সময় হাতির মতো নয়। পুরাণের মতো তান্ত্রিক আচারেও সবার আগে বিঘ্ন বিনাশন গণেশের পূজার প্রচলন ছিল।

পুরাণ, মহাভারত, প্রাচীন সমাজ ও তান্ত্রিক মত থেকে গণেশ ভাবনার বিচিত্র স্তর উপস্তরে নানা স্বপ্নকল্পনাকে এক করে বাংলার জনসমাজ গণেশ সম্বন্ধে তার এক নিজস্ব লোকধারণা গড়ে তুলেছিল। লোকসমাজে গণেশকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাহিনিও গড়ে উঠেছিল। আমরা সকলেই জানি নদীমাতৃক বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা, কৃষি, শস্যে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেশ। ইঁদুর প্রতিবছর বাংলাদেশের ফসলের ক্ষতি করতো । কৃষক সমাজ ইঁদুরকে ভীষণ ভয়ংকর অপদেবতা গণেশের বাহন বলে স্বপ্রকল্পনায় ভেবে গণেশের পূজা শুরু করলেন। আর এভাবেই বাংলার লোকসমাজে পূজা প্রচলিত হয়ে গেল গণেশ দেবতার। গণেশ হস্তীমুখ কেন? লোকসমাজ এবার এ প্রসঙ্গ তুলল? এর নানা কাল্পনিক ব্যাখ্যাও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াতে লাগল। চন্ডীকবি এই সব উপাদান সংগ্রহ করে জোড়া দিয়ে কবিত্ব-শক্তির জোড়ে গড়ে তুললেন গণেশের এই কাহিনি-

শিব-চন্ডীর বিয়ের কিছু দিন পর দুর্গা একদিন নিজের গাত্রমল পিণ্ড করে সেই মল দিয়ে একটি পুতুল বানিয়ে শিবকে দেখালেন। কৌতূহলবশত শিব তাতে প্রাণ-সংযোগ করলেন। পুতুলটি তখন শিশুপুত্রের রূপ লাভ করল। শিব এর নাম রাখলেন গণেশ। দেবসমাজ শিবের এহেন সৃষ্টির কথা শুনে গণেশকে দেখার জন্য ছুটে এলেন। কিন্তু শনির কোপ-দৃষ্টি গণেশের উপর পড়ায় গণেশের মুণ্ড উড়ে গেল। শিব তখন চন্ডীকে আদেশ দিলেন-

উত্তর মুণ্ডে যেবা থাকে য়ান তার মাথা।।

উত্তর মুণ্ডে শুঞ ইন্দ্রের হস্তি ছিল।

হস্তির মুণ্ড কাটি চন্ড শিবকে য়ানি দিল।।

মন্ত্র জপি শিব ঠাকুর মুণ্ড জোড়া দিল।

শুণ্ড মুণ্ডে গণপতি উঠিয়া বসিল।।

গণেশের এই রূপ দেখে দেবী দুর্গা দেব-সমাজে গণেশের বেমানান রূপের কথা বলে কাঁদতে থাকলে শিব গণেশকে দেবতার রাজা করে দেন-

মুণ্ডের মধ্যে শুন্ড দেখি কান্দে দুর্গামাতা।

শিবঠাকুর বলে দুর্গা শুন মোর কথা।।

গণেশকে করিলাম দেবতার রাজা।

দেবগণের আগে হবে গণেশের পূজা।।

মানিক দত্ত গণেশের জন্মবৃত্তান্তকে যেভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন, পরবর্তী কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীও অনুরূপভাবে তাঁর কাব্যে এই জন্মকাহিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন। মুকুন্দের মতেও গণেশ হল গড়া দেবতা। পার্বতীর সখী জয়া ও বিজয়া একদিন দেবী পার্বতীর গাত্রমার্জনা করে প্রচুর ময়লা তোলে। এরপর এই ময়লা কোথায় ফেলবে তা ভাবতে থাকে। এরকম অবস্থায় তাদের হঠাৎ মনে হয় এই ময়লা দিয়ে একটা পুতুল বানালে কেমন হতো। যেমন ভাবনা তেমন কাজ; তারা একটা পুতুল বানাতে শুরু করল কিন্তু মাটির অভাবে আর মাথা তৈরি করা গেল না। শিব জয়া-বিজয়ার এই পুতুলটি দেখে খুশি হয়ে হাতির মাথা কাটিয়ে এনে তাতে জুড়ে দিয়ে প্রাণসঞ্চার করলেন। শিব এবার এই হস্তীমুখ সন্তানকে পার্বতীর কোলে দিয়ে বললেন, ‘এই নাও তোমার ছেলে’। পার্বতী গণেশকে আদর করতে থাকলেন; শিব ও পার্বতীর সঙ্গে এভাবেই যোগ রচিত হয়ে গেল।

কার্তিকের জন্ম-প্রসঙ্গ বর্ণনায়ও কবি মানিক দত্ত বাংলাদেশের মানুষের যৌথ স্বপ্নকল্পনাকে যথার্থ রূপ দিয়েছেন। সেজন্য, কার্তিকের পৌরাণিক কল্পনায় তিনি বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন-কল্পনার অনুসারী নানা পরিবর্তন ও পরিবর্জন ঘটিয়েছেন।

কার্তিকের জন্মের কথা আমরা বিস্তৃতভাবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, কুমারসম্ভব ইত্যাদি গ্রন্থে পাই। মদনের ফুলশরের আঘাতে শিবের তপস্যা ভাঙলে শিবের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মদন ভস্মীভূত হয়। শিব তপের বিঘ্ন ঘটায় স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। রতি উচ্চৈঃস্বরে কাদতে লাগলেন। বসন্তকে ডেকে রতি সহমরণে যাবেন বলে চিতা সাজাতে বললেন। চিতা সাজান হল, রতি যখন দেহত্যাগের জন্য উদ্যত, তখন দৈববাণী হল- রতি যেন প্রাণত্যাগ না করেন। উমা তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করলে মহাদেব উমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন তখন মদন আবার বেঁচে উঠবেন। তখন রতি ও মদনের পুনরায় মিলন হবে।

রতি প্রাণত্যাগে বিরত হলেন। এদিকে উমা নিজের রূপগুণের দ্বারা শিবকে প্রসন্ন করতে না পেরে শিবকে পাওয়ার জন্য মৈনাকে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নে উমা চারিদিকে আগুন জ্বেলে তার মধ্যে বসে সূর্যপানে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। শীতকালে হিমালয়ের তুষার শীতলজলের মধ্যে বসে তপস্যা করতেন। ফলমূল ত্যাগ করে উমা গাছের যে পাতাগুলি ঝরে পড়ত, শুধু সেগুলিই আহার করতেন। শেষে তাও ত্যাগ করলেন। সেজন্য তার নাম হল অপর্ণা ।

এরূপ কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তপস্বী ব্রাহ্মণের বেশে মৈনাকে পরীক্ষা নিতে এলেন। ছদ্মবেশী শঙ্কর উমার কাছে নিজের অজস্র নিন্দা করতে লাগলেন এবং বললেন- শ্মশানচারী বলদ বাহন মহাদেবকে বিবাহ করলে উমার আর দুর্দশার অবধি থাকবে না। একথা শুনে উমার ধৈর্য্যচ্যুতি হল। উমা রাগ করে স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হলেন। শিব তখন নিজ-মূর্তি ধারণ করলেন। শিবের প্রকৃত রূপদর্শনে উমা লজ্জায় অবনতমুখী হলেন। অতঃপর শিব-উমার বিবাহ সংঘটিত হল।

বিবাহের কিছুকাল পর উমার গর্ভে শিবের সন্তান কার্তিকের জন্ম হল। জন্মের পর ছয় কৃত্তিকা ভগিনী কার্ত্তিককে প্রতিপালন করেছিলেন- সেজন্য এই পার্বতী নন্দনের নাম

হয়েছিল কার্তিক বা কার্তিকেয়। ছয় ধাত্রীর স্তন্য একসঙ্গে পান করার জন্য কার্তিকেয়ের ছয়টি মুখ উদ্গাত হয়েছিল, সেজন্য কার্তিকের আর এক নাম ষড়ানন। দেবতারা কার্তিকের জন্মের সন্ধান পেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগে তাকে সেনাপতি পদে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি আবার দেব সেনাপতিও।

কবি মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে পুরাণের কার্তিকের এই জন্ম কথাকে লোকসমাজের প্রচলিত অনুরূপ কথায় পরিবর্তিত করে 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের একটা ধারাগত ঐতিহ্যের রূপ দেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, শিবের অমর বিন্দুতে দুর্গার গর্ভে কার্তিকের জন্ম হলেও সেই তেজোদীপ্ত গর্ভকে দুর্গা তিন মাসের বেশি ধারণ করতে পারেননি। তিনি অগ্নির উপর গর্ভপাত ঘটিয়ে দেন। অগ্নিও দুর্গার মতো তিন চার মাস পর সেই গর্ভ গঙ্গাজলে বিসর্জন দেন। গঙ্গাও পূর্বসুরীদের মতো তিন চার মাস পর সেই গর্ভকে বনের মধ্যে রেখে দেন। শেষে বনে ছয় মস্তক বিশিষ্ট শিব পুত্র কার্তিকের জন্ম হয়। জন্মের পর কার্তিককে চন্দ্রের ছয় নারী প্রতিপালন করে বড় করে দুর্গাকে ফিরিয়ে দেন। দুর্গা তখন মহানন্দে এই ষড়াননকে কোলে নিয়ে ছয় মুখে স্তন্য পান করিয়ে কার্তিক নাম দিয়ে সাদরে গ্রহণ করেন। জন্মের পর গণেশের মূষিকের মতো কার্তিকও ময়ূরকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেন। মূষিকের মতো ময়ূরের সঙ্গেও কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, কবি বাংলাদেশের লোকপ্রচলিত গল্পকেই এখানে মান্যতা দিয়েছেন। দেবতারা কার্তিককে দেব সেনাপতি পদে বরণ করে নেন। মানিক দত্তের মতো এই কাব্যধারার অপর কবি কবিকঙ্কণও একইভাবে কার্তিকের জন্মকথার বর্ণনা দিয়েছেন।

গণেশের মতো কার্তিকের জন্মকথা বর্ণনায় কৰি মানিক দত্ত বাংলাদেশের সমসময়ের স্বপ্নকল্পনা বিশ্বাসকে এমনভাবে রূপ দিয়েছেন যা পরবর্তীকালের কবিদের কাহিনিকে সমানভাবে প্রভাবিত করেছে।

পার্বতী, উমা, সতী, চন্ডী ও দুর্গার ধারা মিলিত হয়ে বাংলাদেশে কালিকা দেবীর ধারাটি পুষ্ট হয়ে কালক্রমে অন্যসব শক্তিধারার কথাকে ম্লান করে দিয়েছে। কালিকা দেবীর প্রথম ধারণা পাওয়া যায় বেদের রাত্রিসূক্তে। সেখানে এক রাত্রিদেবীর কথা পাওয়া

যায়। পরবতীতে 'শতপথ ব্রাহ্মণে' রাত্রিদেবীকে 'কৃষ্ণা' ও 'ঘোরা' বলা হয়েছে এবং 'ঐরতেয় ব্রাহ্মণে' নিঋতি দেবীকে পাশহস্তা বলে সেই নির্ঋতি দেবীর পাশ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে 'বৈদিক সাহিত্যে' কালী এই নামটি আমরা প্রথম দেখতে পাই 'মুণ্ডকোপনিষদে'। এখানে কালী যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি জিহ্বা-

কালী করালী চ মনোজবা চ

সুলোহিতা যা চ সুধুম্রবর্ণা।

স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী

লোলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।।

'মহাভারতে'ও কালীর উল্লেখ আছে। 'সৌপ্তিক পর্বে' দেখতে পাই, দ্রোণের মৃত্যুর পরে দ্রোণ পুত্র অশ্বথামা যখন রাত্রিতে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে নিদ্রিত বীরগণকে হত্যা করেছিলেন তখন সেই হন্যমান বীরগণ ভয়ংকরী কালীদেবীকে দেখতে পেয়েছিলেন। এই কালীদেবী রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা এবং ভয়ংকরী।

মানিক দত্ত তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালীর পদতলে শিবের শয়ান হওয়ার ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে সমাজ জীবনের গণ-মনোভাবটিকে মর্যাদা দিয়েছেন।

বস্তুত উপরের দেবদেবীর এই প্রসঙ্গগুলিতে লোককবি মানিক দত্ত বাংলার লোক-সমাজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বপ্ন-কল্পনা তাদের চৈতন্যের নিজ্ঞান স্তর থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে যেভাবে প্রতীকায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, তাকেই রূপ দিয়েছেন। ফলে এই সবের মধ্যে লোক-সমাজ নিজের মনোভাবনার প্রতিফলন পেয়ে তাকে সত্য বলে ধরে নিয়ে মিথ বা লোকপুরাণের মর্যাদা দিয়েছে এবং জনপরম্পরায় বাহিত হয়ে আজও সেসব কথা লোকবিশ্বাসের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

১০.২: মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস

বাংলাদেশের বর্ণাশ্রমী সমাজে দশটি সংস্কার-গর্ভধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিক্রমণ, অন্ন প্রাশন, চুড়াকর্ম, উপনয়ন এবং বিবাহবিধি ধর্মের অঙ্গরূপে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে কোনো বিশেষ যুগে বা বিশেষ সমাজে সব সংস্কারগুলি একসঙ্গে যে বিদ্যমান ছিল তা কিন্তু নয়। স্মৃতিশাস্ত্র সমর্থিত এই সংস্কারগুলি জীমূতবাহন, শুলপাণি, রঘুনন্দন, দেবীবর প্রমুখ পণ্ডিতের গ্রন্থে সামাজিক জীবনের উপযোগীরূপে সংস্কৃত হয়ে পরিমার্জন ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ নতুনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেছিল অর্থাৎ সংস্কার ও বিশ্বাসগুলিও যুগে যুগে পরিবর্তন লাভ করেছিল। তাছাড়া, মধ্যযুগের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে সামাজিক বিশ্বাস- অবিশ্বাস ও সংস্কারগুলি ছিল কৌম জীবনভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলত মধ্যযুগের কবিরা যিনি যেখানে আবির্ভূত হয়ে কাব্যরচনা করেছেন সেই অঞ্চলের বিশ্বাস-অবিশ্বাসগুলিকেই রূপ দিয়েছিলেন। গৌড়বঙ্গের কবি হওয়ার সুবাদে মানিক দত্তের কাব্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বীসগুলির মধ্যে আমরা তাই গৌড়বঙ্গের সংস্কার ও বিশ্বাসগুলি প্রতিফলিত হতে দেখি।

মানিক দত্তের কাব্য থেকে জানা যায়, তখন কোনো কুলবধু প্রথম গর্ভবত পর তাঁর অনাগত সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাঁকে কেন্দ্র করে পারিবারিক পালনের রীতি গড়ে ওঠত। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে “সাধ' খাওয়ানোর রীতি ছিল। গর্ভের পাঁচ কিংবা সাত মাস কালসময়ে পড়শী কিংবা বাড়ির সধবা এয়োরা পরিপাটি করে গর্ভবতী নারীকে সাধ খাওয়াতেন-

রাইহগণে বার্তা দিঞা দুবুলা আইল
রন্ধন করিছেন লহনা।
বেঞ্জনের পরিপাটী কতেক নাবুয়া ভাজি
ভোজনে বসিল দুইজনা।।
খুলুনা খাইল সাধের সাধ গয় করে উতপাত্

শীতল মাঝিয়াএ নিদ্রা জাএ।

তারপর গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে গিন্ত্রণা শুরু হলে অভিজ্ঞ দাই-এর তত্ত্বাবধানে প্রসব ক্রিয়া সম্পন্ন হতো। প্রসবকালে গর্ভবতী রমণীদের ইষ্টনাম জপ করার রীতি ছিল-

খুল্লনার নাড়িল গাঅ কাছে নাই বাপ মাএ।

বড় পুণ্যে এহিকালে খুলনা প্রসব হএ।।

দাই ডাকিয়া আনে দুবুলা কিন্করী।

ছন্দ বন্দ করি ঘরে প্রবেশিল ছেড়ি।।

ভবানী স্মরণ করি তিন শূল দিল।

জএ জএ ছাইলা ভূমিস্ট হইল।।

প্রসবের পর সোনার কাটারি দিয়ে সন্তানের নাড়িচ্ছেদ করানো হতো, নাড়িচ্ছেদের পর সন্তানকে স্নান করানো হতো। স্নান শেষে সন্তানকে মায়ের কোলে তুলে দেওয়া হতো। সন্তানের পাঁচ দিন বয়সে পাঁচটি, ছয়দিনে ষষ্ঠী ও একমাস বয়সে নামকরণ এবং ছয়মাস বয়সে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হতো-

পঞ্চ দিনের ছ্যালা পাচটি করিল।

পুত্র কোলে করি দুয়ারে বসিল।।

ষষ্ঠী পুজিতে জদি খুলনা নড়িল।

আইহগণ আসি তথা জয়ধ্বনি দিল।।

রূপগুণে হৈল ছাল্যা পরম সুন্দর।

তুলনা দিতে নাই ইন্দ্রের বিদ্যাধর

একমাসের হৈল জদি সাধুর নন্দন

তবে তারে করাইল ই নামকরণ

শতকে ছাইলার নাম দূরে তে রাখিআ

শ্রীমন্ত বলিঞা নাম রাখিল বাছিএগ্রা

শ্রীমন্তের জন্মনাম ভাল নগরে শুনিল

পাত্র মিত্র রাজা সহে আনন্দিত হৈল

জয় জয় রোল হয় এই মন্ত্র শুনি।

বিবাহ করিতে সাধু চলিল আপনি।।

বিয়ের শোভাযাত্রা কনের বাড়িতে পৌঁছালে বড়যাত্রী সহ বরকে বাড়ির উঠোনে বসতে দেওয়া হতো। উঠোনের একপাশে ছায়ামণ্ডপ তৈরি করা হতো। উপস্থিত পুরোহিতের বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিসাক্ষ্য রেখে বরকনে সেখানে পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতো। বিয়ের শেষ পর্যায়ে কনের বাবা জামাইকে বহু দানসামগ্রি যৌতুক হিসেবে উপহার দিতেন। এরপর পাত্র-পাত্রীর শুভদৃষ্টি সম্পন্ন হতো। শুভদৃষ্টির পর পাত্র-পাত্রী একে অপরকে লক্ষ্য করে কপট ফুল ছোড়াছুড়ি খেলায় মত্ত হয়ে উঠতো। সবশেষে “মালাবদল' পর্ব। বর ও কনে পরস্পর পরস্পরকে ফুলের মালা পরিয়ে দিত। মালাবদলের পর নববধূ বাসর ঘরে প্রবেশ করতো। বাসর ঘরে প্রবেশের পর চলতো জামাই ভোজন পালা। বিভিন্ন খাদ্য-সামগ্রি জামাই আয়াস করে খেত। ভোজন শেষে হরষিত চিত্তে নবদম্পত্তি বাসর ঘরে নিশিযাপন করতো।

নিশিযাপনের পর প্রভাত বেলায় শুরু হতো বিদায়পর্ব। নববিবাহিতা বধূকে বর বাড়ি নিয়ে ফিরে আসার প্রাক্কালে বিয়েবাড়ির উপস্থিত এয়োস্ত্রীগণ বরকে উঠোনে বসিয়ে জলধারা দিয়ে নানা মঙ্গলাচার পালন করতেন। তারপর বর ও কনে চৌদুলিতে উঠতে গেলে বিচ্ছেদ রসে ভারাক্রান্ত সকলেই কীদতে শুরু করতেন। একসময় কান্নার মধ্যেই বর শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করে চৌদুলিতে উঠে বসলে কন্যা তাকে অনুসরণ করতেন-

ধনপতি শ্বশুরকে প্রণাম করিল।

বিদায় হইএগ্রা সাধু দোলাতে চড়িল।।

বাজানিঞা বাজাএ বাজাএ নানা মতে।

খুলুনা স্বামীর কোলে চড়িল দোলাতে ।।

বিচ্ছেদ আসন্ন দেখে কন্যার মা কন্যাকে শ্বশুর বাড়িতে তার পালনীয় কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন-

ইষ্ট মিত্র সাধুর আসিবে সবর্জন।

তার আগে তুমি না ডান্ডাবে সবর্কক্ষণ।

গৃহে বাসি কম্ম করি স্নানকে জাইবে।

চতুর্দিকে দেখি তুমি স্নান করিবে।

সকলকে খাওয়াইহ করিয়া রন্ধন।

অবশেষে জেবা পায় করিহ ভোজন।।

তারপর শত আশীর্বাদ-ধবনির মধ্য দিয়ে বিদায় পর্ব সমাপ্ত হয়। মানিক দত্ত তীর 'চণতীম্গল' কাব্যে কান্না-হাসির এক মিশ্র রসাবেদনে "বিবাহপর্ব'কে জীবন্ত করে এঁকেছেন। মানিক দত্তের কাব্য থেকে মৃত্যু বিষয়ক সংস্কার সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র পরোক্ষ সূত্র থেকে অনুমান করা যায় তখন শবদাহের রীতি ছিল। ধর্মের মৃত্যুর পর উলুকের পরামর্শে শিব ধর্মের শবদেহকে দাহ করে সৎকার করেন-

উলুক পক্ষ বলে শিব শুনহ বচন।

উরু স্থলে পিতাকে করাহ দাহন।।

উরু স্থলে পিতাকে শিব করিল দাহন।

শুন্য থাকি ডাকিএা বলিল ধর্ম নিরঞ্জন।।

মানিক দত্তের সময় বাংলার লোকজীবন ছিল অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী, আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বলচিত্ত। ফলে নানা ক্ষেত্রে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটলে নানা

বহিঃশক্তির প্রভাবের কল্পনা করে তারা ঘটনার কার্যকারণ সুত্র নির্ণয়ের চেষ্টা করতো। লোকসমাজ এই শ্রবণতাবশেই প্রাত্যহিক জীবনের পূর্ণতা ও অপূর্ণতা বিষয়ে নানা দর্শনীয় বস্তু ও প্রাণীকে দায়ী হিসেবে গণ্য করতো। স্বাভাবিকভাবেই দুর্বল মানুষের এই সব ভাবনা থেকেই সৃষ্টি হয় যাত্রাপথের শুভাশুভ নির্ণয়-বিষয়ক বিশ্বাস ও সংস্কারগুলির।

তখন সমাজে নারী ও পুরুষের অমঙ্গলসুচক বিশ্বাসগুলি ছিল আলাদা আলাদা। ভদ্রা তিথিতে (প্রতিপদ তিথি) কোথাও গমন করা, গমনকালে মাথার উপর দিয়ে শকুনের পাকসাট মারা, রাস্তায় চলতে চলতে অঙ্গহীন বানরের সাক্ষাৎ লাভ করা, রাস্তার বামপাশে সাপ ও ডানদিকে শৃগালের সাক্ষাৎ লাভ করা- সবকিছুকে অমঙ্গলের চি বলে ধরা হতো-

ভদ্রাকালে ধনপতি জাত্রা করিল।।

জাত্রা করি ধনপতি রহিল পুরের বাহিরে।

মোসানীতে ঠুটা বানর নাচায়ে।।

আকাশেতে সর্ব্ব করে মার কাট।

সম্মুখে গৃধিণী পাখার মারে সাট।।

বামে সর্প দেখিল সাধু ডাহিনে জাম্বকি।

জাত্রাকালে অমঙ্গল দেখি মনে হৈল দুখি।|

নারীরা নিজ দেহের বাম অঙ্গের কম্পন, ডান চোখ নাচা, কালপেচার ঘন ঘন ডাক শুনতে পাওয়াকে নিজেদের অমঙ্গলের পূর্বাভাস বলে মনে করতো-

বাময়ঙ্গ কাপে মাতার দক্ষিণ লোচন।

কৈলাসেতে কালপেচা ডাকে ঘন ঘন।।

অমঙ্গল দেখি দুর্গা পদ্মাকে ডাকিল।

শুনিএ দুর্গার বাক্য ভাবিতে লাগিল।।

যাত্রাকালে এইসব অমঙ্গলসূচক চিহের পাশাপাশি কিছু কিছু লক্ষ্মণকে মঙ্গলের সূচক বলেও ধরা হতো। যাত্রাকালে কেউ যদি ব্রাহ্মণকে কোনো মন্দিরে ঘটের সামনে বসে পূজা করতে দেখতেন তাহলে হাকে মঙ্গলের সূচক বলে ধরা হতো। তাছাড়া, যাত্রার প্রাকালে গোয়ালিনীর দই ও জেলের মাছ বিক্রি করতে যাওয়ার চিত্র দর্শন করা ছিল মঙ্গলসূচক-

জাত্রাকালে দধিমছ্য সকল দেখিল।

সাধু ধনপতি বলে জাত্রা ভাল হৈল।।

তখন যে কোনো শুভ কাজ শুরু করার আগে দিন, লগ্ন, রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদি ভালোভাবে বিচার করা হতো। এসব বিচার করতেন দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষীরা। দৈবজ্ঞরা হতেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মানুষ-

বিধি নিতে গেল তারা পণ্ডিতের ঠাঞ্জী।

আইল পণ্ডিত হস্তে পাঞ্জী করিঞা।।

এই দৈবজ্ঞরা অনেকেই ছিলেন কপট ও শঠ, অল্প কয়েকজন নিজস্ব পেশার প্রতি দায়বদ্ধ । যাঁরা রাশি, নক্ষত্র বিচার করে সব কিছু নির্ণয়ের চেষ্টা করতেন তাঁদের সবসময় উপযুক্ত পারিশ্রমিক জুটতো না। তাছাড়া, মন মতো গণনা না হলেও অনেক সময় শাস্তি কিংবা দৈহিক নির্যাতন জুটতো। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রা করবেন। দৈবজ্ঞ এসে খড়ি পেতে গণনা করে দেখলেন ধনপতির যাত্রাপথে বিপদ আছে। এই সত্যকথা ধনপতিকে জ্ঞাপন করালে ধনপতি নফরকে গলাধাক্কা দিয়ে দৈবজ্ঞকে বের করার আদেশ দিয়েছেন-

কোন দিগ গেল মোর নাএর গাঙুর।

ঘারে হস্ত দিআ বেটা গণকের বাহির কর।।

মানিক দত্তের সমাজ মন্ত্রতন্ত্র, তুক-তাক, বশীকরণ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করতো। মানুষ বিশ্বাস করতেন মন্ত্র পড়ে মানুষ মারা যায়। লোকসমাজের এই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে দুর্গার মন্ত্র পড়ে মানুষ মারার এই ঘটনায়-

হুহুঙ্কার ছাড়ি দুর্গা কুন মন্ত্র জপে।

কতলক্ষ সেনা মৈল মন্ত্রের প্রতাপে।।

যুবতী স্ত্রী খুল্লনার রূপযৌবনের আকর্ষণে ধনপতি মুহু মুহু আকৃষ্ট হয়েছেন। বিগত যৌবনা লহনার সে সব দৃশ্য সহ্য হয়নি। তাই তিনি দাসী দুবলার সঙ্গে কুপরামর্শ করে দুবলার কাছে স্বামী বশীকরণের টোটকা শিখতে চেয়েছেন। লহনার অনুরোধে দুবলা তখন লহনাকে স্বামী বশীকরণের টোটকা শিখিয়েছেন এভাবে- তখনকার পুরুষশাসিত সমাজ বিশ্বাস করতো স্বামীই নারীর সব। স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের জীবন অর্থহীন।সমাজের এই বিশ্বাস প্রতিধবনিত হয়েছে শ্রীমন্তের জবানীতে। শ্রীমন্ত পিতা ধনপতিকে বাণিজ্যপাটন থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে চাইলে খুল্লনা মাতৃহৃদয়ের শ্রীতিবশে স্বাভাবিকভাবেই প্রথম বাধা দিয়ে বসেন। শ্রীমন্ত মাতৃহৃদয়ের সেই অনুভব বুঝতে না পেরে সেটাকে তার মায়ের নৈতিক মানের স্খালন বলে মনে করে বলেছেন-

পিতার সহিতে ঘরে আসিব জখন।

করিহ স্বামীর সেবা শুনহ বচন।।

মাতা পিতা ভাই বন্ধু কার কেহু লয়।

সকল জানিবা মাত্র পথের পরিচয়।।

স্বামী ইষ্ট স্বামী মিত্র স্বামী বন্ধুজন।

সতী নারীর স্বামী নারায়ণ সমতুল।

পরার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।।

স্বামী করিঞ্জা মাতা তোরে নাঞ মন।

অবিচার করি কেনে করিছে ক্রন্দন।।

শ্রীন্তের এই কথা থেকে সহজেই অনুভূত হয় পুরুষশাসিত সমাজ নারীহৃদয়ের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা-আশঙ্কাটিকে বুঝতে চায়নি। শ্রীমন্তের এই কথায় পুরুষশাসিত সমাজের চোখে নারীর অবস্থান কিরূপ ছিল তা স্পস্ট বোঝা যায়।

তখন বিনা স্নানে ভোজন, মিথ্যাকথা বলা, মিথ্যাচার করা সবই নিন্দনীয় ছিল। শ্রীমন্ত পাটনে যাবার পথে কালীদহে দেবীর গজলক্ষ্মী রূপ দেখার কথা রাজা সাধুকে জানালে রাজা প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করেননি। শ্রীমন্ত রাজার মনে প্রত্যয় আনার জন্য পুনরায় সেই প্রসঙ্গ দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করলে রাজা নৌকার কাণ্ডারীকে সাক্ষ্য মেনে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে সত্য কথা বলার আহবান জানান-

রাজা বলে কন্নধার তোরে বলি আমি।

চক্ষে দেখিঞাছ কমল সত্য বলে তুমি।।

সত্য সম ধর্ম নাঞা লেখ্যাছে পুরাণে।

মিথ্যারে সমান পাপ নাঞি ত্রিভুবনে।।

সাক্ষী হঞা জেবা জন মিথ্যা কথা বলে।

সপ্ত পুরুষ তার নরকেতে চলে।।

সাধু-রাজার এই কথা থেকে সমাজের মনোভাবটি স্পষ্ট বোঝা যায়। সমাজে পাপ করলে কিরূপ শাস্তি পেতে হতো বা মানুষ কিভাবে পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতেন সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা ‘‘চণ্তীমঙ্গল'-কাব্যে পাওয়া যায় না। তবে কাব্যের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যায়, শাস্তি হিসেবে দৈহিক নির্যাতন করার চল. ছিল-

আজ্ঞা পাঞা কোতাল আনিল নাএর দড়া।

শ্রীমন্ত সাধুকে বান্দিল পিট মোড়া।।

প্রচণ্ড কতাল বেটা নিদয়ার ধড়।

শ্রীমন্তের ভালে মারে বজ চাপড়।।

মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এভাবে বিভিন্ন লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের যে প্রসঙ্গগুলি পাওয়া যায় তা কোনো ব্যক্তি বা বিশেষ কালের সৃষ্টি নয়। এগুলি হল বহুযুগের বহু লোকের ভূয়োদর্শনজাত মানস অভিজ্ঞতার ফসল। এগুলি সুপ্রাচীন বটে, কিন্তু সুপ্রমাণিত নয়। এসবের ভিত্তি কোনো বৈজ্ঞানিকবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় অথচ মানুষ এগুলিকে উপেক্ষাও করতে পারে না। মধ্যযুগের সহজ সরল বিশ্বাস-সংস্কার পুষ্ট মন চিরকাল এ ধরণের আচার ও বিশ্বাস থেকে দুঃখে সান্তনা, বিপদে ধৈর্য, লাঞ্ছনায় স্থৈর্য, বিপর্যয়ে বল, বেদনায় সহ্যশক্তি, ব্যর্থতায় অধ্যবসায়, নৈরাশ্যে আশার আলো এবং আনন্দে মুক্তির স্পর্শ পেয়েছে। বলা যায়, সারা মধ্যযুগ ধরে এই বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি ছিল বঞ্চিত বিপর্যস্ত, দুর্বল, নিরপায়, অজ্ঞ, ভীরু যুক্তিহীন মনের অবলম্বন ও জীবনের: নিয়ন্তা শক্তি। তাই সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে এসব উপাদানের মূল্য কিন্তু কম নয়।

১০.৩ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলে গৌড়বঙ্গের সমাজজীবন

আমরা জানি, কোনো দেশ-কালবদ্ধ নরনারীর মনন-কল্পনা তথা ধ্যানধারণা ও আচরণীয় জীবনচর্যার মধ্যে। তাই কোনো জাতির পরিচয় ও সমাজকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে তার প্রাত্যহিক জীবন, যথা- খাদ্য, পোশাক, অলংকার, প্রসাধন, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা, অবসর বিনোদন, ধর্মচর্চা ও নীতিবোধ, আনন্দ-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সুস্থ জীবনধারণের পক্ষে যা আবশ্যক তার সবকটি পরিচয় সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

মানিক দত্ত তার 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে রান্নাবান্নার যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তখনকার মানুষের খাদ্যাভাস, রন্ধনরীতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়। তখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, সঙ্গে থাকতো ডাল, ভাজা ,

তরকারী, শাক-সবজি, মাছ, চাটনি, দই, দুধ সবই। তখন রান্নার জ্বালানি-দ্রব্য হিসেবে কাঠের ব্যবহার ছিল। খুল্লনার জন্য লহনা রান্না করেছে কাঠের উনুন জ্বালিয়ে-

অগ্নি জালি কাষ্ঠ দেএ নাই করে হেলা।

রন্ধন করিল অন্ন চড়াএ্যা পাত্রলা।।

তৈলে বার্তাকী ভাজে কই মাছের গোড়া।

কলা দিয়া রন্ধন করিল কলা বড়া।।

রাহিত মাছের ভাজা কিছু কৈল ঝোল।

নানা জাতি মচ্ছ্য ভাজে চিতলের কোল।।

দালির আম্বল করি কটয়া ভরিল।

নানা জাতি বেঞ্জন রন্ধন করিল।।

দেখা যাচ্ছে, নিরামিষ ও আমিষ দুই ধরনের রান্নায় গৌড়বঙ্গের সমাজে প্রচলিত ছিল। নিরামিষ রান্নার মধ্যে ছিল ডালের অম্বল, বেগুন ভাজা, পাকা কলার তৈরি বড়ার ঝোল ও শাকের নানারকম পদ। শাকের নানারকমের পদের মধ্যে গিমা, হেলেঞ্চা, কলম্বু (কলমি), তিত পোরলা (তেলেকুচা),গন্ধারি (গন্ধবাদালি), খুরিয়া (নেটেশাক) ইত্যাদি শাকের ফেচা ও ঘণ্ট সমাজের মানুষের কাছে ছিল খুবই উপাদেয়। মাছের দুই রকম পদ ভাজা ও ঝোল দুই-ই খাবারের তালিকায় থাকতো । বড় রুই, কাতলা, চিতল মাছের কোলের (পেটি), কালিয়া মাখা) ঝোল) ভোজনরসিক মানুষের রসনা তৃপ্তি করতো। ভোজনের শেষ পর্যায়ে দই, দুধ খাওয়ার রীতি ছিল। খাওয়া শেষে জল দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধোওয়ার পর মুখ শোধনের জন্য কপূর ও তাম্বুল গ্রহণ করার রীতি ছিল। তখন তাম্বুলের সঙ্গে মিশ্রিত হতো চুন, খয়ের, সুপারিসহ বিভিন্ন প্রকার মশলা ও সুগন্ধি দ্রব্য-

অবশেষে দধি দুগ্ধ করিল ভোজন।

ভৃঙ্গারের জলে সাধু কৈল আচমন।।

কর্পূর তাম্বুল খাঞা মুখ শুদ্ধি কৈল।

তবে এই ভোজন তালিকা ও ভোজন দৃশ্য সবই ছিল বড়লোক ও অভিজাতদের। দরিদ্র ও সাধারণের কপালে জুটতো শুধু নুন-লঙ্কাসহ পান্তা ভাত-

আম্বানি খাইতে প্রভূ তোর থাকে সাদ।

কাটিয়া আনহ খুদিআ মানের পাত।

সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্রের অভাবে মানের' পাতায়' দরিদ্র মানুষের ভাত খাওয়ার চিত্র আমরা সমসাময়িক কবি বিজয়গুপ্তের কাব্যে পাই- আনিয়া' মানের পাত বাড়ি দিল পান্তাভাত।' পরবর্তীকালের কবি মুকুন্দরামও দরিদ্র মানুষের এই জীবনচিত্র এঁকেছেন। অতএব মানিক দত্তের এই চিত্র একান্তই বাস্তব-জীবনসম্মত।

মানিক দত্তের কাব্য থেকে জানা যায়, সেকালের পোশাকে তেমন কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। উচ্চবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির মানুষের পোশাকে কিছু প্রকারভেদ ছিল। উচ্চবিত্তসমাজের পুরুষেরা পরতেন তসরের ধুতি, জামা এবং নারীরা পরতেন তসরের দামি কাপড়

সোবন্ন তসর রামা করিল পহ্নৃ। (পহ্নৃ--পরিধান করল)

তাহাতে আছেন লেখা হংসা হংসীগণ।।

তবে সাধারণ মানুষের কপালে এসব জুটতো না। সাধারণ দরিদ্র মানুষেরা বিশেষ করে পুরুষেরা একখণ্ড ছোটো কাপড়কে মালসাট দিয়ে পরে কোনোরকমে লজ্জা নিবারণ করতেন। "মালসাট মারি ছাইলা হস্তে লোফে শেল।' দরিদ্র রমণীরা "হরিণের ছরা" কখনো বা একখণ্ড বস্ত্র কোনোরকমে গায়ে জড়িয়ে রাখতেন। বিয়ের সময় এদের কপালে জুটতো কম দামি মোটা পাটের কাপড়- শাড়ি' খানি খুলি নঞা খুঞা পহ্নাইল।'

মানিক দত্তের 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে শুধুমাত্র নারীদের প্রসাধনকলা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা যায়। তখন নারীরা দেহের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য হলুদ বাটা কাথের সঙ্গে

কড়া তেল মিশিয়ে গায়ে মাখতেন, চুল ভালোভাবে আঁচড়ে উচু করে খোপা বাঁধতেন এবং চোখে কাজল পরতেন-

কাচা হরিদ্রা কটু তৈল আপন গায়ে ঘোশে।

খোপাটি বান্ধিল বুড়ি সুদৃড় করিয়া।

পাইলার কালি দিল চক্ষে কঞ্জল করিয়া।

তাঁরা সোনার তৈরি গয়না পরতেন। উপর কানে চাকিবালিলতিতে ;উঝাটিয়ান , কড়ি, ঝাঁক মল গড়িয়া গড়ে পায়ের পাছলি। গলায় শতেশ্বরী হারদুই , বাহুতে মোটা তারের তৈরি নানা গয়না -

উঝাটিয়ান গড়ে লেখা নাই তারে।

নাসার বেশর গড়ে ঝলমল করে।।

এর অতিরিক্ত সধবা নারীরা হাতের শাখাতে সোনার কারুকার্য করা নানাখণ্ড বসিয়ে শাখার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেন- 'শঙ্খের মুখেতে শোভে মানিক কঙ্কণ'। তবে সাধারণ নারীর প্রসাধন কলা বিষয়ে মানিকদত্তের কাব্যে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

মানিক দত্তের কাব্য থেকে তৎকালীন গৌড়বঙ্গের শিক্ষাচর্চা সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তখন শিশুদের পাঠশালায় যেতে হতো পাঁচ বছর বয়সে। পাঠশালায় যাওয়ার আগে বাড়িতে পণ্ডিত ডেকে শুভক্ষণ নির্ধারণ করে হাতে খড়ি অনুষ্ঠান করা হতো। “হাতেখড়ি” হওয়ার পর শিশু গুরুগৃহে গিয়ে পড়াশোনা শুরু করতো। শিক্ষাগুরু হতেন কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি, প্রথমে অক্ষর পরিচয়, তারপর উচ্চারণ করে পড়া শেষে ক, খ, গ এরূপে চৌত্রিশটি অক্ষর লিখিয়ে লিখিয়ে পড়াতেন। ছাত্রের অক্ষরভ্ঞান সম্পূর্ণ হ'লে বারফলা পড়িয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করাতেন। শাস্ত্রপাঠ শেষে নানা সংস্কৃত কাব্য, অভিধান পড়ে ছাত্র পড়াশোনায় পারঙ্গম হয়ে উঠতো-

দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রীহরি।

শুভক্ষণ গণিএগ ছাল্যাকে দিল খড়ি।।

ক খ পড়েন সাধু গুরুর মন্দিরে।

বারফলা পড়ি সাধু শাস্ত্র পাট করে।।

পিঙ্গল পড়িল আর পড়িল সুবন্ত।

অভিধান পড়িয়া শব্দের পাল্য অন্ত্য।।

তবে গুরুগৃহে ছাত্রেরা পড়াশোনা করলেও সম্পন্ন পরিবারে অধিক পয়সার বিনিময়ে পড়াশোনায় বাড়তি যত্নের জন্য বাড়িতে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হতো। অর্থাৎ একথা নিদ্ধিধায় আমরা বলতে পারি, বাড়িতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে মাস্টারমশাইরা গৃহশিক্ষকতাও করতেন। শ্রীমন্তের শিক্ষার জন্য খুল্লনা এরূপ গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন।

মানিক দত্তের ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্য থেকে জানা যায়, তখন সমাজ ছিল যৌথ-পরিবার ভিত্তিক। ক্ষেত্র বিশেষে শাশুড়ি ননদীহীন স্বামী স্ত্রী (কালকেতু-ফুল্লরা) একক পরিবারের উল্লেখ থাকলেও ধনপতির দুই স্ত্রী, পুত্র, গৃহবধূ, দাসদাসী সমৃদ্ধ বৃহৎ সংসার যৌথ পরিবার ভিত্তিক জীবনের কথা জানায়। তখন যৌথ পরিবারে বাড়ির পুরুষেরা বাইর দুঃখের গল্প করে। ভদ্রেতর সমাজের রমণীরা অবসর সময় কাটাতো বান্ধবীর মাথায় উকুন দেখে। তখন সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতেন পদব্রজে। সম্পন্ন লোকেরা দোলায় চড়তেন-

এ সকল বলি সাধু দোলাঞ চড়িল।

দোলাঞ চড়িঞা সাধু জাত্রা করিল।।

স্থলপথ ছাড়া নদীমাতৃক বাংলাদেশে তখন জলপথেও মানুষ যাতায়াত করতেন। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীপথে পারাপার বা গমনাগমনের রীতিটি ছিল অতিপ্রাচীন। প্রাচীনকালের চর্যাপদ থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও এর উল্লেখ আছে।

যাত্রাকালে শুভাশুভ নির্ণয় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের একাদশী তিথিতে কোথাও যাত্রা, যাত্রাকালে অঙ্গহীন বানরের সাক্ষাৎলাভ করা, পথের সামনে বা মাথার উপর

দিয়ে সগুনির উড়ে যাওয়া, রাস্তার বামপাশে সর্প ও ডানপাশে শৃগালের দর্শন সবই ছিল অমঙ্গলের চিহ্ন-

ভদ্রাকালে ধনপতি জাত্রা করিল।।

জাত্রা করি ধনপতি রহিল পুরের বাহিরে ।

মোসানীতে ঠুটা বানর নাচায়ে।।

আকাশেতে সর্ব কয়ে মার কাট।

সম্মুখে গৃধিনী পাখার মারে সাট।।

বামে সর্প দেখিল সাধু ডাহিনে জাম্বুকি।

যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখি মনে হৈল দুখি।।

নারীরা বামজঙ্গ ও ডানচোখ নাচা এবং কালপেচার ঘন ঘন ডাক শুনতে পাওয়াকে অমঙ্গলসূচক বলে মনে করতেন-

বামঅঙ্গ কাপে মাতার দক্ষিণ লোচন।

কৈলাসেতে কালপেচা ডাকে ঘন ঘন।।

অমঙ্গল দেখি দুর্গা পদ্মাকে ডাকিল।

শুনিঞা দুর্গার বাক্য ভাবিতে লাগিল।।

সেকালে গৌড়বঙ্গের ধর্মপ্রাণ বাঙালির সকালবেলার ঘুম ভাঙত পাখির কলতানে।

দেবদেবীর পূজার জন্য বহু মন্দির ছিল। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে একটি উঁচু বেদীতে সোনার ঘট স্থাপন করে তার চারপাশ বিভিন্ন পুষ্পে সুসজ্জিত করা হতো। অগরু ধূপ চন্দনের গন্ধে মন্দিরের ভিতরের পরিবেশ এক স্বগীয় বিভায় পরিপুরিত হয়ে যেত। তারপর ঘটের সামনে পিতলের রেকাবিতে ফল, মুল, আতব চাল দুধের মিশ্রণে তৈরি

নৈবেদ্য কলা ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হতো। নিবিষ্ট চিত্তে বিভিন্ন মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে পূজা সম্পন্ন হতো, পূজার শেষে বলিদান ছিল পূজার অপরিহার্য অঙ্গ-

একান্ত করিঞা রামা করএ স্মরণ।
মোর পূজা ঘটে, আমি হএ অধিষ্ঠান।।
নম নম নম মাতা নম নারায়ণী।
ভৈরবি ভবানী বন্দো সিদ্ধা যোগিনী।।
আদ্যমন্ত্রে খুলুনি চন্ডীকে স্মরিল।
পূজা ঘটে আস্যা মাতা দরশন দিল।।
শত শত পাড়া পাঠা শীঘ কর্যা আনে।
মন্ত্র পড়িঞা তাহা উচ্ছটা ব্রাহ্মাণে।।
শত শত পাঠা কাটে আর কাটে ভেড়া।
শত শত কাটিলেন মহিষের পাড়া ।।
ছাগ মহিষ বলি দিলেন খুলনি।
আনন্দে নাচেন রামা দিঞা জএধ্বনি।।

বলিদান সহযোগে অনুরূপ জাঁকজমক সহকারে পূজার বর্ণনা সমকালীন 'মনসামঙ্গল' কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়।

১০.৪ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের চরিত্র-চিত্রন

১॥ কালকেতু

চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'মানবখণ্ডে'র দু'টি কাহিনি - প্রথমটি "আখেটিক খণ্ড" এবং দ্বিতীয়টি "বণিকখণ্ড। কালকেতু 'আখেটিক খণ্ডের প্রধান চরিত্র । 'চণ্ডীমঙ্গল"কাব্য থেকে জানা যায়, কালকেতু জাতিতে আহিরী অর্থাৎ ব্যাধ। ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র

কালকেতুশিক্ষা-সংস্কারহীন এক শক্তিশালী যুবক। কালকেতু পূর্বরূপে ছিল ইন্দরপুত্র,দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তাঁর এরূপে মর্ত্যজন্ম। কিন্তু মত্যজীবনে তাঁর চরিত্রে কোনো দৈবী-ভাবনার লেশ-মাত্র নেই। মর্ত্যজীবনে তিনি পুরোপুরি অরণ্যচর ব্যাধ। মর্ত্যজীবনে কালকেতুর ব্যাধ-সংস্কারের সঙ্গে উচ্চতর কোনো জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়নি বলে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে চরিত্রটি মোটামুটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং চরিত্রটির আনুপূর্বিক সঙ্গতি বজায় থেকেছে।

কালকেতু অরণ্যচর ব্যাধ। অরণ্যে তাঁর অবাধ চলাফেরা। তাই তাঁর চরিত্রে অরণ্যের বলিষ্ঠরূপের প্রভাব রয়েছে। শৈশব থেকে কালকেতু অমিত শক্তির অধিকারী। চারপাশের আর পাঁচজন বালকের তুলনায় একটু আলাদা দৈহিক গড়নের অধিকারী। তাঁর কথাবার্তা চলন-বলনের মধ্যে সর্বত্রই যেন একটু ওদ্ধত্যের ছোঁয়া। একদিন যুবা কালকেতু অরণ্যে কোনো শিকার না পেয়ে শুন্য হাতে ফিরছেন, পথে একটি গোধিকা দেখতে পেয়ে তাকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে এনে ঘরে রেখে স্নান করতে গেলেন। স্নান শেষে নদীর তীরে কালকেতু ধ্যানে বসেছেন। এমন সময় স্ত্রী ফুল্লরা কাদতে কাঁদতে পিঠে চাপড় মেরে তাঁর ধ্যান ভাঙ্গিয়ে দিলেন। এই অসময়ে ফুল্লরার ধ্যান ভাঙ্গানোর কারণ যাইহোক উদ্ধত কালকেতুর এসব ন্যাকামি যে সহ্য হয় না তা তিনি স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন-

ধর্মকেতু পিতা নিদয়া মোর মা।

সেই নাহি মারে এমত চাপড়ের ঘা।।

প্রাণের ফুল্লরা হয়ে তেই এত সই।

অন্যজন হৈলে উচিত ফল দেই।।

ফুল্লরা প্রতি কালকেতুর এই উক্তি স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসার নিবিড় পরিচয়টিকে তুলে ধরেছে। তারপর ফুল্লরা যখন নির্মমভাবে অবিশ্বাস হেনে যোড়শী চণতীকে ঘরে আনার জন্য কালকেতুকে বিদ্ধ করেছেন, কালকেতু প্রথমে হতচকিত হয়েছেন-

ফুল্লরা বলেন প্রভু মুই বলো তোমারে।

কাহার রমণী তুমি আনিয়া থুইলে ঘরে।।

কি কহিব রূপ তার ভুবন মোহিনী ।

আর ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি তপ ছাড়ে মুনি।।

আঝর নএগনে কান্দে ফুল্লরা রূপসী।

নঞানের জলে জে মলিন মুখশশী।।

তারপর আত্মবিশ্বাসী কালকেতু ফুল্লরার অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও যখন ফুল্লরা নাছোড়বান্দা, কালকেতু সহজেই বলে উঠেছেন-

জদি পর রমণী নারী দেখাইতে পার।

জেই চাহিবা সেই দিব কৈলাঙ অঙ্গীকার ।।

না দেখাইতে পার জদি মোর বিদ্যমান।

চিড়াইড়ে কাটিব তোর নাক আর কান।।

ফুল্লরা যখন তাতেও সই কালকেতু ফুল্লরাকে সঙ্গি করে বাড়ির পথে এগিয়ে গেছেন।বাড়িতে পৌঁছে কালকেতু সরাসরি দেবির কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর বাড়িতে দেবীর আগমনের কারণ, তাঁর পরিচয় ইত্যাদি জানতে চেয়েছেন-

এহি ব্যাধ নীচ জাতি তুমি রামা কুলবতী

পরিচয় মাগে কালকেতু।

ত্রিভুবনে এক ধন্যা কিবা দেব দ্বিজ কন্যা

ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু।।

ব্যাধ দুর্নীত রাড় চতুর্দিগে পশুর হাড়

শ্বশান সমান এহি স্থান।

কহি আমি সত্য বাণী এহি ঘরে ঠাকুরাণী

পরশে উচিত হয়ে স্নান।।

ত্যেজিয়া ব্যাধের বাস চল তুমি বন্ধু পাশ

শীঘ্ব চল থাকিতে দিননাথে।

জদি হবে পাপ নিশা লোকে গাবে মন্দ ভাষা

জামিনী গোঙাইলে কার সাথে।।

দেবীর প্রতি কালকেতুর এই যুক্তি-সনিবেশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সহজ সরল কালকেতু সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বা মানব চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না। যুক্তিপ্রবণ কালকেতু জাতিতে ব্যাধ হলেও দেশীয় এতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

কালকেতু এর পর দেবীকে আরো নানাভাবে বোঝান, কিন্ত ব্যর্থ হয়ে ধনুর্বাণ দিয়ে দেবীকে বধ করতে উদ্যত হন। দেবী প্রথমে ভয় পেলেও মুহূর্তে নিজ স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে কালকেতুকে প্রচুর ধন দান করে ক্ষান্ত করেন। কালকেতু এরপর দেবীর ইচ্ছায় দেবী প্রদত্ত ধন নিয়ে গুজরাটে নতুন করে নগর স্থাপন করেন সেখানকার রাজা হয়ে বসেন। গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মানুষকে সমাদরে বসিয়ে কালকেতু উদার হয়েও কালকেতুর জীবন ঠক প্রজা ভাঁড়ুদত্তের চক্রান্তে বিষময় হয়ে ওঠে। ভাঁড়ুদত্তের প্ররোচনায় গুজরাট নগরের সঙ্গে কলিঙ্গরাজের যুদ্ধ বাধে। কালকেতু প্রথমে জয়লাভ গান করে কালকেতু দেবীর কৃপায় মুক্তি পান। কালকেতু গুজরাট নগরে ফিরে এসে ভাঁড়ুর জন্য কড়া শাস্তিবিধান করেন। নাপিত নয়, অপটু ব্রাহ্মণকে দিয়ে কালকেতু ভার অর্ধেক মাথা মুড়িয়ে দেন, জলের পরিবর্তে ভাঁড়ুর মাথায় চুল ভেজানো হয় ঘোড়ার লঘিঘ (প্রসাব) দিয়ে। গুজরাটবাসী সকলে ভিরুকে ঘিরে ধরে, কালকেতু উপস্থিত হয়ে ভাঁড়ুর কুকীর্তি সর্বসমক্ষে ফাস করেন। ভাঁড়ু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কালকেতুকে সকলের সামনে 'আঁটকুড়ে" (নিঃসন্তান) বলে সম্বোধন করেন। ভাঁড়ুর এই সম্বোধনে কালকেতু লজ্জা পান। স্ত্রী ফুল্লরার কাছে কালকেতু বলেন-

কোন ছাড় দত্ত ভাঁড়ুয়া নাবড় সে মোকে আটকুর বোলে

এত দুঃখ না সয় শরীরে।

আমার বচন ধর রাজ্য ভোগ পরিহর .

চল জাই দুর্গা পুজিবারে।।

ই ধন ঘর ছারি সকলি পরিহরি

কাখে করিমু সমর্পণ।

মনতে রহিল ব্যথা কাহাকে কহিমু কথা

রাজ্য তেজিমু পুত্রের কারণ।।

মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে কালকেতুর এই চরিত্ররূপ সৃজনে একটু অস্পষ্টতা থাকলেও কবি তাঁর পরিণতি রচনে 'চণ্ডীমঙ্গলে'-র অন্য কবিদের (এমনকি মুকুন্দ চক্রবর্তী) তুলনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যদি মানিক দত্তের "কালকেতু পর্ব-কে দু'টি ভাগে ভাগ করি ব্যোধ ও রাজা পর্ব। তাহলে দেখতে পাব উভয় পর্বেই কবি মানিক দত্ত কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'ব্যাধ'-পর্বে কালকেতু অসভ্য, বর্বর, ব্যাধ জাতির প্রতিনিধি। সভ্য সমাজের খলতা, ক্রুরতা, চাতুরী তার আয়ত্তে নেই। তাই কালকেতু সভ্য সমাজের দাম্পত্য মাধুর্যকে আয়ত্ত করতে পারেননি। দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু কেবল বেঁচে থাকার জন্য যা যা প্রয়োজন, জৈবিক ও মানসিক খোরাক মেটানোর জন্য স্ত্রীর সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক থাকা উচিত তাই রপ্ত করেছেন। তাই বাড়িতে অনিন্দসুন্দরি রূপসী চণ্ডীকে দেখে ব্যাধ কালকেতু যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তা তাঁর ব্যাধ চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্বে গুজরাটের রাজা হওয়ার পরে কালকেতু যে আচরণ করেন সেটাও তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ক্ষত্রিয়গণ বীরত্ব সম্পর্কিত যে উচ্চ-নৈতিক আদর্শ বিষয়ে শিক্ষালাভ করে থাকেন ব্যাধ কালকেতুর পক্ষে তা লাভ করা সম্ভব ছিল না। তার বীরত্ব তার আত্মরক্ষার ধর্মের অন্তরদৃষ্টি একটি গুণ। তিনি আত্মরক্ষার জন্য পশুবধ :

করে থাকেন, পালিয়ে ধান্য-গৃহে আত্মগোপন করেন। কালকেতু অনার্য। সুতরাং তার বীরত্ব কাপুরুষতা মিশ্র, আত্মরক্ষার ধর্মই তার জীবনধর্ম। তাই ক্ষাত্রবীরের আদর্শ তাঁর সামনে স্থাপন করলেই বরং তাঁর চরিত্র অস্বাভাবিক হতো। সাধারণ লোকসমাজ নিঃসন্তান দম্পত্তিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না। ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুকে 'আটকুর' বলে গালমন্দ করার ঘটনায় তাঁর পরিচয় আছে। কালকেতু এতে যে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন তাতে তিনি স্বাভাবিক মানুষের সংস্কার কাটিয়ে উঠিতে পারেননি। বস্তুত কালকেতু চরিত্র মানিক দত্তের কাব্যে রক্তমাংসের স্বাভাবিকতা নিয়ে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে।

২॥ ফুল্লরা

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে যে সব নারী চরিত্র সুদূর প্রসারী অবিস্মরণীয় অস্তিত্ব নিয়ে প্রশান্ত হয়ে উঠেছে "ফুল্লরা" তাদের অন্যতম। মানিক দত্তের "ফুল্লরা" নিশানকেতু ব্যাধের কন্যা, দয়াবতী তার মা। বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে পিতা নিশানকেতু ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্র কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার জাঁকজমক সহকারে বিয়ে দেন-

ফেলায়া হরিণের ছড়ি বারাইল ফুলুয়া নারী
বসিল স্বামীর বামপাশে।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু আইল সভাকে বসিতে দিল
ভিমচের বাদ্য লোক হাসে।।
পঞ্চ নর্তকী লৈল কন্যাকে দানে দিল
দানে দিল দেড় বুড়ি কড়ি।

বিবাহের পর ফুল্লরা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। স্বামী ব্যাধ কালকেতু মৃগয়া করেন, ফুল্লরা সেই শিকার লব প্রাণীর মাংসে পসরা সাজান। প্রথমে একাজে অনভ্যস্ত রূপসী ফুল্লরা পরপুরুষের সামনে এমন পসরা করে বেড়াতে হবে ভেবে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও স্বামীর প্রতি ভালোবাসার কারণে তা মেনে নেন-

দ্বারেত বাসিয়া কান্দে রামা ফুলুরা

কি আছিল অভাগির কপালে।

কেমন বিধাতা মোরে জনম লভাইল

দুষ্ট অক্ষটির ঘরে।

জেমন কুলে জন্ম হৈল তেমন রূপ নহিল

রূপ হৈল ভুবন মোহন।

মাথায় মাংসের ডালি নগর বাজারে জাব

কম্পিত হৈবে মহাজন।

ফুল্লরা পসরা করেন কখনো গ্রামে কখনো বা শহরে। পসার শেষে বাড়ি ফিরে এসে স্বামীকে রান্না করে যতটা পারেন পরিপাটী করে খাওয়ান-

খুদিআ মানের পত্র আনিল কাটিআ।

সাত হাড়ি আম্বানি দিলেন ঢালিআ।।

স্বামীর খাওয়া শেষ হলে পান দিয়ে মুখ শোধন করতে তাঁর ভুল হয় না। স্বামী একটু জুড়ানোর জন্য বিছানায় বসলে ফুল্লরা স্বামীর সঙ্গে নানা গল্পগাছা করে তাঁর শ্রম লাঘব করার চেষ্টা করেন। স্বামী সোহাগিনী ফুল্লরা এখন হাসিমুখে সংসারের সব অভাব অভিযোগ সহ্য করেন। মুখে কোনো বিরক্তি নেই, কারো প্রতি কোনো দোষারোপ নেই; কোনো নালিশ নেই। অন্যদিকে কালকেতু ফুল্লরা থেকে কম যান না। তিনি অন্তর দিয়ে ফুল্লরাকে ভালোবাসেন। কোনো দিন শিকারে ব্যর্থ হলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কালকেতুর প্রথমেই মনে পড়ে ফুল্লরার কথা। অর্থাৎ সব সময় তাঁরা দু'জন মিলেই দুঃখ-কষ্টকে সমানভাগে ভাগ করে নেন। কিন্তু এরকম অবস্থায় তাদের গৃহে হঠাৎ ষোড়শী রূপসী যুবতীরূপে চণ্ডীর আবির্ভাব ফুল্লরার সংসারের সমস্ত শক্তিকে টলিয়ে দেয়। ফুল্লরার মাথায় আকাশ

ভেঙে পড়ে। ফুল্লরা চণ্ডীকে নানা প্রশ্ন করে তাঁর গৃহে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, সদুত্তর না পেয়ে উপদেশ দিতে শুরু করেন এই বলে-

ফুল্লরা বলে শুন অধম দুচারিণী।

তোর তুল্য পাপীষ্ঠ নারী অন্য নাহী জানী।।

কুন রূপ গুণ মোর পতিতে দেখিলে।

ছাড়িয়া স্বামীর ঘর জাতি কুল মজাইলে।।

কুলটা হৈলে তোকে না লইবে ঘরে।

মাগিয়া খাইয়া ফির দিগ্ দিগন্তরে।।

এতেও যখন কাজ হয় না, নিজে আত্মহত্যা করে স্ত্রী হত্যার দায় তার উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন-

আমার বচন ধর গৃহ ছাড়িয়া চল

তোকে আগ বাড়াইয়া আসি আমি।

জাতি কুল জদি চাও ফিরিয়া ঘরেক জাও

নহে স্ত্রী হত্যা দিব আমি।

নাছোড়বান্দা চণ্ডীদেবী কোনকথাই শুনছেন না দেখে ফুল্লরা এবার. দেবীর কাছে বারোমাসের দুঃখবর্ণনে মরিয়া হয়ে ওঠেন। ফুল্লরার এই দুঃখ বর্ণনাংশে দারিদ্রের বর্ণনার চাইতে বড় হয়ে ওঠে তার আপাত উদ্দেশ্যমূলকতা। ফুল্লরা বারোমাসের দুঃখকষ্টের বর্ণনা দিয়ে যে নারী অকস্মাৎ তার অংশভাগিনী হয়ে উঠতে চেয়েছেন, তাকে অবিলম্বে স্বামীর কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

চরিত্রটিকে এভাবে নানাদিক থেকে আঁকতে গিয়ে কবি মানিক দত্ত খেই হারিয়ে ফেলেছেন, কিছু বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য তাঁর চরিত্রে সন্নিবিষ্ট করেছেন। ফলে দেখা যায়, কোথাও কোথাও চরিত্রটির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছে। যেমন: "বারমাস্যা"-অংশে ফুল্লরা

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে; আবার কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতুকে ধান্য-গৃহে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিয়ে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। এইরকম দু'একটি প্রসঙ্গ ছাড়া মানিক দত্ত ফুল্লরা চরিত্র অঙ্কনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কালকেতু দেবীকে ধন দিতে মনস্থির করেছেন, কালকেতুও সেই ধন নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে কালকেতু দেবীর কাছে ফুল্লরার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য কিছু সময় চেয়েছেন-

আমি পুছি দেখি আগে ফুল্লরা ব্যাধিনী।

ধন দিতে চাহে মোকে আদ্যা ভবানী।।

তারপর কালকেতু ধনের ব্যাপারে যখন ফুল্লরার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেছেন, ফুল্লরা স্পষ্টভাবে সেই ধন না নেওয়ার জন্য কালকেতুকে বলেছেন __

না লও প্রভু মায়া দুর্গার ধন। :

ধন দিয়া পাছে করিবে বিড়ম্বন।।

জার ঘরে ধন আছে তার শুন কথা।

মধ্য পাথারে তার ডাকাইতে ভাঙ্গে মাথা।।

ফুল্লরার এই নির্লোভ মানসিকতা চিরন্তন বাঙালি নারীর স্বামীর কল্যাণে সর্বস্বত্যাগী মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

কাহিনির অন্যত্র দেখি, কালকেতু পরস্ত্রীকে বাড়িতে এনে রেখেছেন, এতে ফুল্লরার আসন টলে গেছে। সপতীভীতি ফুল্লরাকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। এসময় ফুল্লরার যে করুণ মুখচ্ছবি কবি এঁকেছেন তা অনবদ্য হয়েছে-

আঝর নঞানে কান্দে ফুলরা রূপসী।

নঞানের জলে জে মলিন মুখশশী।।

বিধস্ত ফুল্লরা এরপর নিরপায় হয়ে স্বামীকে শেষ-বারের জন্য স্বপথে ফিরিয়ে আনার জন্য জীবনে মূল্যবোধের প্রয়োজন কতখানি তা বোঝানোর জন্য সে রামায়ণের প্রসঙ্গ এনেছে-

কি লাগিয়া প্রভু এবে পাপে দিলে মন।

আজি হৈতে হৈলে তুমি লঙ্কার রাবণ।।

তা ফুল্লরার জীবনাভিজ্ঞতার কথাই স্মরণ করায়।

বস্তত এই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো কিছু প্রসঙ্গে দেখতে পাই, নিখুঁত শব্দচয়নে কবি মানিক দত্ত ফুল্পরা চরিত্রের বিভিন্ন দিককে যেন শিল্পীর তুলির আঁচড়ে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। আপন অধিকার রক্ষায় একান্তই বাঙালিবধূর মতোই তাঁর ফুল্লরার অস্থিরতা ও যন্ত্রণা বাগ্ময় হয়ে উঠেছে। কাজেই কিছু সীমাবদ্ধতা ও শৈথিল্য সত্তেও মানিক দক্তের "ফুল্লরা" চরিত্রটি কাব্যে জীবন্ত রূপ ধারণ করেছে।

৩॥ ভাঁড়ুদত্ত

'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কাহিনির বৈচিত্র্যের জন্য যে চরিত্রগুলি সৃষ্ট হয়েছে ভাঁড়ুদত্ত তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত চরিত্র। চরিত্র সৃষ্টির জন্য যে সমবেদনা ও সহানুভূতির উপাদান প্রয়োজন মানিক দত্তে তা খুব একটা সহজ দৃষ্ট না হলেও যতটুকু পরিদৃষ্ট হয় তাতেই ভাঁড়ুদত্ত চরিত্রটি স্বার্থপর, সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

দেবীর কৃপায় আশি মন স্বর্ণমুদ্রা পেয়ে কালকেতু গুজরাটের বনজঙ্গল কেটে সেখানে মনুষ্যবসতি স্থাপন করে রাজা হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। ঝোপঝাড় পরিষ্কার হলেও নব্য প্রতিষ্ঠিত গুজরাটে প্রথমে কেউ বসতি স্থাপন করতে এগিয়ে আসেননি। এজন্য কালকেতু পার্শ্ববর্তী রাজ্য কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজাদের নানা সুবিধা দিয়ে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এসে গুজরাট নগর প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেন। কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজা ভাঁড়ুদত্ত আসেন।

কালকেতু অশিক্ষিত নিচ কুলোদ্ভব ব্যাধ সন্তান। তিনি এত বড় নগরীর অধীশ্বর হয়ে বসেছেন আর দত্তকুলোদ্ভব ভাঁড়ু নিঃস্ব, এটা ভাঁড়ুর ভালো লাগেনি। তিনি কালকেতুর প্রতি সবিশেষ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। কালকেতুর কাছে নব্য প্রতিষ্ঠিত গুজরাট নগরীতে তিনি ভিক্ষা করার অনুমতি চান-

মুখে আজ্ঞা করহ নগর মাঙ্গিবারে।।

কালকেতু বলে সুন আমি বলি তোরে।

নগর মাঙ্গিতে তোরে কেবা নিষেধ করে।।

কালকেতু আপত্তি করেন না। কিন্তু ভাঁড়ুদত্ত গায়ে মানে না আপনি মোড়ল স্বভাবের । বাড়ি ফিরে তিনি সাতপুত্রের সঙ্গে যুক্তি করে নগরে ভিক্ষা না করে, জোর করে তোলা আদায় করতে থাকেন-

মুড়া কলম লইল কর্ণতে গুজিয়া।

বাজারে প্রবেশ হৈল জমিদার হৈয়া।।

বাজারে আসিয়া তোলা তুলিয়া বেড়াএ।

দেখিয়া সকল প্রজা করে হাএ হাএ।।

তোলা তুলিতে নড়িল নাবড় ভাড়ু দত্ত।

জথা ভাঙ্গে পুরা সাগের দোকান জত।।

টানিয়া টুনিয়া ভরাএ চুপড়ি।

ভাসঙ্কর বলিয়া ভাঁড়ু সাগের দেহ কড়ি।।

আমাকে দেখিয়া বেটা না করিল শঙ্কা।

তিন কাঠা ভূমে তোর হৈল নও তঙ্কা।।

সে কথা শুনিয়া প্রজার ভএ হৈল।

লইয়া জাও শাক বাছা না দিহ তার কড়ি।

ভাঁড়ুর অত্যাচারে জর্জরিত দোকানিরা কালকেতুর কাছে নালিশ করলে কালকেতু সর্বসমক্ষে ভাঁড়ুকে চড় মেরে অপমান করেন-

দোসাধু পঠায়া তবে ভাঁড়ু দত্তক ডাকি আনে

নিস্ফলে গালে দিল চড়।

চড় খাইয়া ভারু দত্ত মালসাই নারে

খুড়া আমার নাম ভাঁড়ুয়া নাবড়।।

আমার নাম ভাঁড়ু দত্ত সভে জানে আমার তত্ব

খুড়া তোমার বস্ত্র দুইখানি কানি।

মৃগ বধিতে গেল সর্ব্বকাল য়খন রাজা নাম

পাড়াইছ তুমি।।

তোমার ফুল্লরা নারী মাথাএ মাংসের ডালি

নগর বাজারে লইয়া ফেরে।

অপমানিত ভাঁড়ু কালকেতুর এই অপমানের প্রতিশোধ নেবেনই নেবেন, এই হুমকি দিয়ে পুনরায় কলিঙ্গ রাজ্যে ফিরে গিয়ে সুরথ রাজার শরণাপন্ন হয়ে ‘গুজরাট নগর’ আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। এই যুদ্ধে কিন্তু “দেবী”-র সহায়তায় কালকেতু জয় লাভ করেন। কিন্তু কালকেতু অহংকারবশত ফুল্লরার কাছে 'যুদ্ধকথা’ বর্ণনা করতে গিয়ে ‘দেবী'র কৃপার কথা অস্বীকার করে কেবলমাত্র নিজ বাহুবলের গর্ব করতে থাকেন। দেবী এতে ক্রুদ্ধ হয়ে কালকেতুকে বন্দি করার জন্য সুরথ রাজাকে নির্দেশ দেন। সুরথ ‘দেবী'র নির্দেশ মতো কালকেতুকে বন্দি করার জন্য ভাঁড়ুর সাহায্য চান। ভাঁড়ু কপট করে ফুল্লরাকে ছলনা করে কালকেতুকে বন্দি করে আনেন এবং বন্দিশালায় ফেলে

রাখেন। কালকেতু ভুল বুঝতে পেরে দেবীর স্তব শুরু করেন। কালকেতুর স্তবে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে কালকেতুকে ছেড়ে দিতে সুরথ রাজাকে নির্দেশ দেন। দেবীর নিদেশে কালকেতু মুক্তি পান। কালকেতু "গুজরাট নগরে" ফিরে ভাঁড়ুর কঠোর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন-

ঘোড়োর লম্ফী দিয়া মাথা জে তেতাইল

শিরে তুলিয়া দিল খুর।

ভাড়ু বোলি নগরি দেএ করতালি

আজি আনন্দ বড় মোর।।

ভাড়ু আপনার দৈব দোষে মঝ তুমি

পরের নাবুড়ি কেনে কর।।

ভাঁড়ুর মুড়ি মাথা মুড়ি কান্দে ধাউর বেটা

তথা ভাঁড়ু ঘোল খাইবার চায়।

মানিক দত্ত ভাড়ুদত্তের যে চরিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে ভাঁড়ু ঠক, মিথ্যাচারী, প্রতারক ও সুবিধাবাদী চরিত্র। এরকম চরিত্র কোনোকালেই বিরল নয়। ভাঁভু তাই "Type" চরিত্র হিসেবে খুব একটা অসার্থক সৃষ্টি নয়।

৪॥ ধনপতি

'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিক খণ্ডে'র অন্যতম চরিত্র ধনপতি। মানিক দত্ত ধনপতির জীবন বর্ণনায় একটু ভিন্নপথী। তাঁর সৃষ্ট ধনপতি স্বর্গের শাপভ্রষ্ট নলকুবের পুত্র কর্ণমুনি। মর্ত্যে দেবী চন্ডীর পূজা প্রচারের জন্য তার জয়পতি বণিকের বাড়িতে জন্ম হয়। মর্ত্যজন্মে ধনপতি যথাসময়ে ইছানী নগরের নিধুপতি বণিকের কন্যা লহনাকে বিয়ে করেন। লহনা বিবাহ পূর্বকাল থেকে দেবী গৌরীর পূজা করলেও বিবাহের পর দেবীর পুজা ভুলে যান। মর্ত্যে দেবীর পূজায় ভাটা পড়ে। দেবী তখন নারদের পরামর্শে

মর্ত্যে নিজ পুজা প্রচারের জন্য স্বর্গের অপ্সরা মালাধর পত্রী "রত্নামালা'কে শাপ দিয়ে লক্ষপতি সদাগরের গৃহে ফুল্লরা-রূপে জন্ম দেন।

এদিকে ধনপতি ও লহনার কোনো সন্তান না থাকায় দেবীর স্বপ্নাদেশে উজানীর রাজা বিক্রমকেশরী "আঁটকুড়ে" অপবাদ দিয়ে ধনপতির রাজদরবারে আসা বন্ধ করে দেন-

চিয়রে দণ্ডের রাজা গায়ে কর বল।

তোর ঘরে আইলাম দুর্গা সর্ব্বমঙ্গল।।

আটকুড়া ধনপতি আছে নগর ভিতর।

তাহাকে পুরিতে য়াসিতে না দিহ সন্তর।।

এবং পুনরায় বিবাহ করে বংশ রক্ষা করতে আদেশ দেন-

রাজা বলে শুনহ লক্ষের সদাগর।

দ্বিতীয় বিবাহ করি বংশ রক্ষা কর।।

ধনপতি এতে বাড়িতে সতীন-কোন্দল জনিত সমস্যা সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন-

না বল রাজা বাড়িবে জঞ্জাল।

দুইটি স্ত্রিয়ার তাপে প্রাণ জাইবে আমার ।।

এসব শুনে বিক্রমকেশরী ধনপতিকে ধাকা দেন-"টেকা দিয়া সাধুক বাড়ির বাহির কৈল"। অতঃপর গলাধাক্কা খেয়ে লজ্জিত ধনপতি বাড়ি এসে লহনাকে সব কথা জানালে, লহনা ধনপতিকে বুঝিয়ে শান্ত করে

আর চারি বৎসর থাক প্রভু চিন্তে ক্ষেমা দিয়া।

না হয়ে লহনার ছাইলা করিহ দ্বিতীয় বিয়া।।

ধনপতিকে তখনকার মতো মনোকষ্ট নিবারণের জন্য পায়রা উড়াতে নিছনি নগরে গেলেন। ধনপতির সখের পায়রা খুল্লনার কাছে ধরা পড়ল। ধনপতি পায়রা আনতে

গিয়ে খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহের সংকল্প করলেন। খুল্লনার পিতা নিজ ভাইঝির (লেহনার) সতীন হওয়ার আশঙ্কায় এই বিবাহ অস্বীকার করলে শেষে ঘটক মধ্যস্থতায় এই বিবাহই ঠিক হয়।

বিবাহের পরপরই ধনপতির গায়ে হলুদ কেন? রাজা ধনপতিকে একথা জিজ্ঞাসা করলে ধনপতি খুল্লনাকে বিবাহের কথা জানান।

আটকুড় বলিয়া রাজা গালি দিলে তুমি।

তাপের তাপিত হৈয়া বিভা কৈলাঙ আমি।।

পায়েরা খেলাইয়া রাজা করিলাঙ উধন্যা।

ইছানীতে বিবাহ কৈলাঙ লক্ষপতির কন্যা।।

রাজা বিক্রমকেশরীকে না জানিয়ে বিয়ে করার জন্য রাজা ধনপতিকে বন্দি করলেন। ধনপতির বন্দিদশায় দেবী ফাঁপড়ে পড়লেন। শেষে শুকসারি দুই পাখি ধরে দেবী উজানীর রাজা বিক্রমকেশরীর কাছে পৌঁছে দিলে সেই পাখির সোনার পিঞ্জর গৌড় থেকে তৈরি করিয়ে আনার জন্য পাত্র-মিত্রদের পরামর্শ মতো ধনপতিকে যুক্তি দিলেন। শেষে রাজা বিক্রমকেশরীর ইচ্ছায় ধনপতি গৌড়ে গেলেন। বাড়িতে ধনপতির অনুপস্থিতিতে লহনা খুল্লনার উপর নানা অত্যাচার শুরু করলেন। খুল্লনা বাধ্য হয়ে লহনার নির্দেশমতো ছাগল চড়ানোর কাজ নিলেন। দীর্ঘদিন বাদে দেবীর স্বপ্নাদেশে ধনপতি গৌড় থেকে ফিরলে ধনপতি ও খুল্লনার পুনর্মিলন ঘটল।

গৌড় থেকে ফেরার কিছুদিন পরে ধনপতি পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে জ্ঞাতিবর্গকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে জ্ঞাতিবর্গ ধনপতির বাড়িতে খেতে চাইলেন না। কারণ হিসেবে তাঁরা খুল্লনার বনে ছাগল চড়াবার কথা বললেন-

শুন ধনপতি সাধু না করিহ রোষ।

খুল্লনার হৈল এবে ছেলি চরা দোষ ।।

বলে খুল্লনার জাতি নৈল কুনজন।

তোর গৃহে আমরা না করিব ভোজন।।

এসব শুনে ক রারিতপড়ে খুল্লনার কাছে আত্মহত্যা করে নিজ মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার কথা বলাতে খুল্লনা ধনপতিকে শান্ত করে সকলের সামনে সতীত্ব পরীক্ষা দিয়ে স্বামীর মর্যাদা অক্ষ রাখেন।

ধনপতি খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজ পরিবারের হৃত বাণিজ্য গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য বাণিজ্যে যাওয়ার সংকল্প পোষণ করেন।খুল্লনা স্বামীর বাণিজ্য যাত্রার কুশল কামনা করে মঙ্গল ঘট পেতে দেবীর পূজা শুরু করেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে খুল্লনাকে বর দিতে এগিয়েও আসেন, দেবী ও খুল্লনার এই বর দেওয়ার মুহূর্তের কথাবার্তা শুনে লহনা ধনপতিকে গিয়ে একটু বাড়িয়ে খুল্লনার বিরুদ্ধে লাগালেন__

চলিল লহনা জথাতে ধনপতি।

কপটে কহেন কথা হইএ্যা অক্রমুখী।।

তোমার কারণে প্রভু বিদরে মোর হিয়া।

খুলুনা কি কম্ম করে হের দেখসিআ।।

কিবা পুজা করে প্রভু বুঝিতে না পারি।

না শুনে আমার বাক্য প্রাণ ফাটে মরি।।

লহনার এই কপট কথার যাথার্থ্য যাচাই না করে ধনপতি “দেবীর ঘটে” পদাঘাত করেন। দেবী অপমানিত হন, ধনপতির সঙ্গে দেবীর বিবাদের সুচনা হয়। ধনপতি অতঃপর বাণিজ্য-যাত্রা করলে দেবীর মায়ায় পথের মধ্যে ধনপতিকে বহুবিধ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। মগড়াদহে ঝড়-বৃষ্টির কোপে ধনপতির সপ্তডিঙার মধ্যে ছয়ডিঙা ডুবে যায়। ধনপতি কোনক্রমে কালীদহে পৌঁছান। কালীদহে ধনপতি “কমলেকামিনী" মূর্তি দর্শন করেন। তারপর সিংহল পৌঁছে সিংহল-রাজ 'শালবান'কে সেকথা বলাতে শালবান ধনপতিকে সেই “কমলেকামিনী" মূর্তি দেখাতে বলেন। ধনপতি তা দেখাতে ব্যর্থ হন। শালবান ধনপতিকে বন্দি করেন। ধনপতি তাঁর এই বন্দিদশায়

দেবীর হাত আছে বুঝতে পেরে দেবীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানান। দেবী ধনপতির মস্তকে হাত বুলিয়ে বার বছর অনাহারে বেঁচে থাকার শক্তি তাঁকে দেন এবং পুত্র কর্তৃক তাঁর বন্দিদশা ঘুচবে বলে জানান।

মানিক দত্ত তার কাব্যে বাণিজ্যযাত্রার প্রাকৃকালে ধনপতির "দেবীর-ঘট' ভাঙার যে চিত্র এঁকেছেন তা পূর্ববর্তী "মনসামঙ্গল' কাব্যের অনুকরণ। চাঁদ একইভাবে বাণিজ্য যাত্রার আগে হেতালের লাঠি দিয়ে দেবীর ঘটবারি ভেঙেছিলেন। তবে চাঁদ যে মনসার ঘটবারি ভেঙেছিলেন তার কারণ ছিল। পরম শৈব চাঁদ কিছুতেই চণ্ডী ব্যতীত নারীদেবতার পূজা করবেন না; এদিকে মনসাও নিরপায়। চাঁদের পূজা না পেলে মরতে তার পুজা প্রচার হবে না। তাই সনকার মাধ্যমে কৌশলে মনসা চাদের বাড়িতে পূজা লাভেচ্ছুক হলে চাদ রেগে গিয়ে হেতালের লাঠি দিয়ে মনসার ঘটবারি ভেঙে দেন। কিন্তু মানিক দত্তের কাব্যে ধনপতি কর্তৃক দেবীর ঘটবারি ভাঙার এরূপ কোনো কারণ নেই। প্রথমত স্ত্রী লহনা ধনপতিকে জানিয়েছেন তাঁর বাণিজ্য যাত্রার প্রাককালে খুল্লনা ডাকিনীপনা শিখছেন, হয়তো কোনো বিঘ্ন ঘটানোর জন্যেই। ধনপতি তা শুনে কোনোরকম সত্যতা যাচাই না করে চণ্ডীর ঘটবারি ভেঙে দিয়েছেন। ধনপতির এই কারণহীন কার্য পাঠককে বড়ই পীড়িত করে। দ্বিতীয়ত : ধনপতির পায়রা ওড়ানোর জন্য ইছানী নগরে যাওয়া ও পায়রা খুঁজতে গিয়ে খুল্লনার রূপে বিমোহিত হয়ে তাকে সরাসরি বিয়ে করতে চাওয়ার বাসনা প্রকাশ করা পাঠককে বিস্মিত করে। মানিক দত্তের পরবর্তী কালের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী এ ঘটনা বর্ণনায় অনেকটাই সক্রিয় ও যথাযথ। তাঁর সৃষ্ট ধনপতি দ্বিতীয়বার মানিক দত্তের ধনপতি এসবের ধার ধারেননি। বলা যায়, ধর্মাদর্শ ও জীবন-চেতনা- দু'দিক থেকেই মানিক দত্তের ধনপতি অস্পষ্ট করে আঁকা চরিত্র।

৫॥ শ্রীমন্ত

মানিক দত্ত সৃষ্ট শ্রীমন্ত চরিত্র স্বর্গের শাপতরষ্ট ইন্দ্রের নর্তক মালাধর। দেবী চণ্ডী মর্ত্য তার পুজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রের নর্তক মালাধরকে ধনপতির পুত্র শ্রীন্তরূপে মর্ত্য জন্ম দেন। খুল্লনার গর্তে শ্রীমন্তের জন্মের পর তখন তাঁর পিতৃদর্শন হয়নি। পিতা ধনপতি সিংহল রাজার দ্বারা কারাবন্দি হয়েছিলেন। পিতৃহীন মাতার আদরের শ্রীমন্ত তাই

বাল্যকাল থেকেই ছিল একটু দুরন্ত প্রকৃতির, খেলাধুলো করতে গিয়ে পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়েই রাখতেন। মানিক দত্ত নিপুণভাবে শ্রীমন্তের সেই দুরন্তপনার চিত্র এঁকেছেন-

যাইট দত্তের বেটা নাম তার ভোলা ।

তার চক্ষে শ্রীমন্ত তুলিয়া মারে ধুলা।।

সব শিশু খুলনাক কহিতে লাগিল।

তোর পুত্র জাঞা মোর চক্ষে ধুলা দিল।।

খুল্লনা শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে শিশুদের এই অভিযোগে মর্মাহত হন.ফুল্লরা তাদের বুঝিয়ে শান্ত করে শ্রীমন্তকে দুষ্টুমি থেকে নিরস্ত করার জন্য গুরুগৃহে পাঠিয়ে পড়াশোনা করানোর কথা ভাবেন। খুল্লনার আদেশমতো দুবলা দাসী শ্রীহরি পণ্ডিতকে বাড়িতে ডেকে আনলেন শ্রীমন্ত তারই অধীনে পড়াশোনা শুরু করেন-

দুবলা ডাকিয়া আনে পণ্ডিত শ্রী হরি।

শুভক্ষণ গনিঞা ছাল্যাকে দিল খড়ি।।

শ্রীমন্ত পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অল্পদিনেই তিনি শ্রীহরি পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাচর্চায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন গুরুর কাছে প্রদত্ত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। খুল্লনা পণ্ডিতকে প্রচুর সুবর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিয়ে বিদায় জানান। গুরুর বিদায় কালে গুরু শ্রীমন্তের হাতে পুঁথি ও খড়ি তুলে দেওয়ার সময় চণ্তীর মায়ায় শ্রীমন্তের হাত থেকে খড়ি মাটিতে পড়ে যায়। শ্রীমন্ত তৎক্ষণাৎ সেই খড়ি গুরুকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আদেশ করলে শ্রীমন্তের এই ব্যবহারে গুরু রুষ্ট হয়ে তাকে জারুয়া সম্বোধনে গালিগালাজ করেন। শ্রীমন্ত গুরুকে পুঁথি আছড়ে মারেন, তারপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেন-

সাধুকে পণ্ডিত বলে জারায়া বচন।

মাতা তোর খুলনা পিতা কুন জন।

সাধুকে পণ্ডিত জদি জারয়া বলিল।

পণ্ডিতের মাথে সাধু পুঁথি আছারিল।।

ঘরে রহিল সাধু কপাট ভিড়িএগ।

পুত্র না দেখিঞা রামা ফিরেন কান্দিঞা।।

খুল্লনা শ্রীমন্তের এই মনোকষ্টে দুঃখিত হয়ে তাকে বোঝাতে চাইলে শ্রীমন্ত বলেন-

জাব গয়া প্রাগ জথা তল্লাস করিব পিতা

ভ্রমিব দেশ সকল।

পিতা স্বর্গ পিতা মর্থ পিতা সকল তীর্থ

পিতা বিনে জীবন বিফল।।

খুল্লনা শ্রীমন্তকে বোঝান তার পিতা ধনপতি প্রায় বারো বছর আগে বাণিজ্য যাত্রা করে আর ফেরেননি, তিনিও যদি সে পথ অনুসরণ করে একই কাজ করেন তবে খুল্লনা অনাথিনী হয়ে যাবেন। শ্রীমন্ত মায়ের এসব কথায় প্রচণ্ড চটে গিয়ে মাতৃচরিত্রে সন্দেহ পৌষণ করে বলেন-

পরার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।

স্বামী করিঞা মাতা তোরে নাঞ্জি মন।

অবিচার করি কেনে করিছ ত্রন্দন।

তারপর মাতাকে স্বামী সেবার উপদেশ দেন এভাবে-

পিতার সহিতে ঘরে আসিবে জখন।

করিহ স্বামীর সেবা শুনহ বচন।।

মাতা পিতা ভাই বন্ধু কার কেহু লয়।

সকল জানিবা মাএ পথের পরিচয়।।

স্বামী ইষ্ট স্বামী মিত্র স্বামী বন্ধুজন।

স্বামী বিনা অন্ধকার এ তিন ভুবন।।

মানিক দত্ত এভাবে শ্রীমান্তের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তাতে শ্রীমন্ত ধনপতির তুলনায় অনেক বেশি জেদী, একগুঁয়ে দৃঢ়চিত্ত বলে মনে হয়। তেজস্বিতা, নিভীক সত্যবাদিতা ও আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ। তবে হঠাৎ অকারণে মাতৃচরিত্রে সন্দেহ পোষণ ও উপদেশ দান তাঁর চরিত্রের এই আনুপূর্বিকতাকে ক্ষুন্ন করেছে। শ্রীমন্ত বার-বছর বয়সে সমুদ্রযাত্রা করেছে এটা ভাবলে তাকে দুঃসাহসী মনে হয় কিন্তু শ্রীমন্ত দেবীর একান্ত ভক্ত হওয়ায় পাঠক সমাজ আগে থেকে জেনে যান যতই বিপদ আসুক না কেন তার কিছুই হবে না। তাই পথের মধ্যে তার পিতার মতো 'কমলেকামিনী' দর্শন শালবান রাজাকে তা দেখিয়ে পিতার মুক্তি সংঘটন এসব ঘটনা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে ঘটে গেছে; পাঠক মনে দাগ কাটেনি। মানিক দত্তের শ্রীমন্ত তাই কবির এক নিতান্ত দুর্বল সৃষ্টি।

৬॥ লহনা

‘চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ‘বণিক'-খণ্ডের অন্যতম চরিত্র লহনা। লহনা ধনপতির প্রথমা স্ত্রী, নিঃসন্তান। উজানীর রাজা বিক্রমকেশরী ধনপতিকে “আঁটকুড়ে” অপবাদ দিয়ে কটাক্ষ আশ্বস্ত করে

সবে বলে লহনা এগার বরিষে।

অল্প বয়েসে তরুণতা নাই ফল ধরিবে কিসে।।

জেনা বিক্ষ ফল ধরে অল্পেতে চিহ্ন পাই।

সত্য বলিলাম লহনার ছেইলা নাই।।

আর চারি বৎসর থাক প্রভু চিন্তে খেমা দিয়া।

না হয়ে লহনার ছাইলা করিহ দ্বিতীয় বিহা।।

তারপর এই একই সঙ্গে লহনা ধনপতির প্রতি পরিহাসছলে যে ইঙ্গিত পূর্ণ বাক্যটি করেন-

পরার বালক প্রভু উদরে ধরিয়া।

ছেইলা দশবার প্রভু দিব প্রসবিয়া।।

তা গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট এবং লহনার চরিত্রের স্থুলতার পরিচায়ক। ধনপতি লহনার নিজের খুড়তুতো বোন খুল্লনাকে বিয়ে করেছেন। খুল্লনা রূপসী ও যুবতী। নিজের রক্তের সম্পর্কিত কেউ তাঁরই ক্ষতি করতে প্রবৃত্ত হয়েছে একথা ভেবে লহনা স্বাভাবিক নারীসুলভ ঈর্ষার বশেই খুল্লনার মন্দ করতে অগ্রসর হয়েছেন।

লহনা নিজেই দুবলা দাসীকে নিলাবতী ব্রাহ্মনীকে ডেকে আনার আদেশ দিয়েছেন। নিলাবতী লহলার সখী। সখী আহেন অবস্থায় তিনিও ময়রটিতে আপার দিয়েছেন। লহনা নিলাবতীর সঙ্গে যুক্তি করে বশীকরণ শিখে স্বামী ধনপতিকে বশ করতে চেয়েছেন-

প্রথম হাটের সই লাগে গুয়াপান।

প্রথমে জে অন্ন খায় তার লাগে ধান।।

খঞ্জনের হাড় লাগে আর অঙ্গের মলা।

সাত কুপের পানি লাগে তেপথির ধুলা।।

অন্ন সহিত এই গাছ স্বামীকে খাগডাবে।

প্রাণের অধিক স্বামী তোমাকে জানিবে।।

মানিক দত্তের এই বশীকরণ চিত্র অত্যন্ত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়েছে। লহনা এরপর সখী নিলাবতী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে যুক্তি করে ধনপতির গৌড় যাত্রার সুযোগ সম্পূর্ণ কাজে

লাগিয়ে নিলাবতীকে দিয়ে কপট পত্র লিখিয়ে খুল্লনাকে ছাগল চড়ানোর আদেশ করেছেন-

নিলাবতী লহনা দুজনে যুক্তি কৈল।

নিলাবতী কপট পাতি লেখিতে লাগিল।

শুনহ লহনা তোকে লাগে গৃহভার।

খুলনার কাড়িয়া লইবে অলঙ্কার ।।

লহনা পালিহ কথা লেখনের মতে।

বনে দিহ খুলনাকে ছেলি চরাইতে।।

খুদের চাউল দিহ খুল্লনাকে খাইতে।

রাত্রকালে শুইতে দিহ ঢেকিশালাতে।।

পড়িতে মেখলা দিহ উড়িতে খসলা।

পোড়া অন্ন খাইতে দিহ শয়নের বেলা।।

খুল্লনা লহনার এই কপট যড়যন্ত্র বুঝতে পেরেছেন এবং নিলাবতীর হাতের লেখা চিনতে পেরেছেন তখন লহনা ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক কারণেই খুল্লনাকে কিল, চড়, লাথি মারতে শুরু করেছেন-

কপট পাতি শুন দিদি লেখিঞাছ তুমি।

লেখিঞাছে নিলাবতী চিহিন্দলাম আমি।।

নিলারতীর, হতে দিনিলেখাল্যা সরুলি।

নিলাবতীর হস্তে দিদি লেখাল্যা সকলি।

তোমার কথাএ কেনে চড়াইব ছেলি।।

শুনহ লহনা দিদি তোর সকল নাট।

আমাকে বুঝিঞা দেহ গৃহস্তির বাট।।

কথা শুনি ক্রোধ হইলা লহনা যুবতি।

খুল্লনার চুল ধরি মারে কিল লাথি।।

মারধরের পর লহনা খুল্লনার জন্য যে পরিশ্রম, খাওয়া ও শোওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তার মধ্যে তার রীতিমতো পরিকল্পনার আভাস আছে। লহনা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছেন যে তারুণ্যদের লাবণ্যে ধনপতি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বাড়িতে এনেছেন তা যদি এই সুযোগে নষ্ট করে দেওয়া যায় তবে ধনপতির আদরের অভিমুখ পুনরায় তাঁর দিকেও ফিরতে পারে। লহনার নিজের হতাশা থেকে এই অবদমিত কামনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। লহনার এই একই মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় ধনপতির বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষ্যে খুল্লনার দেবী চণ্তীর পূজা করার ঘটনায়। লহনা ঘরে উঁকি মেরে চণ্ডী ও খুল্লনার কথোপকথন শুনে (দুর্গা খুলুনায়ে কথা ঘরের ভিতরে)। টুকা দিয়া লহনা দেখিল খুলনারে।। ধনপতির কাছে কপট করে বলেছে খুল্লনা দেবী চণ্তীর কাছে 'ডাইন পনা" শিখছেন-

চলিল লহনা জথাতে ধনপতি।

কপটে কহেন কথা হইএগ অশ্রুমুখী।

তোমার কারণে প্রভু বিদরে মোর হিয়া।

খুলুনা কি কন্ম করে হের দেখসিআ।।

কিবা পুজা করে প্রভু বুঝিতে না পারি।

না শুনে আমার বাক্য প্রাণ ফাটে মরি।।

স্বামীর কাছে উপস্থিত হয়ে কপট অস্রুমুখী লহনার সপত্রী খুল্লনার প্রতি এই কুটমন্ত্রণা একান্তই বাস্তব ও জীবন্ত হয়েছে। লহনার এই কপটতায় ধনপতির মতো চতুর

বণিকও ধরাশায়ী হয়েছেন। ধনপতি ছুটে গিয়ে কোনো বাছবিচার না করেই লহনার কথায় চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করেছেন। ধনপতির এই গর্হিতি আচরণে লহনার মনে কোনো বিকার জন্মেনি। স্বামীর এরূপ আচরণে মর্মাহত খুল্লনা দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে যেখানে Damage control, করতে চেয়েছেন সেখানে প্রতিপক্ষের উপর মোক্ষম আঘাত হানতে পেরে লহনা আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

বস্তত এভাবে মানিক দত্তের ধনপতি আখ্যানে লহনা চরিত্রের যে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে লহনা চরিত্রটি স্বাভাবিক ও মনস্তত্বসম্মত এক নারী চরিত্র বলে মনে হয়। পরবর্তী কবি কবিকঙ্কণ লহনার এই ঈর্ষার মধ্যে রামায়ণের মন্থরার মতো দুবলাদাসীর হাত রয়েছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু মানিক দত্ত এরকম বাদবিসম্বাদে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির কথা স্বীকার করেননি। তিনি লহনার মধ্যে স্বাভাবিক বাঙালির নারীসুলভ ঈর্ষার মনোভাবকেই বড় করে তুলেছেন। তাই মানিক দত্তের লহনা পরবর্তীকালের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী থেকেও শক্তিশালী সৃষ্টি।

৭॥ খুল্লনা

মধ্যযুগের মঙ্গল-সাহিত্যে বেহুলার পর যে চরিত্র পাঠক-সকলের মনে অনপনেয় একটা দাগ কেটে যায় তা খুল্লনার চরিত্র। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের খুল্লনা চরিত্রটিকে প্রায় সব কবিই যত্র সহকারে এঁকেছেন। খুল্লনা ইছানী নগরের লহনার পিতা নিধুপতি বণিকের ভ্রাতা লক্ষপতির কন্যা। মা রম্ভা। অর্থাৎ সম্পর্কের দিক থেকে খুল্লনা লহনার খুড়তুতো বোন। খুল্লনা যুবতী ও রূপসী। উজানী রাজ বিক্রমকেশরী কর্তৃক 'আঁটকুড়ে' অপবাদে আখ্যাত হওয়ার পর ধনপতি পায়রা উড়ানোর নেশায় ইছানী নগরে যান। ধনপতির পার প্রশিক্ষিত) খুনাদের ঢালে গিয়ে বসে। খুন পায়রার বাপে মুগ্ধ হয় উঠলো রাই-সরষে ছিটিয়ে দিয়ে আয় আয় করে ভাকতে থাকেন। পায়র খুল্লনা আঁচল দিয়ে পায়রা ধরার জন্য এগিয়ে যান। ধনপতির পায়রা ভিতর দিয়ে গলে গিয়ে তার কাঁচুলিতে লবরঙ্গ আঁকা দেখে সেই লবরঙ্গ । কাঁচলি ছিন্ন করে কীচলির মধ্যে প্রবেশ করে। খুল্লনা পায়রার এহেন আচরণে বিস্মিত হলেও ক্রুদ্ধ হন না। বরং একটা প্রশ্রয়ের সুর তাঁর গলায় শোনা যায়-

পণ্ডিত পাএরা তুঞ্চিঃ দেখিয়া কোলে লৈনু মুঞ্চিঃ

তুই পাএরা বড়য়ে অধম।।

এমন অধম বুদ্ধি কুন স্থানে পাইয়াছো।

পরার ধনে কর মন।।

মোরা পুরুষ ভ্রমর জাতি পুস্প দেখি ভুলে মতি

গন্ধ অনুসারে ধাই।

আগম পুরাণে বলে চারি বেদের সার

পরদারে পাপ কিছু নাঞিঃ।।

পরার ধন লুটিয়া খাও কতেক সম্পদ পাও

অন্তকালে কিবা হবে গতি।

জাহার যৌবন দেখি ভুলিল তোমার মতি

তাহার নাহিক নিজ পতি।

খুলুনার বাক্য শুনি পাএরা বলিছে বাণী

তোমার কথা কর ঘরে ঘরে।

চারি শহর আমি তোমার কথা কহিব

তোকে জানি কেহু বিবাহ নাই করে।।

পায়েরার বাক্য শুনি কান্দে রামা খুলুনি

অ পায়েরা পায়ে ধরি তোরে।

মানিক দত্ত খুল্লনা ও পায়রার এই প্রতীকী বর্ণনায় খুল্লনার যৌবন, যৌবনে ভোগের জন্য পুরুষকে আহবান এবং সেই ডাকে পুরুষের সাড়া দেওয়া এসবই বোঝাতে চেয়েছেন। স্বল্প পরিমাণে হলেও কবির বর্ণনায় খুল্লনার রোমান্টিক প্রেমের আকুলতার সুর এখানে ধবনিত।

এরপর পায়রার খোঁজে ধনপতি যখন লক্ষপতির বাড়িতে হাজির হলেন তখন খুল্লনার রূপ তাঁকে মুগ্ধ করে। ধনপতি লক্ষপতির কাছে এরূপ লায়েক যুবতী মেয়ে বাড়িতে মরু জানতে মন! ধনপতির করায় লব্দপতি জপমানাহত হয় ভি আনে প্রসঙ্গ উথাপন করে খুল্লনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন-

আটকুড় হৈলাম আমি উজানী নগরে ।।

এক কথা লক্ষপতি বলি তোমার তরে।

তোমার পিতার পুণ্যে কন্যা দান কর মোরে

লক্ষপতি নিজ ভাইঝির সতীন হাওয়ার আশঙ্কায় ধনপতির প্রস্তাবকে প্রথমে পত্যাখ্যান করে-

কি বোল বলিলা বাপু ধড়ে থুইয়া জিউ

এক কন্যা দিয়াছি বিবাহ সহদর ভাইয়ের ঝিউ

আর বিবাহ করিতে জদি সাধ থাকে তোরে।

আগে জিজ্ঞাসিয়া আমি রম্ভাবতীর তরে।।

শেষে ঘটক ঠাকুরের মধ্যস্থতায় ধনপতি-খুল্লনার বিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের পর খুল্লনা ধনপতির সঙ্গে উজানী নগরে ফিরলে নিঃসন্তান লহনা খুল্লনার রূপে আশঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁর ভয় তিনি অচিরেই স্বামীর সোহাগ থেকে বঞ্চিত হবেন। স্বামী ধনপতিকে তিনি আর কিছুতেই বশে রাখতে পারবেন না। নারীসুলভ এই ঈর্ষা ও ক্রোধ থেকে লহনা নানারূপ কৌশল রচনা করে খুল্লনার রূপ ও যৌবনের

লাবণ্য নষ্ট করতে চেয়েছেন। আমরা লহনা চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে সে সব উত্থাপনও করেছি।

অন্যদিকে, খুল্লনা সম্পূর্ণ নির্দোষ। হরিণ যেমন “অপণা মাংসে অপণা বৈরী” খুল্লনাও তাই। খুল্লনা নিজের বূপগুণে নিজেই বিদ্ধ হয়েছেন। খুল্লনার কপালটাই মন্দ। তিনি শুধু নিজ সপত্নী নয়, স্বামী সন্তান সকলের কাছ থেকে গঞ্জনা ও লাঞ্ছনা পেয়েছেন। ধনপতি যখন গৌড়দেশ থেকে ফিরে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে নিজ জ্ঞাতিভ্রাতা ও বন্ধুবর্গকে নিজ বাড়িতে নেমতন্ন করে খাওয়াতে চেয়েছেন, খুল্লনা তখন একাই রান্না করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বণিক প্রতিনিধি যখন ধনপতির বাড়িতে খাবেন না ঠিক করেছেন খুল্লনা যাত্রার প্রাক্কালে দেবীর কাছে স্বামী যাতে পাটনে গিয়ে কোনো বিপদে না পড়েন তার জন্য প্রতিশ্ররতি আদায়ের জন্য দেবীর পূজারও আয়োজন করেছেন। যদিও লহনার কুটকৌশলে বিভ্রান্ত ধনপতি দেবীকে অপমানিত করেছেন কিন্তু খুল্লনা তাতে একটুও দমে যাননি বা ঘাবড়ে যাননি। তিনি দেবীর সঙ্গে তার পুরানো সম্পর্ক মেরামতের মরিয়া চেষ্টা করে গেছেন, স্বামীর দোষ স্বীকার করে দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

আবার, ধনপতি যখন বাণিজ্য পাটনে গেছেন এবং শ্রীমন্তের জন্ম হয়েছে তখন পিতার অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাল্যকালে দুরন্ত প্রকৃতির শ্রীমন্তকে সহবৎ শেখানোর জন্য পণ্ডিতের কাছে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। পিতা বিদেশে ছিলেন, মা এই সময় তার দায়িত্ব পালন করেননি, ধনপতির এ গঞ্জনা যেন তাকে শুনতে না হয়, খুল্লনা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেছেন-

মুক্ষ হঞা বাড়ে পুত্র সাধু নাই ঘরে।

সাধু আসিঞা মন্দ বলিবে আমারে।।

খুল্লনা শ্রীমন্তের পড়াশোনার ব্যাপারে আধুনিক কালের সচেতন মায়ের মতো প্রচণ্ড যতুবান থেকেছেন। শ্রীমন্ত যাতে শ্রেণিতে পিছিয়ে না পড়ে সে কারণে অতিরিক্ত যত্বের জন্য বাড়িতে দুর্গাকে Tutor রেখেছেন-দিবসে পড়েন সাধু গুরুপাট স্থানে।

রাত্রে পড়ান দুর্গা আসিঞা আপনে ।।

কিন্তু দেবী চণ্ডীর মায়ায় পণ্ডিত শ্রীমন্তের পিতৃত্ব সন্দেহ পোষণ করে কটাক্ষ করে বলে ওঠেন-

সাধুকে পণ্ডিত বলে জারয়া বচন।

মাতা তোর খুলনা পিতা কুন জন।।

পণ্ডিতের এই কথায় শ্রীমন্ত পাগল প্রায় আচরণ করতে শুরু করলে খুল্লনা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছেন। শ্রীমন্ত মাতৃহৃদয়ের এই প্রবণতা বুঝতে না পেরে পিতাকে নিয়ে মাকে নানা কটুকথা শুনিয়েছেন-

পারার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।।

স্বামী করিঞা মাতা তোরে লাঞ্চ মন।

অবিচার করি কেনে করিছ ক্রন্দন।।

উপদেশ দিয়েছেন-

পিতার সহিতে ঘরে আসিবে জখন।

করিহ স্বামীর সেবা শুনহ বচন।।

মাতা পিতা ভাই বন্ধু কার কেহু বচন লয়।

সকল জানিবা মাএ পথের পরিচয়।।

স্বামী ইঞ্ট স্বামী মিত্র স্বামী বন্ধুজন।

স্বামী বিনা অন্ধকার এ তিনভুবন।।

সতী নারীর স্বামী নারায়ণ সমতুল।

খুল্লনা নির্বিকার চিত্তে সব সহ্য করেছেন। মাতৃস্নেহের কোমলতা দিয়ে সব সিক্ত করে দিয়েছেন। শ্রীমন্তকে বাণিজ্য পাটনে যাওয়ার সময় অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় জানিয়েছেন, কোনো অভিসম্পাত করেনি।

সর্বোপরি মানিক দত্ত তার চণ্তীমঙ্গল কাব্যে খুল্লনা চরিত্রের যে রূপচিত্র করেছেন তা একান্তই বাঙালি জীবন সম্পৃক্ত চিরন্তন মাতৃহৃদয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। খুল্লনা চরিত্রকে যদি দুটি পর্বে ভাগ করি (বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী) তবে দেখব পূর্ববর্তী পর্বে খুল্লনা যে রোমান্টিকতা নিয়ে আমাদের সামনে ধরা দিয়েছেন পরবর্তী পর্বে তার সবটাই চিরন্তন বাঙালি বধূর ত্যাগ তিতিক্ষা ও মাতৃহৃদয়ের আকুলতায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ কবি মানিক দত্ত খুল্লনা চরিত্রটিকে কাহিনির মধ্যে ক্রম অনিবার্য একটা পরিণতির এগিয়ে নিয়ে গেছেন।খুল্লনা তাই মানিকদত্তের কাব্যের সবচেয়ে শিল্পিত সৃষ্টি।

১০.৫ : চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় মানিক দত্তের স্বতন্ত্রতা

মানিক দত্তের ‘চন্ডীমঙ্গল’-কাব্যে এভাবে সারা কাহিনি জুড়ে কিছু কিছু প্রসঙ্গোপকরণের বর্ণনা পাওয়া যায় যা তাঁর একান্ত নিজস্ব অন্য কোনো চন্ডীকবির কাব্যে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এরকম কিছু বর্ণনা হল-

ক) মানিক দত্তের কাব্যে দেখা যায়, দেবী চন্ডী তাঁর সখী বাহুড়া অর্থাৎ পদ্মাকে মর্ত্যে পদ্মার পূজা প্রচলিত থাকলেও চন্ডীর নিজের পূজা প্রচলিত নেই কেন জিজ্ঞাসা করলে পদ্মা জানান, মর্ত্যে ধুম্রাসুরের ভয়ে কেউ দেবতার পূজা করতে পারেন না। দেবী তখন ধুম্রাসুরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান শুরু করে ধুম্রাসুরকে হত্যা করেন। তার পরে পদ্মার উপদেশে কলিঙ্গে দেহরা নির্মাণ করে কলিঙ্গরাজকে দিয়ে নিজ পূজা করিয়ে নেন। মানিক দত্তের এই বর্ণনা তাঁর নিজস্ব। দ্বিজমাধব তাঁর কাব্যে অসুর দলনী চণ্ডীর ভাবনা অনুযায়ী ধুম্রাসুর নয়, মঙ্গলাসুরকে বধ করিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, মঙ্গল নামক দৈত্য বধ করেই দেবী মঙ্গলচন্ডী আখ্যা লাভ করেন। কিন্তু মুকুন্দ চক্রবর্তী এই বর্ণনা গ্রহণ করেননি। তিনি দেবীর উগ্রমূর্তি অপেক্ষা কল্যাণী মূর্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে

মঙ্গলকাব্যে দৈত্যের কাহিনির পরিবর্তে উমার জন্মবৃতান্ত বর্ণনা করে চণ্ডীর পরিবর্তে উমাকে দেবীর আসনে উপবেশন করান।

খ) মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে দেবী-মাহাত্ম্যের পাশাপাশি চন্ডীদেবীর পুথি মাহাত্ম্যও প্রচার করেছেন। দেবী চন্ডী কলিঙ্গরাজের মাধ্যমে মর্তে মাহাত্ম্য প্রচার করে সেই মাহাত্ম্য জনসমাজের মধ্যে আরো ব্যাপকভাবে কি করে প্রচার করা যায় তার জন্য পদ্মার সঙ্গে পরামর্শে বসেন। পদ্মার পরামর্শে স্থির হয় দেবী ইন্দ্রপুরী থেকে নিজ পুথি মর্ত্যের কানা ও খোঁড়া গায়ক মানিক দত্তের শিয়রে রেখে স্বপ্নাদেশে তাঁকে মর্ত্যে দেবীর মহিমা এবং তাঁর গানের মাধ্যমে মর্ত্যে দেবীর মহিমা প্রচারিত হবে। পদ্মার পরামর্শ মতো দেবী ইন্দ্রপুরী থেকে পুথির প্রাপ্ত এক অষ্টমাংশ মানিক দত্তের শিয়রে রেখে দেন এবং তাঁর মাথায় পদাঘাত করে দেবী তাঁকে সুস্থ করে তোলেন।

মানিক দত্তের শিরে নাথীকার ঘা।

কানাখোড় দূর গেল দিবব্য হৈল গা।।

দেবীর কৃপায় অঙ্গবিকৃতি থেকে মুক্তি পেয়ে মানিক দত্ত দেবীর স্বপ্ন প্রদত্ত পুথি পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু দীর্ঘায়তন সেই পুথি একমাস পড়েও তিনি তা শেষ করতে পারলেন না। মানিক দত্ত ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললে দেবী পুনরায় স্বপ্নাদেশে মানিক দত্তকে সঠিক দিশা দেন-

অন্তরে জানিল মা মঙ্গলচন্ডীগণ।

পুনরুপী মানিকদত্তে দেখাল্য স্বপন।।

শুন বাছা মানিকদত্ত না কর সংশয়।

রচীয়া করহ পুঁথি ভুবন বিজয়।।

প্রভাতে উঠিয়া দত্ত পুথি দেখে নাড়ি।

তিন লক্ষ পুস্তক মধ্যে আছেন নাচাড়ী।।

তিন লক্ষ দূরে রাখি তিনশত কৈল।

বত্তীশ নাচাড়ী গীত অধিক রাখিল।।

তিনশত বত্তীশ নাচাড়ী রচিত হইল গান।

পথ দিশা তাথে অনেক করিল মূর্তিমান।

গ) মানিক দত্তের ‘চন্ডীমঙ্গল’-কাব্যের 'ব্যাধখণ্ডে’ দেখা যায় দুই ব্যাধ ধর্মকেতু ও নিশানকেতু শিকারে গিয়ে দেবীর চক্রান্তে উভয় উভয়কে পশু ভেবে বাণ নিক্ষেপ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রীগণও সহমরণে যান। মানিক দত্তের এই বর্ণনা তার নিজস্ব, পরবর্তী কবি দ্বিজমাধব মানিক দত্তের এই বর্ণনাকে অনুসরণ করেছেন।

ঘ) কলিঙ্গ রাজ্য ভেঙে গুজরাট নগর পত্তন করাতে কলিঙ্গরাজ ও তাঁর সঙ্গী ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর উপর ক্রুদ্ধ হয়। কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কালকেতু যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে দেবীর আরাধনা করলে দেবী কালকেতুকে হিরিমকসের চাল (তাবিজ ও কবজ) দান করেন। এই চাল-এর বিশেষত্ব হল যতক্ষণ তিনি এটা ধারণ করবেন দেবীর আশীর্বাদে ততক্ষণ তিনি জয়ী হতে থাকবেন। মানিক দত্তের এই বর্ণনা ‘চন্ডীমঙ্গল'-কাব্যধারায় দ্বিতীয়রহিত। তন্ত্রপ্রভাবিত অঞ্চল গৌড়বঙ্গের কবির এই বর্ণনায় তন্ত্রপ্রভাবের পরিচয় সুস্পষ্ট।

ঙ) কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধে কালকেতু পরাজিত ও বন্দি হন। দেবীর কৃপায় কালকেতু বন্দিবাস শেষ করে গুজরাটে ফিরে এসে ভাঁড়ু দত্তের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলে রাগে ভাঁড়ু কালকেতুকে “আটকুর” বলে গালমন্দ করেন। কালকেতু তখন ভাঁড়ুর কথায় দুঃখ পেয়ে পুত্রলাভের আশায় গৃহবাস ছেড়ে দিয়ে ফুল্লরাকে সঙ্গী করে দেবীর আরাধনা করে অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেবেন বলে মনস্থ করেন-

কোন ছাড় দত্ত ভাড়ুয়া নাবড়　　　　সে মোরে আটকুর বোলে

এত দুঃখ না সয় শরীরে।

আমার বচন ধর রাজ্য ভোগ পরিহর

চল জাই দুর্গা পুজিবারে।

ই ধন ঘরগারি সকলি পরিহরি

কাখে করিমু সমর্পণ।

মনতে রহিল ব্যথা কাহাতে কহিমু কথা

রাজা তেজিমু পুত্রের কারণ।।

কালকেতুর এই ভগ্নমনোরথে চণ্ডী ব্যথিত হয়ে কালকেতুকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং পুত্রবর না নিয়ে পূর্বের জীবনে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু ও ফুল্লরা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেন এবং দেবী তাঁদের জীবাত্মা নিয়ে পুনরায় পূর্বদেহে জীব সঞ্চার করে ইন্দ্রের নিকট সমর্পণ করেন। মানিক দত্তের এই বর্ণনা কালকেতুর কাহিনির সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত। অন্যান্য চণ্ডীকবি, এমনকি মুকুন্দরামও এমন কাব্যোপযোগী বর্ণনা দিতে পারেননি।

চ) ধনপতি কেন খুল্লনাকে বিয়ে করেছে মানিক দত্ত সে সম্বন্ধে দেবীর কৌশলের সঙ্গে নিজস্ব গ্রাম্য স্থূল জীবনভাবনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। দেবী চণ্ডী নিজ কার্যসিদ্ধির জন্য ধনপতি বণিকের দেশ উজানী নগরের রাজা বিক্রমকেশরীকে স্বপ্নাদেশ দেন তিনি যেন অপুত্রক ধনপতি সদাগরকে তাঁর সভায় সম্মান না দেখান। দেবীর আদেশ বিক্রমকেশরী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। দেবীর মায়ায় বিক্রমকেশরীর কাছে এভাবে অপমানিত হয়ে ধনপতি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে স্ত্রী লহনার কাছে ফিরে গিয়ে খেদ ব্যক্ত করেন-

সাধু বলে তুমি মোর লহনা বাণিয়ানী।

তোমার কোলে পুত্র নাই অভাগিয়া আমি।।

রাজসভায় জাইতে বড় লজ্জা পাই।

লোকে বলে আটকুড়ার মুখ নাহি চাই।।

লহনা এসময় ধনপতিকে কিছুদিন ধৈর্য্য ধরার কথা বলে বুঝিয়ে শান্ত করতে গিয়ে যে ইঙ্গিত করে তাতে স্থূল গ্রাম্যতার প্রকাশ ঘটেছে-

সবে বলে লহনা এগার বরিষে।

অল্প বয়সে তরুণতা নাই ফল ধরিবে কিসে।।

জেন বিক্ষ ফল ধরে অল্পেতে চিহ্ন পাই।

সত্য বলিলাম মহিলার ছেইলা নাই।।

আরি চারি বৎসর থাক প্রভু চিত্তে ক্ষেমা দিয়া।

না হলে লহনার ছাইলা করিহ দ্বিতীয় বিহা।।

পরার বালক প্রভু উদরে ধরিয়া।

ছেইলা দশবার প্রভু দিব প্রসবিয়া।।

মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে দেখলে এসব প্রসঙ্গ নতুন কিছু নয়। মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের নৈতিক মানই ছিল এরকম। গানের আসরে তাদের আনন্দ দেবার জন্য কবি বা গায়েনরা অবলীলাক্রমে এইসব প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন।

বস্তত দেখা যায়, মানিক দত্ত তার ‘চন্ডীমঙ্গল'-কাব্যে এমন বহু প্রসঙ্গ ও কাব্যানুষঙ্গের অবতারণা করেছেন তা তাঁর নিজস্ব ও অন্য কোনো চন্ডীকাব্যের রচনায় পাওয়া যায় না। সাহিত্যের ইতিহাসে চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ধারাবাহিক আলোচনায় এইসব তথ্য এবং কবিত্বের স্বরূপ বিচারে এই সব প্রসঙ্গের গুরুত্ব আছে। তাই শুধু ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যধারায় নয়, বাংলা সাহিত্যধারায় মানিক দত্তের কাব্যের স্বতন্ত্র এক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। সুতরাং, মানিক দত্তের কাব্য গৌড়জনের নিরবধিকালের ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা ও কাব্যসুধাস্বাদনে নিরন্তর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে তা সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায়।

১০.৬ : অনুশীলনী

১। টীকা লিখুন - লোকপুরাণের স্রষ্টা মানিক দত্ত।

২। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে গৌড়বঙ্গের সমাজ জীবনের পরিচয় দিন।

৪। চরিত্র-চিত্রন দক্ষতায় মানিক দত্তের কৃতিত্ব আলোচনা করুন।

৫। চন্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় মানিক দত্তের স্বতন্ত্রতা কোথায়? তার পরিচয় দিন।

১০.৭ : গ্রন্থপঞ্জি

১. চন্ডীমঙ্গল- সুকুমার সেন

২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- (প্রথম খন্ড) সুকুমার সেন

৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫. কবি মুকুন্দরাম- ক্ষেত্র গুপ্ত

৬. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- সনৎ কুমার নস্কর

৭. কবিকঙ্কণচণ্ডী- তরুণ মুখোপাধ্যায়

৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা- সুখময় মুখোপাধ্যায়

১০. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১১. চণ্ডীমঙ্গলকাব্য সৃষ্টি ও নির্মাণ- আদিত্যকুমার লালা

একক ১১। মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের শিল্পরীতি

বিন্যাসক্রম

১১.১ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের হাস্যরস

১১.২ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের ভাষা

১১.৩ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের ছন্দ

১১.৪ : মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের অলংকার

১১.৫ : অনুশীলনী

১১.৬ : গ্রন্থপঞ্জি

১১.১: মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের হাস্যরস

বাংলা সাহিত্যে হাসির উপাদানগুলি নিয়ে কবিরা সুপ্রাচীনকাল থেকে (চর্যাপদের যুগ) হাস্যরসের জোগান দিয়েছেন। মধ্যযুগের সাহিত্যেও কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। মধ্যযুগের সাহিত্যের কবি ও গায়কেরা আসরে গান করতে গিয়ে শ্রোতা ও দর্শকদের রেখেছেন। তবে কবিরা দর্শকদের মানসিক অভিপ্রায় ও রুচির দিকে নজর দিতে গিয়ে তাঁদের হাস্যরস বর্ণনার প্রসঙ্গগুলিকে অনেকটাই মোটাদাগের করে ফেলেছেন, মঙ্গলকাব্যগুলিতে যার চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের সব কবি এমনকি আমাদের আলোচ্য কবি মানিক দত্ত এই দোষ থেকে মুক্ত নন। মানিক দত্ত নিজে কবি ও গায়ক ছিলেন। তিনি রঘু ও রাঘব এই দুইজন পালি ও দোহার নিয়ে তাঁর গানের সম্প্রদায় গঠন করে কলিঙ্গ নগরে গান করে বেড়াতেন।

‘তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।

রঘু রাঘব পালী আইল দুইজন।।

তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা করিল।

কলিঙ্গ নগরে দত্ত আসি উত্তরিল।।

প্রথম মঙ্গলবারে বারি স্থাপন করিয়া।

ভবানির মঙ্গলগান পঞ্চম আলাপিয়া।।

কার না লয় অর্থ কার না লয় ধন।

গীতে মোহিত হৈল সর্বলোকের মন।।'

স্বাভাবিকভাবে তিনিও তাঁর কাব্যে দর্শকদের মানসিক অভিপ্রায়কে মূল্য দিতে গিয়ে কাব্যের বহুজায়গায় হাস্যরসকে স্থূল করে ফেলেছেন।

মানিক দত্তের দেবখণ্ডের কাহিনিতে দেখা, শিব বিবাহের গন্ধ অধিবাসের দ্রব্য গৌরীর বাপের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নারদকে আদেশ দিলেন। শিবের কথা মতো নারদ বহু খাদ্য দ্রব্য দিয়ে অধিবাসের নানা ভার সাজিয়ে পর্বত প্রমাণ সেই খাদ্যের ভারগুলিকে ভারী ভীম বীরের ঘাড়ে চাপিয়ে হিমালয়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনাও দিলেন। কিন্তু মাঝরাস্তায় গিয়ে আর সেই রসনামোহন খাবারের লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করে পথের উপরেই বসে পড়লেন সেই রসালো ও রসনামোহন খাওয়ার খেতে-

'নারদ বোলেন কথা শুন ভীম ভাই।

এত দ্রব্য থাকিতে খুধাএ দুঃখ পাই।।

শিবের বাপের নহি চাকর নফর

সকল দ্রব্য বস্যা খাবো পথের উপর

দুইজনে যুক্তি করি চিড়া ভিজাইল।

চিড়ার ওপর দধি গুড় সকল লইল।।'

খাওয়া শেষ হল। এখন কী করবেন নারদ মুনি বুদ্ধি ভাজতে লাগলেন। মাথায় কুবুদ্ধি এল, সব বাজে বস্তুতে গন্ধ অধিবাসের দ্রব্যের ভারগুলি ভরে নেবেন বলে ঠিক করলেন। সেই মত কাদামাটি, কলার চচা, ইত্যাদি নানা কুৎসিত অভক্ষ দ্রব্যে ভারগুলিকে ভরে দেওয়া হল-

'দধির হাণ্ডিতে মুনি কাদা ভরি দিল।

হাণ্ডির মুখেতে কিঞ্চিৎ দধি থুইল।।

আনিঞা চিনির হাণ্ডি চিনি সব নিল

সমুদ্রের বালু যত হাণ্ডিতে ভরিল।।'

তারপর সেই সব দ্রব্যাদি পরিপাটী করে বেঁধে ছেদে ভীমের কাঁধে চাপিয়ে নারদ পুনরায় রওনা দিলেন শিবের শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, প্রকৃতিতে এক উপস্থিত হয়ে সব ভারগুলি নামিয়ে দিলেন। হিমালয় ভারগুলি ঘরে তুলে দিয়ে নারদকে সামনে দেখে তাঁর সঙ্গে যখন কোলাকুলি শুরু করলেন ঠিক সেই সময় ঘরের মধ্যে গৌরীর মা মেনকা অতি উৎসাহ ভরে গন্ধ অধিবাসের দ্রব্য দেখতে গিয়ে দেখলেন, সব ভার নানা বাজে বস্তুতে ভর্তি-

'সভার মধ্যে ভীম জাঞা সব ভার থুল্য।

হিমালয়ের সঙ্গে নারদ আলিঙ্গন দিল।।

শিবের শাশুড়ি ভাড় দেখে শীঘ্র করি।

দধির হাণ্ডিত দেখে কাদা আছে ভরি।।

তারপর দেখিলেন কলার ভার।

কলা নাইক আছে চচা মাত্র সার।।

দ্রব্য দেখি মেনকা ক্রোধ বড় হৈল।

অধিবাসের ভার দূরে ফেলি দিল।।'

মেনকা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন নারদের দিকে। সমস্ত ঘটনা জেনেও না জানার ভান করে নারদ তাঁর সব দোষ মেনকার জামাই শিবের উপর চাপিয়ে দিলেন-

'নারদ বেলে মেনকাকে কেন কর রোষ।

ভার বান্ধি দিঞাছে শিব মোর নাই দোষ।।'

মেনকা শিবের কথা শুনে একটু হতভম্ভ হয়ে পড়লেন কিন্তু সঙ্গে এয়োতিরা এত সব কথা না শুনে সামনে নারদকে পেয়ে তাঁর উপর ঝাল মেটানোর জন্য চড়াও হলেন। নারদের গায়ে এয়োতিদের বহু কিল চড় পড়ল, অতি উৎসাহীরা দাড়ি ছিঁড়তে উদ্যত হলেন-

'নারীগণ নারদের মাথে মারে বাড়ি।

উপারিঞ লএ কেহ নারদের দাড়ি।।'

বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত এয়োতিদের হাতে নারদের এই হেনস্থার চিত্র আমাদের হাস্যদ্রেক করে। নারদ নিজে দোষ করেছেন অথচ সেই দোষ সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলেছেন শিবের উপর। নিদোষ মানুষকে এভাবে ফাঁসানোর চিত্রে নারদের উপর দর্শকদের মনে যে রাগ জন্মেছিল নারদের হাতে লাঞ্ছনার চিত্রে তা দমফাটা কৌতুক হাস্যে রূপান্তরিত হয়।

কৌশলী নারদ দমবার পাত্র নন, তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ওত পেতে থাকেন। জামাই শিবকে শাশুড়ি সহ সকলের সামনে বোকা প্রতিপন্ন করে তাঁকে হেয় করার জন্য আর এক ফন্দী আঁটেন। তিনি বিবাহের শোভাযাত্রা কৈলাসে পৌঁছালে জামাই বরণের মুহূর্তে শিবকে সকলের সামনে বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন। নারদের কথা মতো শিব শাশুড়ি সহ এয়োতিরা তাঁকে বরণ করতে এলে তিনি সকলের সামনে বিবস্ত্র হয়ে দাঁড়ান-

'নারদ বলে শিব মামা কথা বলি আমি।

শাশুড়ির সাক্ষাতে নাঙ্গট হঅ তুমি।।

নারদের কথাএ শিব নাঙ্গটা হইল।

নাঙ্গটা হইয়া শিব সভাতে ডাণ্ডাল্য।।'

শিবকে এরূপ অবস্থায় দেখে উপস্থিত এয়োতিরা লজ্জায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন, মেনকা ক্রোধে স্বামী হিমালয়কে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন-

'মেনকা বলেন রাজা তবে বলি আমি।

জেমন পাগল শিব সেই রূপ তুমি।।'

তারপর স্থির করে ফেললেন এই লজ্জা থেকে গৌরীকে বাঁচানোর জন্য তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবেন-

'কান্দিয়া মেনকা বলে গৌরী করি কোলে।

গৌরিরে লইয়া আমি ঝাঁপ দিব জলে।।'

বুড়োর বেশে হিমালয়ের সামনে ডমরু বাজিয়ে ববম ববম করে নাচতে লাগলেন। শিবের সঙ্গী-সাথীরাও শিবের চেয়ে কম যান না, শিবের নাচের তালে তালে তাঁরাও পা মেলাতে লাগলেন। শিবের আমোদ বেড়ে গেল-

'শিবকে দেখি নারীগণ দূরতে পলায়।

শ্বশুড়ের আগে শিব ডমরূ বাজায়।।

বুড়ার বেশ হঞা শিব হাসি হাসি পড়ে।

কথা কহিতে শিবের দন্ত গোলা নড়ে।।

প্রেত ভূত সঙ্গে শিব নাচে চারিপাশে।

শিবের চরিত্র দেখি সকলিএ হাসে।।'

শিবের এই আমুদে আচরণে সকল দর্শক সমাজও আনন্দে মত্ত হয়ে হাততালি দিয়ে ওঠেন, হাস্যরসে বিভোর হন।

যাইহোক নারদ পাত্রী পক্ষের যন্ত্রণা বুঝতে পেরে শিবকে এবার মোহনমূর্তি ধরতে অনুরোধ করেন। শিব নারদের কথায় মোহনমূর্তি ধারণ করেন। সেইরূপ দেখে সকলে খুশী হন। কবি মানিক দত্ত এখানে এভাবে নারদ ও শিব চরিত্রের সাহায্যে যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন তা স্থূল হলেও মধ্যযুগের বহু কবির কাব্যেই শিবের এই স্থূল আচরণ লক্ষ করা যায়। সপ্তদশ শতকের মনসামঙ্গল কাব্যের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল নারদের এরুপ বিবাহের অধিবাস দ্রব্য ভক্ষণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। শিবের বিবাহ সম্পর্কিত মজার এই কাহিনি চণ্ডীমঙ্গলের অপর কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীও অনুসরণ করেছেন। বস্তুত শিব নারদের এই ঘটনা আজকের যুগে কুরুচিকর মনে হলেও যুগরুচির নিরিখে বলা যায়, সে যুগে এইসব দৃশ্যে গ্রামীণ মানুষ কোনো অশ্লীলতার গন্ধ পেতেন না। বরং তারা এতে নিজেদের মনের মধ্যে লালন করা মনোভাবের প্রকাশ দেখে মনে মনে খুশীই হতেন।

দেবখণ্ডের অন্য একটি ঘটনায় দেখা যায়, দেবী চণ্ডীর কৃপায় ইন্দ্র নীলাম্বর নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। নীলাম্বর ক্রমে বড় হয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠলে, নারদ ঢেঁকি সাজিয়ে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য চন্দ্রের বাড়ি বিরাট নগরে যাত্রা করেন। নারদেরর এই ঢেঁকি সাজানোর বর্ণনা পাঠক ও দর্শক সমাজের মনে এক দমফাটা হাস্যরসের উদ্রেক করে।

‘ই বাক্য শুনিয়া মুনির আনন্দিত মন।

করিছে নারদ মুনি ঢেকির সাজন।।

ঢেকির চক্ষ নিম্মাণ কৈল সামুকের খুলি।

কন্ধ ফেলিয়া দিল কাপড়ের ঝুলি।।

ঢেকির কমরে বান্ধে শামুকের ঘাগর।

মুড়া ঝাটা বান্ধে নারদ গলাতে চামর।।

ঢেকির মাথাএ বান্ধে আম্রের শাখা।

ব্রহ্ম মন্ত্র জপিল মেলিল দুই পাখা ।।

ঢেকির সাজন করে করিয়া জতন।

ঢেকির উপরে মুনি লইল কুশাসন।।'

নারদের বাসস্থান স্বর্গে, তাঁর বাহন ঢেঁকি। তিনি সেই ঢেঁকি সাজানোর জন্য স্বর্গের কোনো বস্তু নয়, মর্ত্যের অতি নগণ্য জিনিস পুকুরের গেড়ি গুগলি, শামুকের খোলা, মুড়া ঝাঁটা (অতিব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া ঝাঁটা) আম্রশাখা ইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবহার করেন। গেড়ি গুগলি, শামুকের খোলা ও মুড়া ঝাঁটা দ্বারা সজ্জিত নয়ন মনোহর ঢেঁকির উপর কুশাসনে নারদ বসে আছেন পাঠক সমাজ মানসপটে এই দৃশ্য কল্পনা করলেই হাসিতে লুটোপুটি খান।

ব্যাধখণ্ডের কাহিনিতে দেখা যায় বিশাল বপু অমিতশক্তির অধিকারী ব্যাধ কালকেতু বাড়িতে মানের পাতা পেতে খেতে বসেছেন। ফুল্লরা তার সেই পাতের উপর সাত হাড়ি আমানি উপুড় করে ঢেলে দিলেন। আমানির জলগুলি আর পাতায় ধরে না, কালকেতু বহুচেষ্টা করে তা আটকানোর চেষ্টা করে চলেছেন তা যখন সম্ভব হলো না তখন মানের পাতার চারদিকে মাটির বাধ বেঁধে দিলেন। এতে মাটি ও আমানির জলে মাখামাখি হয়ে গেল। অথচ কালকেতু এব্যাপারে সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন। গোঁফ দুটোকে পাকিয়ে দুদিকের আগা বেঁধে মাথার উপর দিয়ে পিঠের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হামাগুড়ি পেতে আমানি খাওয়া শুরু করে দিলেন-

'খুদিয়া মানের পত্র আনিল কাটিআ।

পত্রে না রয় আশ্বানি দিলেন ঢালিআ।।

পত্রে না রয় আম্বানি গড়াগড়ি জায়।

ক্রোধ হঞা মহাবীর মৃত্তিকা মিশায়।।

পিঠের পাছে দুই গোপ ফেলিল বান্ধিআ।

আমানি খায় বীর হামকুড়ি দিআ।।'

এখানে লেখক কালকেতুর এই অসঙ্গত চিত্রকে সম্বল করে হাস্যরসের উদ্রেক ঘটিয়েছেন।

দরিদ্র ব্যাধ কালকেতুর প্রতি দেবীর দয়া হলো। তিনি কালকেতুকে সাত মাঠ পরিমাণ ধন দিয়ে গুজরাটের অধিশ্বর করে দেবেন বলে কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরাকে জানালেন। সেই মত দেবী কালকেতুকে একটি ডালিম গাছের নীচে ধনের সন্ধান দিলেন। দেবীর কথা মতো খোনতা দিয়ে কালকেতু সেই ধন উত্তোলন করে ধনের কলসির মধ্যে খাদ্যদ্রব্য আছে ভেবে বিসদৃশ আচরণ শুরু করলেন-

'ঢাকন ঘুচাইয়া বীর দেখিবারে জায়ে।

তিল খাজা বলিয়া বীর খাইবারে চায়ে।।

ধন মাঠ লইয়া বীর ফিরিয়া যাইতে চায়ে।

হস্ত ধরিয়া তাকে ভবানী বুঝায়ে।।'

কালকেতুর এই বিসদৃশ আচরণ পাঠক মনে হাস্যদ্রেক করে।

কালকেতুর প্রার্থনায় চন্ডী কলিঙ্গ রাজ্য ভাঙ্গিয়ে গুজরাট নগরী গড়ে তুলবেন বলে স্থির করেন। সেই কারণে দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তায় প্রবল বন্যায় তিনি কলিঙ্গরাজ্য ভাসিয়ে দেন। দেবী সৃষ্ট এই বন্যার কবল থেকে নিস্তার না পেয়ে দলে দলে কলিঙ্গ প্রজারা গুজরাট নগরীতে এসে ভীড় করেন। কালকেতু তাঁদের সাদরে বরণ করে নেন। কিন্তু কলিঙ্গের শঠ ও প্রতারক প্রজা ভাঁড়ু দত্ত দেবীর বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই করে কলিঙ্গরাজ্যে টিকে থাকতে চান। কিন্তু দেবীও নাছোড়বান্দা। ভাঁড়ু দত্তকে তিনি কলিঙ্গরাজ্য থেকে বের করবেনই বলে প্রতিজ্ঞা করেন। প্রবল বন্যায় কলিঙ্গরাজ্যের চারদিক ডুবে গেলে ভাঁড়ু ফাঁসড় বেধে তার উপরে পিড়ি পেতে বসে থাকেন। আস্তে মধ্যে প্রবেশ করে খিল এঁটে দেন। ভাবেন চারিদিক বন্ধ ঘরে জল প্রবেশ করবে না।

ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করলে ভাঁড়ু তখন ঘরের চালের মাথার উপর (টুঁই) উঠে বসেন। বন্যা চালের মাথা ছুঁয়ে যায়-

'ফাসড় বান্ধিয়া বৈসে পিড়ির উপর।

ধীরে ধীরে বন্যা পিড়ির কাছে আইল।।

নড় দিয়া ভাঁড়ু দত্ত ঘরে প্রবেশিল।

শিব মন্ত্র জপিয়া ভাঁড়ু হুরুকা লাগাইল।।

দুর্গা এন্দুর আনি দেয়াল কাটিল।

হুর কৈরে বন্যা ঘরে প্রবেশিল।।

মাটি ভাঙ্গিয়া বেটা উগার বান্ধিল।

সগোষ্ঠি সহিতে ভাঁড়ু উগারে চড়িল।।

ধীরে ধীরে গেল বন্যা উপারের তরে।

টুঁই ফাড়ি দিয়া বন্যা উঠিলেন চালে ।।

চালে চড়িয়া ভাঁড়ু চারিদিকে চাএ।

ভাঁড়ু বলে আমার বৈরী হৈল মহামায়ে।।'

এখানে চণ্ডী ও ভাঁড়ুর এই সাপলুডোর খেলা আমাদের মনে স্মিত হাস্যের উদ্রেক করে। দেবীর সঙ্গে লড়াইয়ে পরাজিত হবেন জেনেও ভাঁড়ু যে সব কৌশল অবলম্বনে টিকে থাকতে চেয়েছেন, সেই সব কৌশল আমাদের মুগ্ধ করে।

মঙ্গলকাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা একটি গতানুগতিক বিষয়। প্রায় প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের এই অংশে নারীগণ স্বামীর দোষ ত্রুটি তুলে ধরে নিজেদের মন্দ ভাগ্যের জন্য হা-হুতাশ করেছেন। চন্ডীকবি মানিক দত্ত এই গতানুগতিক বিষয়ে খানিকটা হলেও অভিনবত্ব এনে হাস্যরসের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। ধনপতির বিবাহের শোভাযাত্রা ইছানী

নগরের লক্ষপতি সদাগরের বাড়িতে পৌঁছালে খুলনার মা মেনকা জামাই বরণ করে বাড়ির ভেতর নিয়ে যান। সেখানে বিয়ের ঠিক আগে বর দেখতে আসা বয়স্ক এয়োস্ত্রীরা ধনপতির যৌবন প্রমত্ত রূপ দেখে নিজেদের স্বামীদের অযোগ্যতার পরিচয়গুলি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। কোনো এয়োস্ত্রী বলেন তাঁর স্বামী যম কালো- ‘মোর কপালে মিলিয়াছে জক্ষ বুড়াকাল’। কারও স্বামী কাশতে কাশতে ঘরময় কাশে ভর্তি করে দেন—‘কাসুয়া স্বামী মোর শরীর কৈল কাল।‘ কারও স্বামীর পিঠে এত বড় কুঁজ যে চিৎ হয়ে শুতে পারেন না- ‘চিৎ হইয়া শুইতে নারে কুজের কারণে।’ কারও স্বামী কানা, ঠিক মতো দেখতে পান না- ‘কানা স্বামীতে মোর শরীর হৈল কাল।’

অন্যদিকে ধনপতি যেন পূর্ণিমার চাঁদ। তাঁর রূপের প্রেমে মজে গিয়ে তো এক বৃদ্ধা এয়োতি রীতিমত রূপ চর্চা শুরু করে দেন-

‘সকল রাইহ থাকিতে বুড়িক পাইল রসে।

কাচা হরিদ্রা কটু তৈল আপন গায়ে ঘোশে।।’

মানিক দত্ত নারীদের পতিনিন্দা এই গতানুগতিক অংশ বর্ণনায় তেমন উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে না পারলেও হাস্যপরিহাসে ও গ্রাম্যতায় এসব অংশ সার্থক হয়েছে। আজও গৌড়বঙ্গের সমাজে নাতিনী জামাইয়ের সঙ্গে বৃদ্ধা রমণীদের এরপ রহস্যালাপ প্রচলিত আছে।

মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে সিংহলরাজের সঙ্গে শ্রীমন্তের বদলবাণিজ্য প্রসঙ্গ বর্ণনায়ও হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। শ্রীমন্ত বদল বাণিজ্যের প্রথমেই সিংহলরাজকে নারকেল দেখিয়ে বাজিমাত করেন-

‘বসিয়া শ্রীমন্ত সাধু রাজার সভাতে।

মিষ্ট নারিকেল দিল রাজার সাক্ষাতে।।

নারিকল দিঞা সাধু রাজ অগ্রে বলে।

দশ দশ শঙ্খ লব এক নারিকেলে।।’

সিংহলরাজের প্রধান পাত্র জীবনে প্রথম নারকেল দেখেছেন বলে তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এই শক্ত খোলার মত ফল কিরূপে সুমিষ্ট হবে। তিনি রাজাকে নিজ অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে নারকেল ফল গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন-

'বলিছে রাজার পাত্র করি অনুমান।
নারিকেলে বিষ আছে খাল্যে জাবে প্রাণ।।
বিষ নারিকেল খাল্যে রাজা মরিবে।
রাজাকে মারিয়া সাধু রাজ্য পাট লবে।।'

রাজা তাঁর পরম বিজ্ঞ পাত্রের এই কথায় বিশ্বাস করে মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীমন্তকে নিজে নারকেল ফল খাওয়ার জন্য বললেন। রাজার কথায় শ্রীমন্ত নারকেল ফল খেয়ে তার গুণাগুণের পরীক্ষা দিলে রাজা খুশী হয়ে তাঁর সঙ্গে দ্বিগুণ উৎসাহে বাণিজ্যক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

সিংহলে প্রচুর নারকেল গাছ জন্মায় অথচ সেখানকার মানুষ নারকেলের আস্বাদ জানেন না আধুনিক কালের কোনো মানুষই তা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু তৎকালীন গৌড়বঙ্গের সহজসরল গ্রামীণ মানুষের তেমন ভৌগোলিক বোধ না থাকায় সেকথাকে তাঁরা পরম আগ্রহভরে বিশ্বাস করে ফেলতেন। কবি সেই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে পরমবিজ্ঞ সিংহলরাজের মহাপাত্রকে অজ্ঞ বানিয়ে একটা চরম অসংগতির সৃষ্টি করে এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

বস্তুত কবি মানিক দত্ত দেবমাহাত্ম্যসূচক এই চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মধ্যে ঘুরপাক খেয়েও ছোটো খাটো সিচ্যুয়েশন সৃষ্টি করে যেসব হাস্যরসাত্মক মুহূর্তের রচনা করেছেন তা উপেক্ষণীয় নয়। উচ্চমানের কবিত্বশক্তি, দক্ষ চরিত্রচিত্রণ ও শব্দবিন্যাসের কুশলতা দিয়ে পরিমাপ করলে মানিক দত্তের এই সব হাস্যরসাত্মক প্রসঙ্গগুলিতে হয়তো সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতার অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু যুগরুচি ও কাহিনি ঐক্যের নিরিখে যদি এই সব প্রসঙ্গের বিচার করা হয় তাহলে কাব্যরসের বিচারে এই সব হাস্যরসাত্মক প্রসঙ্গগুলিকে গুরুত্বহীন বলে মনে হয় না।

১১.২: মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের ভাষা

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। অ-কারের উচ্চারণের নানা পরিবর্তন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় শব্দের আদিতে অ-কারের উপর অতিরিক্ত শ্বাসাঘাত পড়ায় অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ হতো। অন্ত্য- মধ্য যুগে তা প্রায় লোপ পেয়ে সংবৃত হয়ে পড়েছিল। মানিক দত্তের কাব্যে অ-কারের এই দুই রকম উচ্চারণ (সংবৃত ও বিবৃত) লক্ষ করা যায়।

অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ

ক) রাজা বলে তুমি পবিত্র নর তোকে দুর্গা দিল বর

অন্য কেহ না পূজে দেবতা।

আজি জাইয়া বন্দি থাক ধুলিয়া কাঠরের মাঝ

কাইল তোকে করিব আবস্থা।

খ) নিদারুণ লহনা বাঞ্জি মনে ক্রোধ হা।

আন্নের থাল কাড়ি নৈল গালে চড় দিঞা।।

অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ

কর্ণমুনির সঙ্গে দুর্গা বাহিরে যাই।

অশেষ বিশেষ কথা তাহাকে কহিলা।।

২। অল্পপ্রাণ ধ্বনির অকারণ মহাপ্রাণতার প্রবণতা একটি প্রাচীন লক্ষণ। মানিক দত্তের কাব্যে এই মহাপ্রাণিত উচ্চারণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

ক) কোমরে কিংকিনি পড়ে পায়েতে নফুর। [নপুর > নফুর (প > ফ)]

খ) শিবের ধরিয়া পায়ে কান্দে মুনি উভরায়ে ।

প্রভু মর্থবাসে নাই জাব আমি। [ম > মর্থ (ত > থ)]

গ) দেহরা পূজিতে সভে হইল একমন। [সবে > সভে (ব > ভ)].

৩। হ'-শ্রুতির ব্যবহার ভাষার প্রাচীনত্বের লক্ষণ। মানিক দত্তের কাব্যভাষায় 'হ'-শ্রুতির প্রাচুর্য তাঁর ভাষার প্রাচীনতার দ্যোতক। যথা-

দোশাউদ আনিয়া পিতার কাটহ বন্ধন।

বিবাহ করিব আমি বলিলাম বচন।।

৪। সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে এই ধ্বনির বেশি আগমন ঘটেছে। এবং উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদে তার প্রয়োগ ঘটেছে।

৫। পরপর দু'টি স্বরধ্বনি অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি যেখানে রক্ষিত হয়েছে, সেখানে স্বরধ্বনি দুটি যুক্ত হয়ে অনেকক্ষেত্রেই দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরে পরিণত হয়েছে। যথা-

ক) মন্ত্রের প্রতাপে হৈল কমলের ফুল। [হ + অ + ই + ল (হইল) = হ + ঐ + ল (হৈল)].

খ) দেহা হৈতে হাড় মাংস খসিঞা পড়িল। [হ + অ + ই + ত + এ (হইতে) = হ + ঐ + ত + এ (হৈতে)]

৬। অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' ধ্বনি নির্দিষ্ট স্থানের পূর্বে উচ্চারিত হয় সেটির লোপ বা সন্ধি বোঝাবার জন্য য-ফলার উপর জোর পড়তো। যেমন : 'সকল দ্রব্য বস্যা খাবা। পথের উপর। বসিয়া > বইস্যা > বস্যা। (ই' ধ্বনি লুপ্ত হয়ে য-ফলার উপর জোর পড়েছে।)

৭। উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের জন্য বানান বিকৃতি প্রাচীন ও আদি-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য। মানিক দত্তেও এই বিকৃতি লক্ষ করা যায়। যথা- জেমন পাগল শিব সেই রূপ দান। ('য'-এর উচ্চারণ 'জ' হওয়ায় কবি বানানে 'জ' লিখেছেন।) 'য়নাথিনী করিলেক ফুলুরা অভাগিনে।' (অ-এর উচ্চারণ 'য়' হওয়ায় কবি বানানে 'য়' লিখেছেন।)

৮। মানিক দত্তের কাব্যভাষায় য়-শ্রুতির ব্যবহার ছিল। ‘রণের নিয়রে সেনা দেখিবারে পায়।’ যেমন- নিকটে > নিয়রে।

৯। মানিক দত্তের কাব্যভাষায় অন্ত্যস্বরলোপের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা- ‘ধবল মেঘেত জেন বিষ্ট দেখা দিল।’ কথাটি এভাবে- বৃষ্টি > বিষ্টি > বিষ্ট। (শব্দের। শেষের ‘ই’কার অবলুপ্ত।)

১০। মধ্য স্বরলোপেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্য এরকমটি ঘটেছে। যেমন- ‘শভেদ পতকা গগনে উড়ে বানা।’ পতাকা > পতকা। (প + অ + ত্ + আ + ক + আ > প + অ + ত + ক + আ (মধ্যস্বর ‘আ’ লুপ্ত।) ।

১১। মধ্যস্বরাগমেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা – ‘জার সঙ্গে নড়িল ষাইট হাজার ধনুকি’।। ষাট > ষাইট। (ষ + আ + ট > ষ + আ + ই + ট)। (‘ই’ স্বরধ্বনির শব্দের মধ্যে আগম ঘটেছে।)

১২। অন্ত্যস্বরাগমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন- ‘আপনার গৃহে চলে কেতু আহিড়ি।’ এখানে শব্দটির উৎপন্নক্রম হল— আহিড় > আহিড়ি। (শব্দের অন্তে ‘ই’কার স্বরধ্বনির আগম ঘটেছে।)

১৩। স্বরভক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। স্বরভক্তি বলতে স্বর দিয়ে ভাগ ভক্তিকে বোঝায়। যুক্তব্যঞ্জনের কষ্টলাঘব করার জন্য বা তার উচ্চারণের কর্কশতা কমিয়ে তাকে মধুর করার জন্য যুক্তব্যঞ্জনের মাঝখানে স্বরধ্বনি এনে যোগ করার পদ্ধতিকে স্বরভক্তি বলে। যেমন— কাটিয়া অসুরগণ রাখিলা খিয়াতি। শব্দটির উৎপন্নক্রম হল— খ্যাতি > খিয়াতি। (এখানে ‘এ’ স্বরধ্বনি যুক্তস্বরকে ভেঙে দিয়েছে।)

১৪। মানিক দত্তের কাব্যে ‘ঔ' এই যৌগিক স্বরের উচ্চারণ ‘অউ' রূপে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রের বিধান মতে শুধ্বিতা হইল।

গৌউরি বুলি কন্যার নাম থুইল।।

এখানে, গৌরি > গৌউরি। (ঔ > অউ রূপে উচ্চারিত।)

১৫। ‘ল’ এর উচ্চারণ ‘ণ’ এর মতো হয়েছে।

ক. রণ ছাড়ি নারদ মুনি উঠিয়া দিল নড়।।

খ. সুরথের জুগত্য নুটিবে ঘর গারি।।

১৯। অপিনিহিতির ফলে যে ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনি নির্দিষ্ট পূর্বে উচ্চারিত হয়, সেটির লোপ বা সন্ধি বোঝাবার জন্য মানিক দত্ত ঘুচাত্য, লাগাল্য, খাল্য এরকম বানান লিখেছেন।

ক) কন্যা পাঞ্রা মেনকা নানা বুদ্ধি বাটে।

আটকুর দাও ঘুচাত্যে দল বান্ধে পেটে।

এখানে ঘুচাইতে > ঘুচাত্যে।।

খ) মহাসুখে দেবগণ ভোজন করিল।

ঝগড়া লাগাল্য নারদ রাত্রি ভোর হৈল।

এখানে লাগাইল্য > লাগাল্য।

২০। অঘোষ বর্ণের ঘোষবৎ উচ্চারণ হয়।

কাগতি মিনতি করিল বিস্তর।

একরাত্রি দেহ মোকে গৌরির বাসহর।।

এখানে- কাকুতি > কাকতি > কাগতি (ক > গ)।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। বহুবচনে দিগ, দের প্রত্যয়ের ব্যবহার মানিক দত্তের কাব্যে নেই। মানিক দত্ত যে সব পদ্ধতির সাহায্যে বহুবচনসূচক পদ গঠন করেন তা হল—

ক) সংখ্যাবাচক শব্দ যোগ করে—

তোমার খুলনা হৈল সপ্ত বৎসরে।

এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে।।

'সপ্ত' সংখ্যাবাচক শব্দ।।

খ) বহুত্ববোধক শব্দ ব্যবহার করে

থালে হৈতে চালু গুলি পুরিয়া পতিশূলী

দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি কোলে।।

'গুলি' বহুত্ববোধক পদ।।

গ) বহুত্ববোধক পদ যোগ করে—

ধরিল সকল জ্ঞাতি খুল্লনার চরণ।

ভোজন করিঞা সভে কৈল আচমন।

ধন্য বলিছেন জত জ্ঞাতিগণ।।

সকল, সভে, জত এগুলি বহুত্ববোধক পদ।

২। অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি কখনো বা সপ্তমী বিভক্তির সঙ্গে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার ছিল।

ক) সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার-

রাজার সভাতে আইল সাধু ধনপতি।

দোলাতে নাম্ভিয়া সাধু করিল প্রণতি।

খ) সপ্তমী বিভক্তি + 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার-

থালে হৈতে চালুগুলি পুরিয়া পতিশূলী

দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি দোলে।।

৩। 'উয়া' প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল।

জথা সর্ব মাছুয়া মৎসের দোকান দেএ।

আঠ পোন চিতল মৎস মূল্য হৈয়া জাএ।।

মাছুয়া = মাছ + উয়া।

৪। 'রু' এই দেশি প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল।

কথা শুনি ক্রোধে রাজা ডুবারুকে বলে।

কমল তদাস কর ডুব দিঞা জলে।।

ডুব + রু = ডুবারু।

৫। 'ইল' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ ছিল।

পাকিল মাথার কেশ তার হইল।।

কপালের মাংসে তার দুই চক্ষু ঢাকিল।।।

পাক + ইল = 'পাকিল' এখানে ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত।

৬। সমাপিকা ক্রিয়ার অনুসর্গরূপে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল।।

ক) দেবী বলে পদ্মাবাছা হের দেখসিয়া।

ভক্ত জনে লইয়া জায়ে আমাকে বান্ধিয়া।।

খ) শুনহ ব্রাহ্মণ তুমি শুন মোর কথা।

শালবান রাজাকে গিঞা কহগা বারতা।।

৭। যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কালের ব্যবহার ছিল।

যৌগিক ক্রিয়া

ক) দুর্গা বোলে কিবা তপ কর ইন্দ্র অধিকারি।

কামে পীড়িত হায়াছে শচী নারী।।

খ) দেহরা নির্মাইতে বাছা তুমি হবে সাথী।

এখানে ‘হঞাায়াছে’ ও ‘নিম্মহিতে’ ক্রিয়াপদ একাধিক ধাতুতে গঠিত অথচ একটি মাত্র কাজের অর্থ প্রকাশ করেছে।

যৌগিক কাল

নদীর কুলের ভাঙ্গ করে সড় সড়।।

পড়িতে আছে ভাঙ্গের বাড়ি ভাঙ্গের উপর।।

এখানে ‘পড়িতে আছে’ ক্রিয়াপদটিতে একাধিক কালের ক্রিয়াপদ থাকলেও একটি মাত্র কালের অর্থ প্রকাশ করেছে।

শব্দভাণ্ডার

মানিক দত্ত তাঁর ‘চণ্ডীমঙ্গল’-কাব্যে তৎসম, তদ্ভব ও দেশি শব্দ, বিশেষার্থক শব্দ, দ্বৈতশব্দ, জোড়কলম শব্দ, বহু অপ্রচলিত ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে কাব্যের শব্দভাণ্ডার পুষ্ট করে তুলেছেন। বিশেষ করে তাঁর ব্যবহৃত বিশেষার্থক শব্দ দ্বৈতশব্দ, জোড়কলম শব্দ, অপ্রচলিত ও আঞ্চলিক শব্দগুলির ব্যবহার বাংলা ভাষাতত্ত্বের শব্দভাণ্ডারকে সবিশেষ সমৃদ্ধ করেছে।

ক) বিশেষার্থক শব্দ:

লেখাজোখা: মন্দার পালাশ কথক সৃজিলেন চই।

কতজাতি বৃক্ষ সৃজিলেন লেখাজোখা নাই।।

উঙচুঙা: ঘরে আসি রানি দন ঘুচাইল।।

উঙাচুঙা করি কন্যা কান্দিতে লাগিল।।

চর্মচক্ষে: চর্মচক্ষে কালকেতু চিনিতে না পারে।।

পশু পায়া বন্দি করে দোষ নাহি তারে।।

খ) দ্বৈতশব্দ বা শব্দদ্বৈত:

'দ্বিরুক্ত' বা 'দ্বিত্ব' শব্দের নাম শব্দদ্বৈত। কোনো ভাব বা বিষয় বোঝানোর জন্য জোড়া শব্দের ব্যবহারকে শব্দদ্বৈত বলে। শব্দদ্বৈতে' শব্দযুগলের দুটো শব্দ আলাদা হয় কিন্তু এক অর্থ প্রকাশ করে। 'দ্বৈতশব্দ' সাধারণত চার প্রকার: অনুকার, অনুগামী, সমার্থক, বিপরীতার্থক শব্দ। তবে মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে 'অনুগামী' ও 'সমার্থক অনুগামী' এই দুই প্রকার শব্দের ব্যবহার করেছেন।

গ) অনুগামী শব্দ:

'অনুগামী শব্দ' বলতে বোঝায় এমন একটি শব্দযুগল যার দ্বিতীয়াংশে যে শব্দটি পাওয়া যায় সেই শব্দটি অর্থের এবং ধ্বনির দিক থেকে প্রথমটির অনুগামী অর্থাৎ দুটি শব্দের উচ্চারণ এবং অর্থ বেশ কাছাকাছি।

ঢুসাটুসি: নৌকা ধরি হনুমান করে ঢুসাটুসি।।

কৌতুকে দেখেন দুর্গা সিংহরথে বসি।।

চুলাচুলি: শাশুড়ী বোহুএ লাগিল চুলাচুলি।

দুই বেহাইএ লাগিল কীলাকীলি।।

ঘ) জোড়কলম শব্দ:

একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষ যোগ করে নতুন শব্দ তৈরিকে জোড়কলম শব্দ বলে।

ক) উনমত্ত দেখো তোর বদন কমল

বিকশিত দেখো পয়োভার।

মুক্তা জিনিয়া দেখো দশনের যুতি

চামর জিনিয়া কেশভার।।

এখানে পয়োভার শব্দে পয়োধর-এর পয়ো-এর সঙ্গে ভার শব্দ যুক্ত হয়ে হয়েছে পয়োভার।

খ) আমি রড় গ্রহণ্য কোরিলাম ভ্রমণ।

তোবুত পশুর সঙ্গে না হেল দরশন।।

এখানে গহন + অরণ্য = গ্রহণ্য

ঙ) আঞ্চলিক শব্দ:

১। আবস্তা (দুরবস্থা)-

সভার মধ্যে কুন বেটা কহে মিথ্যা কথা।

তে কারণে হৈল আমার এতেক আবস্তা।।

২। আইসানি (মাছ-এর হাতধোওয়া জল)-

আইসানি চাউলানি চিলের ভাষার খড়ি

আর খুলুনার চুলের তেলে।

চাপা কলাত করি জামাইকে খাওয়াইলে

ভালবাসিবে চিরতকালে।

৩। অখন (এখন)-

তৃণ জল খাঞা প্রভু আনন্দিত মন।

অখন করিবেন প্রভু ভাঙ্গের জনম।।

৪। উচলপিড়া (চওড়া বসার উপযোগী উঁচু পিড়ি)-

অলঙ্কার গড়ে বানিঞা সাধুর কুমার।

উচল পিড়াতে বসিল কারিগর।।

৫। উচ্ছগে (উৎসর্গ করা)-

শত পারা পাঠা শীঘ্র কর্যা আনে।

মন্ত্র পড়িঞ্া তাহা উচ্ছগে ব্রাহ্মণে।।

৬। উড়িতে (গায়ে দিতে)- পড়িতে মেখলা দিহ উড়িতে খসলা

৭। উল্লুল্ব (উলুধবনি)-

দুববাধান চন্দন দিলেন নৌকার গায়ে।

উল্লন্ধু মঙ্গল দিঞা নোকাকে পুজয়ে।।

৮। এন্দুর (ইন্দুর, ইঁদুর)-

দূর্গা এন্দুর আনি দেয়াল কাটিল।

হুর কৈরে বন্যা ঘরে প্রবেশিল।।

৯। কাইত (পার্শ্ব)- মাঝিয়াত ফেলাইয়া থুইলে থাকে কাইত হইয়া।

১০। কাসুয়া (কাস+ উয়া, যে ব্যক্তি সর্বদাই কাশতে থাকেন)- কসুয়া স্বামী মোর শরীর হৈল কাল।

মানিক দত্ত তাঁর 'চন্ডীমঙ্গল'-কাব্যে আঞ্চলিক ও প্রাচীন শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন শব্দ তৈরি করেছেন- ছাকি (ছাগল শিশু), টিটুল (ঠক বা প্রতারক), ঠিকিলা (ছোটোখাট চর এলাকা), বুদ্ধিমন্ত্রী (যিনি বুদ্ধি দান করেন), দলিচা (গলিচা), দো সাধু (ভন্ড সাধু - দ্বিচারী সাধু) যা তাঁর কাব্যের শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া কিছু চলতি প্রবাদ-

ক) আপনার মাংস জগত হৈল বৈরি।

খ) বামন হঞা পাঞা ছিলে আকাশের চান্দ।

গ) হস্তে পাইলে চন্দ্র ছাড়ে কুন জন।

ও প্রবাদপ্রতিম বাক্যাংশের- আগে বিড়ম্বনা করি পাছে কর দয়া, নিজ কাব্যের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন যা কাব্যভাষার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি চণ্ডীমঙ্গল-ধারার প্রথম কবি মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীকাব্যে ভাব প্রকাশের অনুগামী যে কাব্যভাষা তৈরি করেছেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তা অনুপেক্ষনীয় প্রশংসার দাবি রাখে।

১১.৩: মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের ছন্দ

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। অ-কারের উচ্চারণের নানা পরিবর্তন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। আদি-মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় শব্দের আদিতে অ-কারের উপর অতিরিক্ত শ্বাসাঘাত পড়ায় অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ হতো। অন্ত্য- মধ্য যুগে তা প্রায় লোপ পেয়ে সংবৃত হয়ে পড়েছিল। মানিক দত্তের কাব্যে অ-কারের এই দুই রকম উচ্চারণ (সংবৃত ও বিবৃত) লক্ষ করা যায়।

অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ

ক) রাজা বলে তুমি পবিত্র নর তোকে দুর্গা দিল বর

অন্য কেহ না পূজে দেবতা।

আজি জাইয়া বন্দি থাক ধুলিয়া কাঠরের মাঝ

কাইল তোকে করিব আবস্থা।

খ) নিদারুণ লহনা বাঞ্জি মনে ক্রোধ হা।

আন্নের থাল কাড়ি নৈল গালে চড় দিঞা।।

অ-কারের সংবৃত উচ্চারণ

কর্ণমুনির সঙ্গে দুর্গা বাহিরে যাই।

অশেষ বিশেষ কথা তাহাকে কহিলা।।

২। অল্পপ্রাণ ধ্বনির অকারণ মহাপ্রাণতার প্রবণতা একটি প্রাচীন লক্ষণ। মানিক দত্তের কাব্যে এই মহাপ্রাণিত উচ্চারণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যথা—

ক) কোমরে কিংকিনি পড়ে পায়েতে নফুর। [নপুর > নফুর (প > ফ)]

খ) শিবের ধরিয়া পায়ে কান্দে মুনি উভরায়ে ।

প্রভু মর্থবাসে নাই জাব আমি। [ম > মর্থ (ত > থ)]

গ) দেহরা পূজিতে সভে হইল একমন। [সবে > সভে (ব > ভ)].

৩। হ’-শ্রুতির ব্যবহার ভাষার প্রাচীনত্বের লক্ষণ। মানিক দত্তের কাব্যভাষায় ‘হ’-শ্রুতির প্রাচুর্য তাঁর ভাষার প্রাচীনতার দ্যোতক। যথা-

দোশাউদ আনিয়া পিতার কাটহ বন্ধন।

বিবাহ করিব আমি বলিলাম বচন।।

৪। সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে এই ধ্বনির বেশি আগমন ঘটেছে। এবং উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদে তার প্রয়োগ ঘটেছে।

৫। পরপর দু'টি স্বরধ্বনি অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট স্বরধ্বনি যেখানে রক্ষিত হয়েছে, সেখানে স্বরধ্বনি দুটি যুক্ত হয়ে অনেকক্ষেত্রেই দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরে পরিণত হয়েছে। যথা-

ক) মন্ত্রের প্রতাপে হৈল কমলের ফুল। [হ + অ + ই + ল (হইল) = হ + ঐ + ল (হৈল)].

খ) দেহা হৈতে হাড় মাংস খসিঞা পড়িল। [হ + অ + ই + ত + এ (হইতে) = হ + ঐ + ত + এ (হৈতে)]

৬। অপিনিহিতির ফলে যে ‘ই’ ধ্বনি নির্দিষ্ট স্থানের পূর্বে উচ্চারিত হয় সেটির লোপ বা সন্ধি বোঝাবার জন্য য-ফলার উপর জোর পড়তো। যেমন : ‘সকল দ্রব্য বস্যা খাবাে।

পথের উপর। বসিয়া > বইস্যা > বস্যা। (ই' ধ্বনি লুপ্ত হয়ে য-ফলার উপর জোর পড়েছে।)

৭। উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের জন্য বানান বিকৃতি প্রাচীন ও আদি-মধ্য বাংলার বৈশিষ্ট্য। মানিক দত্তেও এই বিকৃতি লক্ষ করা যায়। যথা- জেমন পাগল শিব সেই রূপ দান। ('য'-এর উচ্চারণ 'জ' হওয়ায় কবি বানানে 'জ' লিখেছেন।) 'য়নাথিনী করিলেক ফুলুরা অভাগিনে।' (অ-এর উচ্চারণ 'য়' হওয়ায় কবি বানানে 'য়' লিখেছেন।)

৮। মানিক দত্তের কাব্যভাষায় য়-শ্রুতির ব্যবহার ছিল। 'রণের নিয়রে সেনা দেখিবারে পায়।' যেমন- নিকটে > নিয়রে।

৯। মানিক দত্তের কাব্যভাষায় অন্ত্যস্বরলোপের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। যথা- 'ধবল মেঘেত জেন বিষ্ট দেখা দিল।' কথাটি এভাবে- বৃষ্টি > বিষ্টি > বিষ্ট। (শব্দের। শেষের 'ই'কার অবলুপ্ত।)

১০। মধ্য স্বরলোপেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের জন্য এরকমটি ঘটেছে। যেমন- 'শভেদ পতকা গগনে উড়ে বানা।' পতাকা > পতকা। (প + অ + ত্ + আ + ক + আ > প + অ + ত + ক + আ (মধ্যস্বর 'আ' লুপ্ত।) ।

১১। মধ্যস্বরাগমেরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা – 'জার সঙ্গে নড়িল ষাইট হাজার ধনুকি'|| ষাট > ষাইট। (ষ + আ + ট > ষ + আ + ই + ট)। ('ই' স্বরধ্বনির শব্দের মধ্যে আগম ঘটেছে।)

১২। অন্ত্যস্বরাগমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন- 'আপনার গৃহে চলে কেতু আহিড়ি।' এখানে শব্দটির উৎপন্নক্রম হল— আহিড় > আহিড়ি। (শব্দের অন্তে 'ই'কার স্বরধ্বনির আগম ঘটেছে।)

১৩। স্বরভক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছিল। স্বরভক্তি বলতে স্বর দিয়ে ভাগ ভক্তিকে বোঝায়। যুক্তব্যঞ্জনের কষ্টলাঘব করার জন্য বা তার উচ্চারণের কর্কশতা কমিয়ে তাকে মধুর করার জন্য যুক্তব্যঞ্জনের মাঝখানে স্বরধ্বনি এনে যোগ করার পদ্ধতিকে স্বরভক্তি বলে।

যেমন— কাটিয়া অসুরগণ রাখিলা খিয়াতি। শব্দটির উৎপন্নক্রম হল— খ্যাতি > খিয়াতি।

(এখানে ‘এ’ স্বরধ্বনি যুক্তস্বরকে ভেঙে দিয়েছে।)

১৪। মানিক দত্তের কাব্যে ‘ঔ' এই যৌগিক স্বরের উচ্চারণ ‘অউ' রূপে পাওয়া যায়।

শাস্ত্রের বিধান মতে শুধ্বিতা হইল।

গৌউরি বুলি কন্যার নাম থুইল।।

এখানে, গৌরি > গৌউরি। (ঔ > অউ রূপে উচ্চারিত।)

১৫। ‘ল’ এর উচ্চারণ ‘ণ’ এর মতো হয়েছে।

ক. রণ ছাড়ি নারদ মুনি উঠিয়া দিল নড়।।

খ. সুরথের জুগত্য নুটিবে ঘর গারি।।

১৯। অপিনিহিতির ফলে যে ‘ই’ বা ‘উ’ ধ্বনি নির্দিষ্ট পূর্বে উচ্চারিত হয়, সেটির লোপ বা সন্ধি বোঝাবার জন্য মানিক দত্ত ঘুচাত্য, লাগাল্য, খাল্য এরকম বানান লিখেছেন।

ক) কন্যা পাঞা মেনকা নানা বুদ্ধি বাটে।

আটকুর দাও ঘুচাত্যে দল বান্ধে পেটে।

এখানে ঘুচাইতে > ঘুচাত্যে।।

খ) মহাসুখে দেবগণ ভোজন করিল।

ঝগড়া লাগাল্য নারদ রাত্রি ভোর হৈল।

এখানে লাগাইল্য > লাগাল্য।

২০। অঘোষ বর্ণের ঘোষবৎ উচ্চারণ হয়।

কাগতি মিনতি করিল বিস্তর।

একরাত্রি দেহ মোকে গৌরির বাসহর।।

এখানে- কাকুতি > কাকতি > কাগতি (ক > গ)।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১। বহুবচনে দিগ, দের প্রত্যয়ের ব্যবহার মানিক দত্তের কাব্যে নেই। মানিক দত্ত যে সব পদ্ধতির সাহায্যে বহুবচনসূচক পদ গঠন করেন তা হল—

ক) সংখ্যাবাচক শব্দ যোগ করে—

তোমার খুলনা হৈল সপ্ত বৎসরে।

এহি সময় বিবাহ দেহ ধনপতির তরে।।

'সপ্ত' সংখ্যাবাচক শব্দ।।

খ) বহুত্ববোধক শব্দ ব্যবহার করে

থালে হৈতে চালু গুলি পুরিয়া পতিশূলী

দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি কোলে।।

'গুলি' বহুত্ববোধক পদ।।

গ) বহুত্ববোধক পদ যোগ করে—

ধরিল সকল জ্ঞাতি খুল্লনার চরণ।

ভোজন করিঞা সভে কৈল আচমন।

ধন্য বলিছেন জত জ্ঞাতিগণ।।

সকল, সভে, জত এগুলি বহুত্ববোধক পদ।

২। অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তি কখনো বা সপ্তমী বিভক্তির সঙ্গে 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার ছিল।

ক) সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার-

রাজার সভাতে আইল সাধু ধনপতি।

দোলাতে নাম্ভিয়া সাধু করিল প্রণতি।

খ) সপ্তমী বিভক্তি + 'হৈতে' অনুসর্গের ব্যবহার-

থালে হৈতে চালুগুলি পুরিয়া পতিশূলী

দ্বাদশ লম্বিত ঝুলি দোলে।।

৩। 'উয়া' প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল।

জথা সর্ব মাছুয়া মৎসের দোকান দেএ।

আঠ পোন চিতল মৎস মূল্য হৈয়া জাএ।।

মাছুয়া = মাছ + উয়া।

৪। 'রু' এই দেশি প্রত্যয়ের ব্যবহার ছিল।

কথা শুনি ক্রোধে রাজা ডুবারুকে বলে।

কমল তদাস কর ডুব দিএ্যা জলে।।

ডুব + রু = ডুবারু।

৫। 'ইল' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিশেষণ রূপে প্রয়োগ ছিল।

পাকিল মাথার কেশ তার হইল।।

কপালের মাংসে তার দুই চক্ষু ঢাকিল।।।

পাক + ইল = 'পাকিল' এখানে ক্রিয়াবিশেষণ রূপে ব্যবহৃত।

৬। সমাপিকা ক্রিয়ার অনুসর্গরূপে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ছিল।।

ক) দেবী বলে পদ্মাবাছা হের দেখসিয়া।

ভক্ত জনে লইয়া জায়ে আমাকে বান্ধিয়া।।

খ) শুনহ ব্রাহ্মণ তুমি শুন মোর কথা।

শালবান রাজাকে গিঞা কহগা বারতা।।

৭। যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কালের ব্যবহার ছিল।

যৌগিক ক্রিয়া

ক) দুর্গা বোলে কিবা তপ কর ইন্দ্র অধিকারি।

কামে পীড়িত হায়াছে শচী নারী।।

খ) দেহরা নির্মাইতে বাছা তুমি হবে সাথী।

এখানে 'হঞায়াছে' ও 'নিম্মহিতে' ক্রিয়াপদ একাধিক ধাতুতে গঠিত অথচ একটি মাত্র কাজের অর্থ প্রকাশ করেছে।

যৌগিক কাল

নদীর কুলের ভাঙ্গ করে সড় সড়।।

পড়িতে আছে ভাঙ্গের বাড়ি ভাঙ্গের উপর।।

এখানে 'পড়িতে আছে' ক্রিয়াপদটিতে একাধিক কালের ক্রিয়াপদ থাকলেও একটি মাত্র কালের অর্থ প্রকাশ করেছে।

শব্দভাণ্ডার

মানিক দত্ত তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে তৎসম, তদ্ভব ও দেশি শব্দ, বিশেষার্থক শব্দ, দ্বৈতশব্দ, জোড়কলম শব্দ, বহু অপ্রচলিত ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে কাব্যের শব্দভাণ্ডার পুষ্ট করে তুলেছেন। বিশেষ করে তাঁর ব্যবহৃত বিশেষার্থক শব্দ দ্বৈতশব্দ, জোড়কলম শব্দ, অপ্রচলিত ও আঞ্চলিক শব্দগুলির ব্যবহার বাংলা ভাষাতত্ত্বের শব্দভাণ্ডারকে সবিশেষ সমৃদ্ধ করেছে।

ক) বিশেষার্থক শব্দ:

লেখাজোখা: মন্দার পালাশ কথক সৃজিলেন চই।

কতজাতি বৃক্ষ সৃজিলেন লেখাজোখা নাই।।

উঙচুঙা: ঘরে আসি রানি দন ঘুচাইল।।

উঙাচুঙা করি কন্যা কান্দিতে লাগিল।।

চর্মচক্ষে: চর্মচক্ষে কালকেতু চিনিতে না পারে।।

পশু পায়া বন্দি করে দোষ নাহি তারে।।

খ) দ্বৈতশব্দ বা শব্দদ্বৈত:

‘দ্বিরুক্ত’ বা ‘দ্বিত্ব’ শব্দের নাম শব্দদ্বৈত। কোনাে ভাব বা বিষয় বোঝানোর জন্য জোড়া শব্দের ব্যবহারকে শব্দদ্বৈত বলে। শব্দদ্বৈতে' শব্দযুগলের দুটো শব্দ আলাদা হয় কিন্তু এক অর্থ প্রকাশ করে। ‘দ্বৈতশব্দ’ সাধারণত চার প্রকার: অনুকার, অনুগামী, সমার্থক, বিপরীতার্থক শব্দ। তবে মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে ‘অনুগামী’ ও ‘সমার্থক অনুগামী’ এই দুই প্রকার শব্দের ব্যবহার করেছেন।

গ) অনুগামী শব্দ:

‘অনুগামী শব্দ’ বলতে বোঝায় এমন একটি শব্দযুগল যার দ্বিতীয়াংশে যে শব্দটি পাওয়া যায় সেই শব্দটি অর্থের এবং ধ্বনির দিক থেকে প্রথমটির অনুগামী অর্থাৎ দুটি শব্দের উচ্চারণ এবং অর্থ বেশ কাছাকাছি।

ঢুসাটুসি: নৌকা ধরি হনুমান করে ঢুসাটুসি।।

কৌতুকে দেখেন দুর্গা সিংহরথে বসি।।

চুলাচুলি: শাশুড়ী বোহুএ লাগিল চুলাচুলি।

দুই বেহাইএ লাগিল কীলাকীলি।।

ঘ) জোড়কলম শব্দ:

একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষ যোগ করে নতুন শব্দ তৈরিকে জোড়কলম শব্দ বলে।

ক) উনমত্ত দেখো তোর বদন কমল

বিকশিত দেখো পয়োভার।

মুক্তা জিনিয়া দেখো দশনের যুতি

চামর জিনিয়া কেশভার।।

এখানে পয়োভার শব্দে পয়োধর-এর পয়ো-এর সঙ্গে ভার শব্দ যুক্ত হয়ে হয়েছে পয়োভার।

খ) আমি রড় গ্রহণ্য কোরিলাম ভ্রমণ।

তোবুত পশুর সঙ্গে না হেল দরশন।।

এখানে গহন + অরণ্য = গ্রহণ্য

ঙ) আঞ্চলিক শব্দ:

১। আবস্তা (দুরবস্থা)-

সভার মধ্যে কুন বেটা কহে মিথ্যা কথা।

তে কারণে হৈল আমার এতেক আবস্তা।।

২। আইসানি (মাছ-এর হাতধোওয়া জল)-

আইসানি চাউলানি চিলের ভাষার খড়ি

আর খুলুনার চুলের তেলে।

চাপা কলাত করি জামাইকে খাওয়াইলে

ভালবাসিবে চিরতকালে।

৩। অখন (এখন)-

তৃণ জল খাঞা প্রভু আনন্দিত মন।

অখন করিবেন প্রভু ভাঙ্গের জনম।।

৪। উচলপিড়া (চওড়া বসার উপযোগী উঁচু পিড়ি)-

অলঙ্কার গড়ে বানিঞা সাধুর কুমার।

উচল পিড়াতে বসিল কারিগর।।

৫। উচ্ছগে (উৎসর্গ করা)-

শত পারা পাঠা শীঘ্র কর্যা আনে।

মন্ত্র পড়িঞা তাহা উচ্ছগে ব্রাহ্মণে।।

৬। উড়িতে (গায়ে দিতে)- পড়িতে মেখলা দিহ উড়িতে খসলা

৭। উল্লুল্ব (উলুধবনি)-

দুববাধান চন্দন দিলেন নৌকার গায়ে।

উল্লন্ধু মঙ্গল দিঞা নোকাকে পুজয়ে।।

৮। এন্দুর (ইন্দুর, ইঁদুর)-

দূর্গা এন্দুর আনি দেয়াল কাটিল।

হুর কৈরে বন্যা ঘরে প্রবেশিল।।

৯। কাইত (পার্শ্ব)- মাঝিয়াত ফেলাইয়া থুইলে থাকে কাইত হইয়া।

১০। কাসুয়া (কাস+ উয়া, যে ব্যক্তি সর্বদাই কাশতে থাকেন)- কসুয়া স্বামী মোর শরীর হৈল কাল।

মানিক দত্ত তাঁর ‘চন্ডীমঙ্গল’-কাব্যে আঞ্চলিক ও প্রাচীন শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন শব্দ তৈরি করেছেন__ ছাকি (ছাগল শিশু), টিটুল (ঠক বা প্রতারক), ঠিঁকিলা (ছোটোখাট চর এলাকা), বুদ্ধিমন্ত্রী (যিনি বুদ্ধি দান করেন), দলিচা (গলিচা), দো সাধু (ভন্ড সাধু - দ্বিচারী সাধু) যা তাঁর কাব্যের শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এছাড়া কিছু চলতি প্রবাদ-

ক) আপনার মাংস জগত হৈল বৈরি।

খ) বামন হঞা পাঞা ছিলে আকাশের চান্দ।

গ) হস্তে পাইলে চন্দ্র ছাড়ে কুন জন।

ও প্রবাদপ্রতিম বাক্যাংশের- আগে বিড়ম্বনা করি পাছে কর দয়া, নিজ কাব্যের উপযোগী করে প্রকাশ করেছেন যা কাব্যভাষার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি চন্ডীমঙ্গল-ধারার প্রথম কবি মানিক দত্ত তাঁর চন্ডীকাব্যে ভাব প্রকাশের অনুগামী যে কাব্যভাষা তৈরি করেছেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তা অনুপেক্ষনীয় প্রশংসার দাবি রাখে।

১১.৪: মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গলের অলংকার

সংস্কৃত ‘অলম’ শব্দ থেকে এসেছে অলংকার। ‘অলংকার’ কথাটির অর্থ ভূষণ। যা দিয়ে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয় তাই অলংকার। ‘অগ্নিপুরাণে’ বলা হয়েছে, অর্থালংকার ছাড়া কাব্য-সরস্বতীকে বিধবার মতো শ্রীহীন বলে মনে হয়। আচার্য দণ্ডী বলেছেন, কাব্যকে সুন্দর করে তোলা অলংকারের ধর্ম। অলংকার দুই প্রকার- শব্দালংকার ও অর্থালংকার। মানিক দত্ত তাঁর কাব্যে অল্পবিস্তর দু-রকম অলংকারই ব্যবহার করেছেন।

শব্দালংকার

আলংকারিকেরা মূলত শব্দালংকারকে মূলত পাঁচভাগে ভাগ করেছেন অনুপ্রাস,যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ও পুনরুক্তবদাভাস। ‘চণ্ডীমঙ্গল’-কাব্যে শব্দালংকারের এই পাঁচটি ভাগের মধ্যে অনুপ্রাস, শ্লেষ, ও বক্রোক্তি— এই তিন ধরনের অলংকারের ব্যবহার দেখা যায়।

অনুপ্রাস:

একটি বর্ণ বা একগুচ্ছ বর্ণ বারবার ব্যবহৃত হয়ে যে ধ্বনিময়তা বা শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করে তাকে অনুপ্রাস বলে। ধনপতি বাণিজ্য যাত্রার জন্য ডিঙা সাজিয়ে নিজে তৈরি হচ্ছেন, কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহার করে-

সাধু সাজিতে সাজে নানা শব্দে বাদ্য বাজে

নগরিয়া সাজে লাখে লাখ।।

এখানে ‘খ’ এবং ‘জ’ ধ্বনির সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করে কানে শ্রুতিসুখকর অনুভূতির সৃষ্টি করেছে।

অনুপ্রাস অলংকার পাঁচ ভাগে বিভক্ত— বৃত্তানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, লাটানুপ্রাস এবং শ্রুত্যনুপ্রাস। মানিক দত্তের কাব্যে বৃত্তানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

বৃত্ত্যনুপ্রাস : একটি ব্যঞ্জনধ্বনি যদি একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছ যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্তভাবে বা বিযুক্তভাবে ধ্বনিত হয় তখন তাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকার বলে। কালকেতুর অনুরোধে দেবী চণ্ডীর নিজ ‘আত্মপরিচয়’ অংশটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকারের সুনিপুণ ঝংকারে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে-

চণ্ডিকা চর্চি চামুণ্ডা কালিকা

চণ্ডবতী মহামায়া।

শুভ শুভঙ্করী শুভ আমি করি

তোমারে করিল দয়া।।

এখানে 'চ' এবং 'শ' ধ্বনির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ সমাবেশ কানে সুখানুভূতির সৃষ্টি করেছে। আবার, 'বাজনিঞা বাজন বাজাএ নানা মতে'। খুল্লনার বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দৃশ্যে বাজনা বাদকদের বাজনা বাজানোর আদেশ দানের এই অংশে 'বাজ' এই ধ্বনিগুচ্ছের শ্রুতিমধুর ধ্বনি সমাবেশ ঘটেছে।

অন্ত্যানুপ্রাস : কবিতার এক চরণের শেষে যে ধ্বনি থাকে পরবর্তী চরণের শেষে সেই একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তি ঘটলে অত্যানুপ্রাস অলংকার হয়। দেবী চণ্ডীর যুদ্ধ সজ্জার রূপটিকে কবি মানিক দত্ত অন্ত্যানুপ্রাসের মাধ্যমে এখানে উপস্থাপন করেছেন-

চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধরি পার্ব্বতী ভয়ঙ্করী

অট্ট অট্ট হাসন্তি।।

খাপর ভরি পিএ মাহেশ্বরী

ঘোট ঘোট ঘোটন্তি ।।

রক্তবীজ তনু বদনে না ফনু।

চুম চুম চুমন্তি।।

ঐরি করে ধরি খাপর ভরি ভরি

চক চক চিবান্তি।।

প্রতি চরণের শেষে 'ন্ত' এই ব্যঞ্জনগুচ্ছ বার বার উচ্চারিত হয়ে কানে এক শ্রুতিসুখকর ধ্বনিঝংকারের আবেশ সৃষ্টি করেছে। এক অর্থে মিলযুক্ত কবিতাই অন্ত্যানুপ্রাস। এদিক থেকে দেখলে মানিক দত্তের গোটা কাব্যটাই মিলযুক্ত কবিতার চরণে রচিত।

বক্রোক্তি : 'বক্রোক্তি' মানে বাঁকা কথা। কোনো কথা সোজাসুজি না বলে যদি বাঁকা ভাবে বলা হয় তবে তাকে 'বক্রোক্তি' অলংকার বলে। 'বক্রোক্তি' অলংকার দুপ্রকার: 'শ্লেষ বক্রোক্তি' ও 'কাকু বক্রোক্তি'।

কাকু বক্রোক্তি : 'কাকু' শব্দটির অর্থ হল কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গি। কণ্ঠস্বরের বিশেষ উচ্চারণভঙ্গির জন্য যদি হ্যাঁ বাচক কথা 'না' বাচক বলে মনে হয় বা 'না' বাচক কথা 'হ্যাঁ'-বাচক বলে মনে হয় তবে তাকে 'কাকু বক্রোক্তি' অলংকার বলে। কাকু বক্রোক্তির বাক্যটির মধ্যে সবসময় একটি প্রশ্নবোধক ভাব থাকে। কারণ বাক্য প্রশ্নবোধক হলেই 'হ্যাঁ' বাচক কথা 'না' বাচক বলে মনে হয় বা 'না'-বাচক কথা 'হ্যাঁ' বাচক বোঝায়।

যেমন- 'হস্তে পাইলে চন্দ্র ছাড়ে কুনজন।' বাক্যটির মধ্যে কোথাও না বাচক শব্দ নেই। কিন্তু বাক্যটি জিজ্ঞাসামূলক হওয়ার জন্য অর্থ দাঁড়ায় সুযোগ পেলে কেউ-ই সেই সুযোগ ছাড়ে না। কাজেই এটি 'কাকু বক্রোক্তি' অলংকার।

শ্লেষ : একটি বাক্যে একটি শব্দ দুই ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করলে শ্লেষ অলংকার হয়।

আছিলাঙ একাকিনী বসিয়া কাননে।

আনিল তোমার স্বামী বান্ধ্যা নিজ গুণে।।

'নিজ গুণে' শব্দটির দুরকম অর্থ। সাধারণ অর্থ 'ধনুকের ছিলায়' শ্লেষার্থ 'নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে'। দেবী চন্ডী ফুল্লরার কাছে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে তিনি যে স্বেচ্ছায় তাদের বাড়ি আসেননি, তাঁর স্বামী কালকেতু তাঁকে নিয়ে এসেছেন, একথা বলেছেন এই শ্লেষ অলংকারের সাহায্যে।

অর্থালংকার

উৎপ্রেক্ষা : গভীর সাদৃশ্যের জন্য যদি উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হয় তবে তাকে উৎপ্রেক্ষা অলংকার বলে। উৎপ্রেক্ষা অলংকার দুপ্রকার- বাচ্যোতপ্রেক্ষা ও প্রতীয়োমানোতপ্রেক্ষা।

ক) বাচ্যোতপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হয় এবং বাক্যে সংশয়বাচক শব্দের উল্লেখ থাকে তাকে বাচ্যোতপ্রেক্ষা অলংকার বলে।

দাসী দুবলার সনে বলিছে লহনা।

খুলনার রূপ হৈল যেন কাচা সোনা ।।

লহনার কুট্টিনী দাসীর সঙ্গে সতীন খুল্লনার রূপযৌবন আলোচনা প্রসঙ্গে কবি এই বাচ্যোতপ্রেক্ষা অলংকারের ব্যবহার করেছেন।

খ) প্রতীয়মানোতপ্রেক্ষা : যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারে উপমেয়কে উপমান বলে সংশয়. হয় কিন্তু বাক্যের মধ্যে সংশয়বাচক শব্দটির উল্লেখ থাকে না তাকে প্রতীয়মানোতপ্রেক্ষা অলংকার বলে। দেবী চন্ডীর সঙ্গে ফুল্লরার কথোপকথনের সময় কবি এই প্রতীয়মানোতপ্রেক্ষা অলংকার ব্যবহার করেছেন-

আমা হইতে রূপ তোর লক্ষ গুণে ভালো।

লাড়ার কুড়িয়ার মধ্যে চান্দ করিয়াছে আলো।।

বিভাবনা : বিনাকারণে কার্যের উৎপত্তি হলে বিভাবনা অলংকার হয়।

শাশুড়ী ননদী নাহি নাই তোর সতীন।

কার সনে ছন্দ করি বদন মলীন।।

শাশুড়ি, ননদিনী কিংবা সতীনের দ্বারা সাধারণত গৃহবধূরা নির্যাতিত হয়। কিন্তু ফুল্লরার দাম্পত্য জীবনে এ তিনজনের অস্তিত্ব নেই; তথাপি কেঁদে কেঁদে তার চোখ রাঙা হয়েছে। এটা যেন কারণ ছাড়াই কার্যোৎপত্তি।

অর্থান্তরন্যাস : যেখানে সাধারণ বক্তব্যের সাহায্যে বিশেষ বক্তব্যকে সমর্থন করা হয় সেখানে অর্থান্তরন্যাস অলংকার হয়। ফুল্লরা-

পীপীড়ার পাখা হয় মরিবার তরে।

কাহার বণিতা তুমি আনিয়া থুইলে ঘরে।।

এই সাধারণ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এক বিশেষ বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে। ‘চন্ডীমঙ্গল’-কাব্যের ধনপতি উপাখ্যানে গৌড়েশ্বরের এই কথায়ও বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে-

এক হিত কথা শুন মিতা মহাশএ।

নারীলোক আপনার কোন যুগে নয়।।

পরপুরুষের আশ করে সবর্বথায়।

নারী কি আপন হয় কুন শাস্ত্রে কয়।।

এরকম আরো একটি উদাহরণ হল-

পুরুষ বিনা নারীর যৌবন মরা।

চন্দ্রবিনা উজ্জ্বল করিতে নারে তারা।।

উপমা : অর্থালংকারের মধ্যে 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যে উপমা অলংকারের বেশি ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একই বাক্যে দুই বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে বিশেষ ধর্মে, গুণে বা বিশেষ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হলে উপমা অলংকার হয়। সুরথ রাজার কোটালের ভীমাকায় রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি পর্বতের সঙ্গে তুলনা করেছেন-

কালুডন্ডা কোতাল বড় খড়য়ার।

বত্যিশ সাঙ্গে নড়ে জেন পর্বত আকার ।।

সুরথ রাজা কালকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। কোতাল কালকেতুকে বন্দি করে নিয়ে এসে লৌহগরাদের মধ্যে বেঁধে রেখেছে। মানিক দত্ত কালকেতুর সেই বন্ধন দশা ও অসহায় রূপকে যেন ছবির মতো এঁকেছেন এই উপমা অলংকারের ব্যবহারে-

প্রথমে চুলের দড়ি বান্ধে চালের উপর।

হস্তে পাএ দড়ি দিয়া বান্ধে থর থর।।

গলাএ লোহার শিকল কমরে চর্মের ডোর।

বিপত্য বন্ধনে জেন পইড়া থাকে চোর।।

শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে বাণিজ্য পাটনে যেতে মনস্থ করেছেন, মা খুল্লনা এসময় মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহবশত একমাত্র অবলম্বন তাকে নিরস্ত করতে চেয়েছেন।

শ্রীমন্তের মাতার এ আচরণ ভালো লাগেনি। তিনি মায়ের চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করে নারীর কর্তব্য-কর্ম সম্বন্ধে মাকে জ্ঞাত করাতে চেয়েছেন উপমা অলংকারের ব্যবহারে-

সতী নারীর স্বামী নারায়ণ সমতুল।

পরার পুরুষ দেখে শিমলির ফুল।।

সর্বোপরি আরো একটু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে মানিক দত্তের কাব্যে অলংকার সৃজনের নানারূপ হয়তো চোখে পড়বে; তবে যেটুকু আলোচনা করেছি তাতেই স্পষ্ট বোঝা গেছে ছন্দ ও অলংকার রচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিধিতে মানিক দত্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ছন্দ, অলংকার রচনা সবই মানুষের জীবনকেন্দ্রিক। মানুষের জীবনযাত্রা, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, শোক, অসহায়তা, আনন্দ-বেদনা সব কিছুকেই তিনি তাঁর ছন্দ ও অলংকার সৃজনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। কবি ছন্দ ও অলংকার রচনা করতে গিয়ে সেদিকে নজর রেখেছিলেন; তাই তাঁর ছন্দ ও অলংকার ব্যবহার অতি আবেগে উচ্চকিত হয়ে ওঠেনি। বলা যায়, 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যে মানিক দত্তের ছন্দ ও অলংকারের ব্যবহার কাহিনির প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত এবং কাব্যশরীরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। পরবর্তীকালের চন্ডীধারার কবি মুকুন্দরামের মতো ছন্দ ও অলংকার রচনায় মানিক দত্তের কাব্যে বৈচিত্র্য না থাকলেও তাঁর কৃতিত্ব কোনোভাবেই খর্ব করা যায় না।

১১.৫: অনুশীলনী

১। হাস্যরস সৃষ্টিতে মানিক দত্তের দক্ষতার পরিচয় দিন।

২। টীকা লিখুন- মানিক দত্তের চন্ডীমঙ্গল কাব্যের ভাষা।

৩। ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগ দক্ষতায় মানিক দত্তের কৃতিত্বের পরিচয় দিন।

১১.৬: গ্রন্থপঞ্জি

১. চন্ডীমঙ্গল- সুকুমার সেন

২. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- (প্রথম খন্ড) সুকুমার সেন

৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৫. কবি মুকুন্দরাম- ক্ষেত্র গুপ্ত

৬. কবিকঙ্কণ চণ্ডী- সনৎ কুমার নস্কর

৭. কবিকঙ্কণচণ্ডী- তরুণ মুখোপাধ্যায়

৮. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৯. চন্ডীমঙ্গল পরিক্রমা- সুখময় মুখোপাধ্যায়

১০. বাংলা সাহিত্য পরিচয়- পার্থ চট্টোপাধ্যায়

১১. চণ্ডীমঙ্গলকাব্য সৃষ্টি ও নির্মাণ- আদিত্যকুমার লালা

একক ১২। ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় পরিচয়

বিন্যাসক্রম

১২.১: উদ্দেশ্য

১২.২: ধর্ম ঠাকুরের উৎস ও বৈশিষ্ট্য

১২.৩: ধর্মমঙ্গলের কবিগন

১২.৪: ধর্মমঙ্গল : রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য

১২.৫: ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিকতা

১২.৬: ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যতা

১২.৭: অনুশীলনী

১২.৮: গ্রন্থপঞ্জি

১২.১: উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে কালের পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি যুগে বিভক্ত করা- হয় প্রাচীন যুগ (৯০০-১২০০), মধ্যযুগ (১৩৫০-১৭৬০) এবং আধুনিক যুগ (১৭৬০-বর্তমান কাল পর্যন্ত) এবং মধ্যবর্তী কালে ১২০০-১৩৫০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে (কোন সাহিত্য নিদর্শন না থাকায়) 'অন্ধকার যুগ' নামে অভিহিত করা হয়।প্রত্যেক যুগে সমাজ কাঠামো ও মানব জীবনের রূপের ভিত্তিতে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কেননা কোন দেশের ও কালের সাহিত্য থেকে সেই দেশ ও কালের মানব জীবনের বিন্যাস সন্ধান করা যায়। মধ্যযুগের মধ্য পর্বে একটি বিশেষ লগ্নে 'ধর্মমঙ্গল 'কাব্যচর্চার সূচনা হয়েছিল।

কিন্তু তার আগেই সূচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য চর্চার ধারা। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের ধারা তে ধর্মমঙ্গল একটি নবতর সংযোজন। আলোচ্য একক পাঠ থেকে কতকগুলি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যাবে-ধর্ম ঠাকুরের উৎস ,বৈশিষ্ট্য,কাব্য কাহিনী ,কবিগণের পরিচয়, রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য প্রসঙ্গ , ঐতিহাসিকতা , স্বতন্ত্রতা , চরিত্র বিচার ও সমাজপরিচয় ইত্যাদি।

১২.২: ধর্ম ঠাকুরের উৎস ও বৈশিষ্ট্য

"ধর্মঠাকুরের আদিতম রূপ যাই হউক না কেন, যে যুগে তাঁহাকে পাইতেছি তাহা আধুনিক ব্রাহ্মণ্য –সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট"।-সুকুমার সেন।

ধর্ম ঠাকুর হচ্ছেন একখণ্ড পাথর। কোথাও এই পবিত্র পাথরটি কূর্মাকৃতি , কোথাও ডিম্বাকৃতি, বা এই দুইয়ের কাছাকাছি। এর কাছাকাছি। কখনো আবার তার লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে, আর তার গায়ে থাকে পিতলের পেরেক বসানোর চক্ষু-ভক্তদের দান।নির্জন স্থানে, চালাঘরে বা মন্দিরে তার স্থান, কোথাও তিনি ধর্মরায়,বুড়ারায়, কালুরায়, যাত্রাসিদ্ধি রায় ইত্যাদি নামে পরিচিত।ডোম জাতীর লোকেরা এর পূজারী হন- যিনি পন্ডিত বা দেবাংশী নামে পরিচিত এরা নিম্নবর্গের লোক গ্রাম-গঞ্জে 'দেয়াশী' নামে পরিচিত।এরা পূজারী হলেও ব্রাহ্মণ দের পৈতের পরিবর্তে তামার তাগা পরে। কোথাও নিত্য পূজা হয়, আবার কোথাও বাৎসরিক পূজা সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়।দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য মানত করলে ধর্ম ঠাকুরের স্থানে পাঁঠা ,হাঁস ,পায়রা ,মুরগি ,শূকর বলি দেওয়া হয়। এই ধর্ম ঠাকুরের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব নিয়ে নানা প্রকার মতভেদ আছে।ডঃ সুকুমার সেন ধর্ম ঠাকুরকে বরুণ দেবতা রূপে গ্রহণ করেছেন আবার তিনি ধর্মের পরিকল্পনায় সূর্য-তনয় যমেরও কিছু কিছু প্রভাব দেখেছেন। তবে এ ধরায় মূলতঃ হিন্দুর যমরাজ নন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তিনি হলেন বৌদ্ধ ত্রিরত্নের (বুদ্ধ –ধম্ম- সংঘ) মধ্যম রত্ন। বৌদ্ধ ত্রিশরণে অন্যতম হলো ধর্মং শরণং গচ্ছামি। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ স্মৃতি বহন করেছেন এই ধর্ম ঠাকুর।বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক শূন্যপুরাণ প্রকাশ করে

সেখানেও ধর্মঠাকুর বিষয়টিকে বৌদ্ধ যুগের বাংলা সাহিত্য ঘোষণা করা হয়। সুনীতি বাবু ধর্মকে কূর্ম দেবতা বলে মনে করেছেন।

ধর্ম ঠাকুর সূর্যদেবতা এইরকম মতবাদ একসময় খুব জনপ্রিয় হয়। ডঃ সুকুমার সেন, গোপাল হালদার, এরা ধর্মকে সূর্যদেবতার প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। ডঃ সেন মল্লসারুল থেকে পাওয়া তাম্রশাসনে একটি সূর্য মূর্তিকে ধর্মনগরের মূর্তি বলে মনে করেন। ধর্ম ঠাকুর যে সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন এর পিছনে কতগুলি যুক্তি আছে-

১) সূর্য শুধু হিন্দু বা পারসিক দেবতা নন। দ্রাবিড়- অস্ট্রিক নানা আদিবাসীরাও বাংলার চারিদিকে সূদেবতার উপাসনা করেছেন-বাংলার মেয়েদের ব্রতকথা সূর্য বড় দেবতা। সুতরাং এই সূর্য ধর্ম হওয়া অসম্ভব নয়।

২)' ধর্ম' কথাটির উৎপত্তি অস্ট্রিক 'ধুম্' শব্দ থেকে। ধূম্=কূর্ম বা কচ্ছপ। ধর্ম দেবতা ও কচ্ছপের আকৃতি। আর আদিবাসীরা সূর্যের যে উপাসনা করে করে তাও কচ্ছপের মতো।

৩)ধর্ম ঠাকুর কুষ্ঠ এবং অন্ধত্ব রোগ নিরাময়কারী দেবতা এবং বন্ধ্যত্ব প্রতিকারের সমর্থক। কুষ্ঠ ইত্যাদি নিরাময়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূর্যের ভূমিকা কম নয়।

৪)উড়িষ্যার কোন কোনারকের সূর্য মন্দিরে সূর্য মূর্তি সঙ্গে ধর্ম ঠাকুর সম্পর্কিত এদেশীয় কবিদের বর্ণনা অনেকটা মিল আছে। কোনারকের সূর্য দেবতার বেশ-

'হাঁসা ঘোড়া জোড়া পায়ে দিয়া মোজা।
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা'।।

৫)ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুর এবং সূর্য অভিন্ন রূপে প্রতিপন্ন হয়েছে।রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় শালে ভর দিয়ে মৃত্যুবরণ করলে- স্ত্রী হত্যার পাপ যায় সূর্য গরাসিতে ।

রঞ্জাবতী ধর্ম পূজা করতে গিয়ে সূর্যকে অর্ঘ দিয়েছেন-

'অনুগ্রহ কর প্রভু শচলে দিব ভর।

অর্ঘ্য গ্রহণ কর ঠাকুর দেব দিবাকর।।'

লাউসেন হাকন্দে নিজদেহ নয় খন্ড করে ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেছিলেন।

সূর্যের স্বাভাবিক গতির বৈপরীত্যে সাধন বা পশ্চিমোদয় দেখানো লাউসেনের উদ্দেশ্যে। আসলে ধর্ম বা সূর্য দেব সহায় বলেই তার পক্ষে অসাধ্য সাধন সম্ভব। এছাড়া ধর্মরায় রাজও ধর্মমঙ্গল গানে শ্বেত- অশ্ব- আরোহী সিপাহী রূপেও এই ধর্মরায়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হয়তো ডোমের মতো দেশীয় যোদ্ধৃ জাতির এই যুদ্ধ দেবতা ধর্ম - বিজয়ের দিনে ভক্তদের চোখে বিজয়ী তুর্ক-সিপাহী পরিকল্পনাও এসে মিশেছে।

ধর্মঠাকুর বৈদিক দেবতা না হলেও বিবর্তিত হতে হতে আজ ধর্মঠাকুরে অনেকটাই আর্যীকরণ ঘটেছে। পণ্ডিতরা ধর্মঠাকুরকে জল এবং বরুণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ বরুণ ও ধর্ম উভয় আবার বৃষ্টির দেবতা । ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায় যে রাঢ় অঞ্চলের খরা প্রবণ এলাকায় বৃষ্টির জন্য ধর্ম ঠাকুরের পূজা করা হয়। রাঢ়ের কোন কোন গ্রামে ধর্ম ঠাকুরের নাম মেঘরায়। আবার যমের অন্যতম নাম ধর্মরাজ। বর্ধমান জেলার কোন কোন গ্রামে ধর্মের গাজনে মানুষের মৃতদেহ নিয়ে নৃত্যগীতি অনুষ্ঠিত হয় ।রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।লাউসেনও হাকন্দ তপস্যায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন ।তাই মনে হয় ধর্ম ও যম এক না হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে

ধর্মঠাকুরকে শূন্যপুরাণে নিরঞ্জন বলা হয়েছে। কৃষিজীবী সমাজে তার প্রভাব ছিল তাই ধর্মমঙ্গলের শিবের কৃষিকার্যে বর্ণনা আছে। ধর্ম পূজা বিধান গ্রন্থে ধর্মের প্রনাম প্রনাম মন্ত্রটি প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয়-

'ওঁ অধো ন ঊর্ধ্বং শিবো ন শক্তিঃ

নারী ন পুরুষো ন চ লিঙ্গ মূর্তিঃ

হস্তং ন পাদং ন রূপং ন ছায়া

তস্মৈ নমস্তে নিরঞ্জনায়।।'

ধর্ম ঠাকুর সার্বজনীক দেবতা গ্রামের বহু লোকের সহযোগিতায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর পূজা ডোম ,হাড়ি,মুচি শ্রেণীর মানুষ করেন বলে ধর্ম ঠাকুর বেদাচার বহির্ভূত । তবে আর্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রচেষ্টাও দেখা যায় । রামাই পণ্ডিত তাঁর শূন্যপুরাণে বলেছেন-

'রামাই নামেতে পন্ডিত পবিত্র কায়।

রক্তবর্ণের তাম্র করেতে চড়ায়।।'

এখানেও ' রক্তবর্ণ' শব্দটি থেকে সূর্যের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

ধর্ম ঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয়ের বিষয়টি নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও একথা মানতে হয় যে ধর্ম ঠাকুরের নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সর্বত্রই ধর্ম ঠাকুরকে আর্য দেবতা রূপে গ্রহণ করার জন্য প্রচুর ওকালতি করা হয়েছে। ধর্ম পূজা বিধান ধর্মকে নিরাকার সূর্য রূপে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে-

'বাড়ি মোর বল্লুকার।

পূজা শ্রী নৈরাকার।

শূন্য মূর্তি ধ্যান করি।

সাকার মূর্তি পূজি।'

সাকার - নিরাকার যাই হোক না কেন, ধর্মঠাকুরকে লৌকিক দেবতা হিসেবে গ্রহণ করা দরকার। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন ধর্ম ঠাকুরকে কেন্দ্র করে পরাধীন বাঙালি(আর্য-অনার্য) সজ্ঘবদ্ধ হবার সংকল্প গ্রহণ করে।

ধর্ম ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য-

ক) ধর্ম ঠাকুর এর মধ্যে আর্য, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলামের প্রভাব আছে।

খ) ধর্ম ঠাকুরের কোন নির্দিষ্ট অবয়ব নেই কোথাও আছে অশ্বারোহী বীর মূর্তি। কোথাও শিলা স্তুপ , কোথাও কূর্ম মূর্তি, কোথাও বা ধর্মঠাকুরকে শুন্য,অনাদি,অনাদ্য, নিরঞ্জন বলে সম্বোধন করা হয়ে থাকে।

গ)ধর্ম ঠাকুরের নামের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে যে রায় শব্দটি যুক্ত আছে তা 'রাজ' শব্দ থেকে এসেছে।

ঘ) বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পৃথক নাম আছে বেলডিহা গ্রামে বাঁকুড়া রায়, শ্যামবাজার গ্রামে দলু রায়, দেপুরে জগৎ রায়, গোপালপুরে কাঁকড়া বিছে, এবং পশ্চিম পাড়ায় ধর্ম ঠাকুর যাত্রাসিদ্ধি নামেই পরিচিত।

ঙ)ধর্ম ঠাকুর ক্রুদ্ধ হলে কুষ্ঠ রোগ হয়। ধর্ম সন্তুষ্ট হলে পশ্চিমে সূর্যোদয় হয় ।ধর্মের উপাসনায় বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করে। কুষ্ঠ ব্যাধি দূর হয়। তিনি ফসল উৎপাদনেরও দেবতা।

চ) ধর্ম ঠাকুর কে সর্ব শুক্ল বলে কল্পনা করা হয়। ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী লিখেছেন -

' ধবল অঙ্গের জ্যোতি ধবল মাথার ছাতি

ধবল বরণে বাড়িঘর।

ধবল ভূষণ শোভা অনুপম মুনি লোভা

আলো কৈলে পরম সুন্দর।।'

ছ) সূর্য দেবতা যেমন অশ্ব চালিত রথে আরোহন করেন ,ধর্মঠাকুরের সঙ্গেও তেমনি ঘোড়ার সম্পর্ক আছে ।কোথাও কোথাও ধর্ম ঠাকুরকে পূজায় মাটির ঘোড়া উপহার দেওয়া হয়।

ধর্ম পূজা পদ্ধতি-

ক) ধর্মঠাকুর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবীর মত পূজা প্রতিষ্ঠা লাভের প্রতিযোগিতায় নামেনি । ক্রোধ হিংসা তার মধ্যে নেই ।ভক্তকে তিনি কোন লোভ দেখাননি ।তবে দুষ্টের দমন এবং প্রকৃত ভক্তকে কৃপা করা তাঁর বিশিষ্টতা।

খ) ধর্ম পুজায় উচ্চবর্ণের অধিকার ছিল না কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকলেও প্রধানত ডোম পুরোহিতই এই পূজা করে থাকেন। পূজারীদের পন্ডিত উপাধি দেওয়া হয়। অবশ্য ডোম ভিন্ন অন্য জাতীয়রাও ধর্ম পূজার অধিকারী।

গ) ভক্তিভরে পূজা করলে ধর্ম কি বা করবেন এই বিশ্বাস নিয়ে ভক্তরা কঠিন নিয়ম পালন করে থাকেন।

ধর্মের মন্দিরে, পীঠস্থানে, গাছ তলায় চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শ্রাবন্তী পূর্ণিমার মধ্যে যেকোনো বারোদিন আড়ম্বরের সঙ্গে পূজা হয়,কখনও সাদা ফুল , সাদা পায়রা , সাদা পাঁঠা দেওয়া হয়।

ঘ) চড়ক এবং গাজনের সময় কঠিন নিয়ম পালন ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে দিয়েই ভক্তরা ধর্ম পূজা করে থাকেন আগুনেড় বঁটিতে ঝাঁপ দিয়ে জিভে এবং পিঠে বঁড়শি ফুঁড়ে শূন্যে আবর্তিত হয়ে কঠিন নিয়ম পালন করেন ভক্তরা।

ঙ) পূজা তিন রকম ভাবে হয়ে থাকে নিত্য পূজা,বার্ষিক পূজা এবং ঘরভরা পূজা বা গৃহভরণ পূজা।

রামাই পন্ডিতের শূণ্যপুরাণ-

ধর্ম ঠাকুরের পূজা পদ্ধতি পাওয়া গেছে রামাই পন্ডিতের নামে। তাঁকেই ধর্মপূজার আদি পুরোহিত বলে মনে করা হয়। প্রচলিত কাহিনী এই- আদিত্যদেব ধর্মের আদেশে ব্রাহ্মণ বংশে বিশ্বনাথ মুনির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ধর্মঠাকুর স্বয়ং তামার উপবীত দিয়ে নিজের পূজারী করে দিলেন। অধিক বয়সে ধর্মের নির্দেশে রামাই পণ্ডিত বিবাহ করেন।তাঁর পুত্র ধর্মদাস ধর্মের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে কিছু অনাচার করলে পিতা অভিশাপ দেন, ‘হইবি ডোমের পুরহিত’ তবে একথাও বলেন যে

ডোমের পুরোহিত হলেও সে ও তার সন্তানেরা ব্রাহ্মণের মতোই শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করবে।

রামাই পন্ডিতের 'শূন্যপূরান'- এ বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জনের লেখা বলেই মনে করা হয়। গ্রন্থটি সম্ভবত সপ্তদশ -অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। এতে আছে সৃষ্টি পত্তন , ধর্মপূজার ব্রত, উপাসনা ইত্যাদি ।'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অংশটিতে সময়কালের রাষ্ট্রের রাজনৈতিক , সামাজিক পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম উপাসক বৌদ্ধদের উপর হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যাচার চলেছিল তুর্কি আক্রমণের সময় মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতে থাকলে বৌদ্ধরা খুশি হয়। তারা মনে করে স্বয়ং ধর্মরাজ তাদের রক্ষা করতে এসেছেন। এই বিরোধের বিষয়টি এখানে বর্ণিত হয়েছে-

'ব্রহ্মা হৈল মহম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর আদম হৈল শূলপাণি।

গণেশ হৈল কাজী কার্তিক হৈল গাজী ফকির হৈল যত মুনি।

আপনি চন্ডিকা দেবী তিঁহ হৈল হায়া বিবি পদ্মা হৈল বিবি নূর।

যতেক দেবতাগণ হৈয়া সবে একমন প্রবেশ করিল যাজপুর।'

রামাই পন্ডিতের কাহিনী যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তার প্রমাণ 'অনাদ্যের পুঁথি' নামে ডঃপঞ্চানন মন্ডল সম্পাদিত আরেকখানি গ্রন্থ। এই গ্রন্থেও রামাই পন্ডিতের জীবন কথা , ধর্ম পূজার পদ্ধতি এবং মূল্যবান তথ্য আছে ।রামাই এর পুত্রের নাম এখানে ধর্মদাস নয় ,শ্রীধর।

১২.৩: ধর্মমঙ্গলের কবিগন

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয় গৌরব অতুলনীয়। কিন্তু কবিপ্রতিভা সেই তুলনায় নগণ্য মাত্র। এর একটি কারণ সম্ভবত দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে উচ্চবর্ণজাত প্রতিভাধর কবি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, বীররসাত্মক কাব্য হয়ে ওঠায় বাঙালির সংসার জীবন এবং অশ্রুভারাতুর হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবকাশ দেখা যায় নি। তৃতীয়ত, যুদ্ধ বর্ণনার অনভিজ্ঞ কল্পনা এবং পুরুষদেবতার নিরাকার কাঠিন্য কবিমনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। চতুর্থত, চন্ডী,মনসা ইত্যাদি অন্যান্য দেবী কল্পনায় মঙ্গলকাব্যের কবিরা ভারত- পুরাণ থেকে

উপাদান সংগ্রহের যে সুযোগ পেয়েছিলেন, ধর্মঠাকুর অবৈদিক হওয়ায় এই কাব্যের কবিরা কাব্য নির্মাণে সেই উপাদান স্বল্পতার অভাব বোধ করেছিলেন বলে মনে হয়। এই কাব্যধারা পঞ্চদশ শতক থেকেই ছড়া ও ব্রতকথা রূপে প্রচলিত ছিল।আঙ্গিক রীতিতে ছিল গান, পরে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সেগুলি কাব্যাকারে সংগ্রথিত হয়।

এই কাব্যধারার আদি কবির কাব্য নির্ণয়ে বিতর্ক আছে। তবে কবি মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, সীতারামদাস প্রমুখ পরবর্তী কবিদের কাব্যে প্রদত্ত তথ্যগত সাক্ষ্যে জানা যায় কবি ময়ূরভট্টের নাম। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 'শ্রী ধর্মপুরাণ' নামে ময়ূরভট্টের কাব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ভাষা বিচারে প্রমাণিত হয় গ্রন্থটি অর্বাচীন ব্যক্তির রচনা। আবার 'সূর্যশতক' রচয়িতা সংস্কৃত কবি ময়ূরভট্টের সঙ্গে নাম সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন- " মনে হয় ময়ূরভট্ট কোন বাঙালি কবির প্রকৃত নাম নহে। সংস্কৃত সূর্যশতক রচয়িতা ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙালি কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।"

রূপরাম চক্রবর্তী:- সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত ধর্মমঙ্গল কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। লাউসেনের জন্ম থেকে আখড়ায় তাঁর মূল্ল বিদ্যা শিক্ষা পর্যন্ত কাহিনী- অংশ বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির নাম ' অনাদি মঙ্গল'। কবির জন্ম বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত কাইতি শ্রীরামপুর গ্রাম (এই শ্রীরামপুর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর নয়)। কবির পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী ছিলেন বড় পন্ডিত। কৈশোরে কবির পিতৃবিয়োগ হয় । দাদা রামেশ্বরের রুক্ষ মেজাজে কবি অতিষ্ঠ হয়ে গৃহত্যাগ করে পাষণ্ড গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে এক ভট্টাচার্যের টোলে আশ্রয় নিয়ে বিদ্যা চর্চা করেন। কোন এক কারণে গুরুর সঙ্গে বিবাদ বাদে এবং কবি গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কৃত হন। সেখান থেকে তিনি উপস্থিত হন নবদ্বীপে পলাশনের বিলের কাছে। সেখানে ব্যাঘ্ররূপী ধর্ম ঠাকুর কবিকে দেখা দিয়ে কাব্য রচনার আদেশ করেন। অসম্মত দ্বিধাগ্রস্থ কবি এরালবাহাদুরপুর গ্রামে আসেন এবং সেখানে গোপভূমের এক গোস্বামী গণেশ রায়ের গৃহে আশ্রয় পান। এই আশ্রয়ে থেকে রূপরাম কাব্য রচনা করেন।

এই কাব্যে বর্ণিত কবি রুপরামের আত্মজীবনীতে তৎকালীন সমাজের পরিচয় আছে। কাব্যে কোন কোন পুঁথিতে আছে শাহ সুজার উল্লেখ। কাব্যের রচনাকাল সংশয়াছন্ন। সমালোচকেরা ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করেছেন। সে ক্ষেত্রে মনে

হয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমে কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। এমনকি আদিরূপ রাম নামে আর এক কবির নাম পাওয়া গেছে ।

রূপরাম এর কবি প্রতিভা ছিল। তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘরোয়া সুরে কথা বলা। সেই জন্য পাঠক বা শ্রোতা তাঁর কাব্যে সহজে আকৃষ্ট হয়। আবার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও আছে , যেমন:

'কপালে সিঁদুর পরে তপন উদয়।
চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়।।
চন্দ্র কোলে শোভা যেন করে তাঁরা গন।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ।।'

চরিত্রচিত্রণেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ইছাই ঘোষের ভবিষ্যৎ পরাক্রমের কথা যেমন তার বাল্য চিত্রে আভাসিত হয়েছে, তেমনি মহামদ চরিত্রের বিকৃতি না দেখিয়ে তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্দেশ করেছেন।মহামদ তাঁর প্রিয় পাত্রী রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ কর্ণ সেনের বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অভিমান সঞ্জাত স্নেহই তাকে লাউসেনের সর্বনাশ সাধনের প্রবৃত্ত করেছিল।

রুপরামের কাব্যে সপ্তদশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাসের আঞ্চলিক পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন বিনিময় -মাধ্যম হিসেবে তখন কড়ির প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের পণ্ডিতদের টোলে অভিধান, ব্যাকরণ, কালিদাস, পিঙ্গল এর ছন্দ সূত্র, নব্যন্যায়, মাঘ, মহামতি যাস্কের নিরুক্ত, ইত্যাদি কবি ও লেখকদের রচনা পড়ানো হতো ।শিক্ষার কেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধ ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, জৌগ্রাম। সামাজিক রীতির পরিচয় পাওয়া যায় 'ষেটের ব্রত',একুশশা এবং অন্নপ্রাসন এর উল্লেখে সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় কোন রঞ্জাবতী বিবাহ উপলক্ষে মেয়েদের রঞ্জাবতী চোখে পুরুষ আকর্ষণকারী মন্ত্রপুতঃ কাজল (দুর্গাপূজায় সংগৃহীত) দানে।কবি রূপরাম কাব্যটির নাম 'অনাদ্যমঙ্গল' রূপে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের অংশ মাত্র প্রকাশিত হওয়াতে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থ বিচার সম্ভবপর নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে রুপরামের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। যে লাউসেনের কাহিনী -ছড়া ও- পাঁচালী ও ব্রত কথার সীমায় আবদ্ধ ছিল, রূপরাম সম্ভবত তাকে সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যের জগতে উন্নীত করেন। চরিত্র সৃষ্টি

,বর্ণনাভঙ্গি এবং আত্মকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির কৃতিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন –"কোন কোন সময়ে তাঁকে প্রায় মুকুন্দরাম এর মত প্রতিভাশালী মনে হয়, বিশেষত করুন রস ও হাস্য পরিহাস তিনি মুকুন্দরাম এর সমকক্ষ। তাঁর প্রতিভা ছিল বলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী কবিরা অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন "রুপরামের আত্মকাহিনী মূলক অংশ বিষয়ে ডঃসুকুমার সেনের অভিমত বিশেষ মূল্যবান-" পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্পের মতো কোনো জীবন -রস -নিটোল রচনা থাকে তবে তাহা রূপরাম এই আত্মকাহিনী।

ঘনরাম চক্রবর্তী: ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বজন পরিচিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম পরিচয় স্বল্প,তুলনায় তাঁর 'অনাদি মঙ্গল' কাব্যের আয়তন এবং ইতিবৃত্ত সুবিস্তৃত ।অষ্টাদশ শতকে আবির্ভুত সম্পর্কে সবিশেষ সংবাদ দিয়েছেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং ড. সুকুমার সেন। বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরে অবস্থিত কইয়ড় পরগনার অন্তর্গত বাঁকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম হয়। পিতার নাম গৌরী কান্ত ,মাতার নাম সীতাদেবী ।কবি শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কবির পিতা গৌরীকান্ত তাকে রামপুরের টোলে পাঠান। সেখানে সুসংসর্গে ঘনরামের স্বভাবের পরিবর্তন হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন:

'অখিল বিদ্যার কীর্ত্তি   মহারাজ চক্রবর্তী

কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি   কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।'

মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ছিলেন সম্ভবত কবির পৃষ্ঠপোষক।

'শক লিখে রাম গুন রস সুধাকর' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখিত শ্লোক দেখে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, ঘনরামের কাব্য সমাপ্তির কাল ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর।অবশ্য এই সময় উল্লেখ করা হয়েছিল সমাপ্তির অনতি পূর্ববর্তী মুহূর্তে। কবি সত্যনারায়ণ পাঁচালী ও রচনা করেছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কিত জীবনী কথায় ঘনরামের ব্যক্তি বিবরন বিরলদৃষ্ট। সেখানে আছে কবির গুরু ভট্টাচার্যের কথা, নীলাচল গমন, রামচন্দ্রের দর্শন লাভ। গুরুর নির্দেশমতো রামায়ণ

রচনা চেষ্টা ,শেষে ধর্মমঙ্গল লেখার নির্দেশ প্রাপ্তি ইত্যাদি তথ্যসমূহ.।ঘনরামের কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল তবে অনেক স্থলে 'শ্রী ধর্ম সংগীত', ' মধুর ভারতী' ইত্যাদি নামেও অভিহিত কাব্যটি ২৪টি সর্গে ও বিভিন্ন পালায় বিন্যস্ত। মোট শ্লোক সংখ্যা ৯১৪৭টি। কাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত-

ক) হরিশচন্দ্র - লুই চন্দ্রের কাহিনী

খ) লাউসেনের কাহিনী।

কাব্যের আয়তন প্রায় মহাকাব্যের মত বিশাল। যদিও ভাব-গাম্ভীর্যে ও রচনা ভঙ্গিতে পাঁচালীর চিহ্ন সুস্পষ্ট।

কাব্যের স্থাপন পালায় 'নবীন নীরদশ্যাম জিনি কত কোটি কাম ' ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রেম জলরাশির উপর তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শেষ প্রস্থানের চিত্ররূপ বর্ণনা জীবন্ত। কিন্তু কবি দৃষ্টি রোমান্টিক কল্পনায় ভাবস্নাত হয়নি বরং লাউসেনের পৌরুষদীপ্ত জীবনের পরিচয়, তাঁর যোদ্ধা রূপের বিবরণে এই কাব্য উদ্দীপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কবির ঘনরামের শব্দ সচেতন কল্পনা শক্তি পাঠককে বিস্মিত করে:

'টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ ঢাল চাল ঢ়ন ঢ়ন

ঝন্ ঝান্ ঘন রণ ন।

দিঘিতে বিপরীত চৌদিকে চমকিত

মামুদা ভাবে পরমাদ।।'

ধর্মের বরপুত্র লাউসেন যেমন বীরযোদ্ধা তেমনি মানবিক গুণে মণ্ডিত । পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্ম পক্ষের নিষ্ঠা, নির্ভীকতা এবং চরিত্র রক্ষায় শুচিতায় সদা ভাস্বর। লাউসেন জননী রঞ্জাবতী স্নেহময়ী পুত্রের কল্যাণ কামনায় মগ্ন মাতৃমূর্তি:

'কালি অতি শুভ দিন গৌড়ে তুমি যাবে।

অভাগীর রন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে।।'

পক্ষান্তরে লাউসেন জায়া কলিঙ্গা কানাড়ার মধ্যে বীরত্বের দিকটিকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।শঠতা ক্রুরতা ও প্রতিহিংসায় মহামদ চরিত্রটিও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।দুর্মুখা

দাসী , কালু সেন, লখাই ডোম ,হরিহর বাইতি প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্র নির্মাণে ও কবি ঘনরাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন অর্থলোভী হরিহরের স্ত্রী প্রতি উক্তি:

‘হরিহর বলে শোনো বাইতির ঝি।

বসে কর বিলাস তোমার লাগে কি।।

ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।

অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাবো তোকে।।

অধর্মের বাধ্য বসু ধর্মের অকার্য।

আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য।।‘

লাউসেন ভ্রাতা কপূর সেনের চরিত্র নির্মাণে ও কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন ।জামতি নগরে বন্দী লাউসেনকে দেখে স্বার্থপর কর্পূর পালিয়ে যায়। পরে লাউসেন মুক্ত হলে সে ফিরে এসে দাদাকে বলে-

‘কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।

কালি কোথা ছিলে ভাই কি বা দশা ।।

কর্পূর বলেন যবে বন্দি হলে ভাই ।

রাতারাতি গেছেনু ধাওয়া ধাই ।।

রাজার আদ্দানা করি জামতি লুঠিতে ।

লইয়াছি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে ।।

পথে শুনি বিজয়, বিদায় দেনু ভাই ।

লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ।।’

ধর্মমঙ্গল মুখ্যত বীর রসাত্মক কাব্য।তাই বীররসের প্রাধান্য এই কাব্যে বিশেষভাবে দেখা যায়; যেমন-

'মারমার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।

সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ।।

দুদল করে হানাহানি।।'

বীভৎস রসের বর্ণনায় ও শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। যেমন ডাকিনি পেত্নীরা-

'কাঁচা মাংস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে।

মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে।।'

কিন্তু করুন রসের বর্ণনায় আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস:

'শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে।

নিশায় নিধণ রণে, পিতামাতা বন্ধু গণে

দেখিতে না পেনু শেষকালে।।'

ঘনরামের রচনারীতি সংস্কৃত- নির্ভর ও মার্জিত। তাঁর কৌতুকরসে স্থূলতা থাকলেও ভাঁড়ামী নেই, বরং তির্যকতা আছে।

' চঞ্চল চরণ চারি চলনি

নির্মল বরণ বাড়ি বিনোদ মন্দির'

প্রভৃতি অনুপ্রাস অলংকারে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও দেখা যায় ঘনরামের কাব্য ত্রুটিমুক্ত নয়। এই কাব্যের ত্রুটি দেখা যায়: ক) বিশাল আয়তন এবং সুবিপুল ঘটনাসমূহ সুগ্রথিত করে প্রকাশের মতো উপযুক্ত কবিত্বশক্তি ও নৈপুণ্যের অভাব।

খ) অলৌকিক ঘটনা সমাবেশের ফলে কাব্যটির প্রধান চরিত্র লাউসেনের বীরত্ব ও শক্তি প্রকাশ অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হয়; যেমন তাঁর মৃত শিশুর মুখ দিয়ে কথা বলানো, নিজের মৃত সৈন্যদের জীবিত করা, পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানো ইত্যাদি।

গ) শাস্ত্রের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত দানে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা অব্যক্ত থেকে যায়।

ঘ) বর্ণনার মধ্যে এক যুদ্ধ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্র ক্লান্তিকর নীরস বিবৃতি চোখে পড়ে।

তবে সমকালের রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনের বাস্তব পরিচয়ে এই কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য ।ধর্মমঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে ঘনরামের গ্রন্থই প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে।

শ্যাম পন্ডিত: ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই রাঢ় অঞ্চলের বাসিন্দা। তাই বীরভূম বর্ধমান অঞ্চল থেকেই তার অধিকাংশ পুঁথি পাওয়া গেছে। কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে ধর্ম দেবতার আরেক নাম নিরঞ্জনের নামে- ' নিরঞ্জন মন্ডল'।এই পুঁথি গুলি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে খন্ডিত। তাছাড়া অন্যান্য কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত অংশও তার মধ্যে বিদ্যমান। সেই কারণে রচনায় প্রাচীনত্ব এবং আঞ্চলিকতা থাকলেও অন্যান্য কবির রচনাংশ থেকে পৃথক করা অসম্ভব। শ্যাম পন্ডিত লাউসেনের আত্মবিবরণীতে বল্লাল সেনের উল্লেখ করেছেন।

ধর্মদাস: শ্যাম পন্ডিত এর কাব্যে আত্মগোপন করে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এই কবি 'ধর্মদাস' ভনিতায়। এঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'। কবি নিজে ছিলেন বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। জন্মস্থান বসর গ্রাম। তবে ড. সুকুমার সেন বৈদ্য জাতিভুক্ত মন্দারণবাসি আর এক ধর্মদাস এর নাম উল্লেখ করেছেন। ধর্মদাসের 'নিরঞ্জন মঙ্গল'কাব্যে সৃষ্টি পত্তন বর্ণনা বিস্তৃত। রচনারীতি সহজ ও বাস্তবধর্মী। ইনি প্রধানত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের আদর্শেই কাহিনী বিবৃতি করেছেন।

রামদাস আদক: ১৩১১ সনে জনৈক মধুসূদন অধিকারী 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় 'অনাদি মঙ্গলের কবি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানেই প্রথম কবি রামদাস আদকের নাম জানা যায়। তিনি কবি রচিত পুথি সবটা সংগ্রহ করতে পারেন নি। মৌখিকভাবে সংগৃহীত বাকি অংশ শুনেছিলেন রামদাসের উত্তর পুরুষদের কাছে। আরও পরে ১৩৪৫ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে গবেষক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বসন্ত বাবুরও এই কাব্য সংস্থানের উৎস ছিল কবির বংশধরদের স্মৃতিবাহিত পয়ার-ত্রিপদীতে আবদ্ধ কবিতাবলী এবং গায়েনদের ব্যবহৃত একটি খাতা। আবার এই খাতায় রূপরামের রচনার সঙ্গে এক অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। যে কারণে ড. সুকুমার সেন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন- " ইহার বারো আনাই রূপরামের শুধু ভণিতা রামদাসের।" দ্বিতীয়ত,

মধুসূদন অধিকারীর সংগৃহীত 'আত্মপরিচয়' অংশের সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তৃতীয়ত, রামদাস তাঁর আত্মপরিচয়ে ধর্ম ঠাকুরকে বলেছিলেন:

'পাঠ করি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া

গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া।।'

কিন্তু বসন্ত বাবুর পুঁথিতে রামদাস পণ্ডিত বাগবৈদগ্ধ্যের পরিচয়ে শক্তিমান।কাজেই " রামদাস আদকের মুদ্রিত অনাদি মঙ্গল সর্বাংশে প্রাচীন কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়"।(' বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

কবি রামদাসের কাব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ হল আত্মজীবনী।ভুরসুট পরগনার রাজা প্রতাপনারায়নের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের কাছে হায়াৎপুর গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। কবিরা ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। পিতার নাম রঘুনন্দন। শৈশবেই কবি মাতৃহীন। পৌষের কিস্তি খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারার অজুহাতে জমিদারের লোক চৈতন্য সামন্ত কবিকে তিনদিন কয়েদ করে রাখে। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যান মামার বাড়ি। পথে দেখেন শঙ্খচিল, মাথার উপরে মালা ইত্যাদি নানাবিধ শুভ চিহ্ন এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের ছদ্মবেশে সিপাহী।সিপাহী বালক- কবির মাথায় মোট চাপিয়ে তাড়না করে, কিন্তু শেষে অদৃশ্য হয়। তারপর ব্রাহ্মণ বেশে আবার ধর্ম এসে দেখা দিয়ে কবিকে বলেন:

'ধর্ম বলে রামদাস মূর্খ নও তুমি।

জারগ্রামের কালু বামন হই আমি।।

আসরে জুড়িবে গীত আমা সঙরণে।

মুখেতে ঠেকিলে গীত চাইও কর পানে।।

এত বলি ঠাকুর ধরিল তারি কর।

মহামন্ত্র লিখি দিল দ্বাদশ অক্ষর।।'

রামদাসের কাব্যে যে সন তারিখের উল্লেখ দেখা যায়, তার ভিত্তিতে মনে হয় ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কাব্যটি লেখা শেষ হয়েছিল। রামদাসের 'অনাদ মঙ্গল' কাব্যের ভাষারীতি পরিচ্ছন্ন ও কবিত্বময়, যেমন-

'চিনিতে রোপিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।

জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে।।'

কিংবা-

'যুবক স্বামীর কথা পীযূষের কণ।

বৃদ্ধ সোয়ামীর কথা ছেঁচা ঘায়ে নুন।।'

তবে ভাষায় আধুনিক স্বচ্ছতা এবং কবি রূপরামের আছন্নতায় কবি রামদাসের কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত থেকে গেছে সমালোচকদের কাছে।

সীতারাম দাস:- অষ্টাদশ শতকের প্রাপ্ত পুঁথির ভিত্তিতে আলোচিত এই কবির কাব্য আত্মকাহিনী অংশটুকুই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।কবির পৈত্রিক বাড়ি বর্ধমান জেলা খণ্ডঘোষের অন্তর্গত সুখ সাগর বা শম্ভুসাগর গ্রাম। তবে কবির জন্ম মাতুলালয়ে, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে। পিতার নাম দেবীদাস, মায়ের নাম কেশবতী। গজলক্ষী ছিলেন গৃহদেবী।মল্লভূমিতে রচিত তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১০০৪ বঙ্গাব্দ ধরে ১৬৯৮ থেকে ৯৯ খ্রিস্টাব্দ বলে মনে করা হয়।

ডোমের ঠাকুর ধর্মের পূজাপ্রচারে ও কাব্য রচনায় প্রথমে কবি ছিলেন অনিচ্ছুক। কিন্তু ধর্ম ঠাকুরের 'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে' প্রতিশ্রুতি পেয়ে এবং স্বপ্নে গজলক্ষী অনুমতি পেয়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইন্দাস গ্রামে পুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিতও কবিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন ।কবির আত্মকাহিনীর সাক্ষ্যে ৪০দিনে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

সীতা রামের ক্যাবের কাহিনী অংশ নতুনত্ব বর্জিত। তবে রচনারীতি সহজ এবং বিবৃতিমূলক। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণনা চিত্রধর্মী এবং শব্দময়, যেমন বৈশাখের মধ্যাহ্নে বনের শোভা বর্ণনা:

'বৈশাখ সময় তার কুড়চির ফুল।

ঝুপ ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল।।

কত কত কাননে হরিণী কালসার।

ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার।।'

শোনা যায়, সীতারাম মনসামঙ্গল কাব্যও লিখেছিলেন।

যদুনাথ বা যাদব নাথ পন্ডিত:ধর্মমঙ্গল কাব্য শাখার এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর জন্ম হাওড়া জেলার দোসগ্রামে (বর্তমানে ডোমজুর গ্রাম)।ড. পঞ্চানন মন্ডল এক তাঁতির বাড়ি থেকে পুঁথিটি উদ্ধার করে বিশ্বভারতী থেকে 'ধর্মপুরাণ' নামে প্রকাশ করেন। কবির পিতার নাম ধর্মদাস, পিতামহ বিনোদ দাস। কবি খুব সম্ভবত ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত।কিন্তু তবু যাদবনাথ পণ্ডিতের কাব্যের অসাম্প্রদায়িক পরিচয় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এখানে যেমন আছে চৈতন্য বন্দনা, চণ্ডীর বন্দনা তেমনি ধর্ম নিরঞ্জনের দশ অবতার বর্ণনায় বৃদ্ধকল্কি ও ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে পতিশাহ রূপে দিল্লিতে শাসনের কথা:

'দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার।

সত্য শূন্য নাম তার মেলেস্চ আকার।।

যবন রূপে দিল্লিয়ে কৈলে পাৎসাই ঠাকুরালি।

যবন রূপে একাকার সংহারিলে কলি।।'

তাঁর কাব্যে বর্ধমান রাজ কৃষ্ণ রামের উল্লেখ দেখে মনে হয় ১১০৩ বঙ্গাব্দে বা ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাব্যটি সমাপ্ত হয়।

যদুনাথ পরবর্তী কবিদের মতো লাউসেনের কাহিনী শোনাতে চান নি। এখানে রামাই পন্ডিত এবং হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কথা বলা হয়েছে। করুনরস সৃষ্টিতে এবং লুইচন্দ্রের মাতা মদনার বাৎসল্যময়ী চরিত্র নির্মাণে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রচনারীতি সংযত আবেগ ও পান্ডিত্যের পরিচয় উজ্জ্বল ।বস্তুত কাহিনীর নতুনত্বেই তিনি স্মরণীয়।

ময়ূর ভট্ট:- ধর্মমঙ্গলের এই প্রাচীন কবির কথা সব কবি বলেছেন। এঁর লেখা পুঁথিও পাওয়া যায়নি।তবু মনে হয় তিনি এই শাখার আদি কবি ।১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামে একটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এই গ্রন্থটি ময়ূরভট্টের নয়। এই পুঁথিটি আসলে অষ্টাদশ শতকের রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ।

খেলারাম চক্রবর্তী: ১৩০২ সালে হারাধন দত্ত 'জন্মভূমি' জ্যৈষ্ঠসংখ্যার 'গড় মান্দারণ ও প্রাচীন জাহানারা দের ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে এই কবির কথা লেখেন। পুঁথিটি তিনি হাতে পাননি ,তবে হুগলি জেলার আরামবাগ এর নিকট বদনগঞ্জ এর কাছে শ্যামবাজার গ্রামে এক জেলে পুরোহিতের কাছে দেখেছিলেন কাব্যের নাম 'গৌড়কাব্য'।

কাব্যের রচনাকাল ১৪৪৯ শকাব্দ কার্তিক মাস বা ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু সপ্তদশ শতকের আগে কোন ধর্ম মঙ্গলকাব্য ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ফলে অনুমান করা হয়, এই গ্রন্থ জাল।

পরবর্তীকালে ড. পঞ্চানন মন্ডল ওই অঞ্চলে খেলারামের নাম শোনেন। গবেষকরা দেখেন ওই নামে এক কবি ছিলেন। কেননা রুপরামের কাব্যে এবং যদুনাথের কাব্যে খেলারাম নামক কবির নাম আছে। তবে খেলারাম গায়েন কবি কিনা তা নির্ণয় করা এখনো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অষ্টাদশ শতকে ধর্মমঙ্গলের অপ্রধান কবি গোষ্ঠী:মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য শাখার জন্ম সপ্তদশ শতক হলেও এর বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে অষ্টাদশ শতকে এই শতকের উল্লেখযোগ্য ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা হলেন যথাক্রমে

১) ঘনরামচক্রবর্তী - আদিনিবাস কৃষ্ণপুর (বর্ধমান),কাব্য রচনাকাল ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ।

২)নরসিংহ বসু – বাসস্থান বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রামে ,রচনাকাল ১৭১৪- ১৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩) রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা দ্বিজরামচন্দ্র- বাসস্থান-চামোট,বিষ্ণুপুর রচনাকাল ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

৪) সহদেব চক্রবর্তী- আদিনিবাস হুগলির রাধানগর, রচনাকাল ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দ।

৫) প্রভুরা মুখোপাধ্যায়- বাসস্থানের উল্লেখ নেই রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

৬)হৃদয়রাম সাউ- বাসস্থান বর্ধমানের খুরুল গ্রাম, পরে স্থান পরিবর্তন হয় বীরভূমের উচকরণ গ্রামে। রচনাকাল ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ।

৭) মানিকরাম গাঙ্গুলী- বসবাস হুগলির বেলডিহা গ্রাম ,কাব্য রচনা কাল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ।

৮) রামকান্ত রায়- আদি নিবাস বর্ধমান জেলার সেহারা গ্রাম, রচনাকাল ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

এই ৮ জন কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দুজন -ঘনরাম চক্রবর্তী এবং মানিকরাম গাঙ্গুলী। এর মধ্যে ঘনরামের অনাদিমঙ্গল বা শ্রীধর্ম্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর ধ্রুপদী সাহিত্য বলে পরিগণিত হতে পারে। এমন কথাও কেউ বলেছেন।

মানিক রাম গাঙ্গুলী: ইনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের অদ্বিতীয় কবি না হলেও তাঁর স্থান অতৃতীয় বলা যেতে পারে। কাব্যটি লোক চিত্র জয়ী এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ।বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

ক)ধর্ম পূজার এক স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর কাব্যে আছে। ধর্মের উৎস কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব কে স্বীকার করে কবি তাঁকে 'শূন্যমূর্তি' বলেছেন।

'শূন্যমূর্তি স্মরণ করিয়া সাতবার

অশ্ব চেপে লাউসেন হল্য আগুসার।।'

অথবা

'সবিস্ময়ে লাউসেন শূন্যমূর্তি ভাবে।

তুরঙ্গ উপরে তূর্ণ আরোহন করে।।'

বলাবাহুল্য , এই শূন্যমূর্তি হিন্দু দেব-দেবী নন, ইনি বৌদ্ধদের শূন্য বা মহাশূন্য তত্ত্বের প্রকাশ রূপ।

খ) মানিকের কাব্যে ডোম , হাড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষদের দ্বারা ধর্ম পূজার বিবরণ আছে।ধর্মের পুরোহিতরাও প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন

'কম্মকার নাপিত মালাকার।

কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর।।'

গ) তাঁর কাব্যে কালাচাঁদ ধর্মের কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন যে নুয়াদা ভাঙ্গা মোড়ের পাশে গোয়ালুগ্রামে এই কালাচাঁদ রূপী ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন । এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিতরা সকলে গোয়ালা শ্রেণিভুক্ত। মানিক রামের কাব্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

মন্তব্য

ঘ) ভাষায়, শব্দসজ্জায়, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে কাব্য কুশলতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বিষয় সন্নিবেশে মৌলিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। মানিকরামের সমস্ত কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত পুরান -উপপুরাণের কাহিনী নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঙ) হরিহর বাইতি , কালু ডোম , লখা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কনে কবির চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন -ধর্মের পূজা দান উপলক্ষে লাউসেন রাজধানী ময়না ভার কালুর হাকন্দে জায়।এই সময় গৌড়ের রাজা উৎকোচ দিয়ে কালুকে বশীভূত করে ময়না দখলে উদ্যত হলে তার পত্নী লখা তাকে তীব্র শ্লেষে তিরস্কার করে এইভাবে:

'এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে।

কাঞ্চন বেচবে কেন কাঁচের বদলে।।

ধিক ধিক তোমার বীরত্বে ধিক ধিক।

ভেকের নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক।।

সুধির সেনের নুন সাধিবো কামনা।

মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না।'

এ ধরনের চরিত্র নির্মাণে দক্ষতা তাঁর কাব্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। মানিক গাঙ্গুলীর কাজ ত্রুটিমুক্ত নয়। সেটি হল আদিরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর কাব্যে দেখা যায়। বিশেষ করে 'সুরিক্ষা' পালায় তাঁর লেখনী শ্লীলতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে।

১২.৪:ধর্মমঙ্গল: রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য গুলির মধ্যে ধর্মমঙ্গলের বিশেষ বিশেষত্ব হল আঞ্চলিকতা। কেননা সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে নয় পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন ছিল। আর ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য নিয়ে শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার ধারা।ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পন্ডিত সমালোচক ও গবেষকগণ ধর্মমঙ্গল কাব্যে এবং ধর্ম ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা করেছেন। তবে পূর্বেই উল্লেখ করেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শিক্ষিত বাঙালির কাছে সর্বপ্রথম ধর্ম ঠাকুরের পরিচয় এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য কাহিনী যথাযথভাবে তুলে ধরেন। মূলত দক্ষিন রাঢ়ের

জীবন- ইতিহাস নির্ভর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সার্বিক বিচার করে একাধিক পণ্ডিত ও বিদগ্ধ সমালোচক ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলে উল্লেখ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যীয় রীতি মেনেই ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু এর বিশেষত্ব হল কিছুটা হলেও দেবতা কেন্দ্রিকতা ছেড়ে বাস্তব মুখীনতা। বাংলাদেশে ও বাঙালি জাতির সমাজ ইতিহাসের একটি বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে । এর পাশাপাশি রাঢ় বাংলার সাধারন জনজীবনের সংস্কৃতির উজ্জ্বলতম একটি অধ্যায় কাব্যে ফুটে উঠেছে। কেননা ধর্মমঙ্গল কাব্যে অধিকাংশ কবি মূলত দক্ষিণ রাঢ়ভূমে জাত কবি। বিশেষত সপ্তদশ শতাব্দীর রূপরাম চক্রবর্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম চক্রবর্তী উভয়ই ধর্মমঙ্গলের সার্থক কবি এবং উভয়েই দক্ষিণ দামদরের তীরবর্তী রাঢ় অঞ্চলের কবি। এজন্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের রাঢ় অঞ্চলের জনজীবনের অনেক অবলুপ্ত ইতিহাস কাব্যের স্থানে পেয়েছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও রাঢ় বঙ্গের মানুষের জীবনের নানা উত্থান-পতনের বিবর্তন ধর্মী ইতিহাস ফুটে উঠেছে।নৃতাত্ত্বিক ধারণা অনুসারী মানবজাতির বিবর্তনের ধারায় জানা যায় - আর্য ও আর্যেতর সভ্যতার মিলনের আগে রাঢ় অঞ্চলে আদিম অস্ট্রিক সভ্যতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। অস্ট্রিকগোষ্ঠীর মানুষেরাই হাড়ি , বাগদি , ডোম , প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের রূপান্তরিত হয়েছে। এই অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের মধ্যেই এই ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলন ছিল।আর অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের জীবন বৃত্তান্ত নিয়েই গড়ে উঠেছে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পটভূমি প্রেক্ষিত ভূমি। একারণেই ধর্মমঙ্গল কে একান্তভাবেই রাঢ়বঙ্গের জীবনভাষ্য বা রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা যায়।

বিশ্ব সাহিত্য বিচারে মহাকাব্যের সন্ধান করলে দেখা যায় গ্রিসের জীবন বৈশিষ্ট্য নির্ভর জাতির ওঠা-নামার বিশেষ বিশেষ ইতিহাস নিয়ে রচিত হয়েছে হোমারের মহাকাব্য ‘ইলিয়াড’ ও ‘ওডিসি’; আর ভারতীয় জীবন ধারার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে বেদব্যাসের ‘মহাভারত’ এবং বাল্মিকীর ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যে। অর্থাৎ সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে মহাকাব্যের কাহিনীতে দেখা যাবে একটি সমগ্র জাতির জাতীয় উত্থান-পতন মূলক বীরত্বব্যঞ্জক নানা রহস্য সমৃদ্ধ বিশেষ জীবনালেখ্য ।পৌরাণিকতা মহাকাব্যের কাহিনীকে বিশেষ মাত্রা দেয়। এছাড়া মহাকাব্যের চরিত্র হবে ধীর ধীরোদাত্ত । এজন্য মহাকাব্যে বীররসের পাশাপাশি শৃঙ্গার রস ও করুণ রসের প্রাধান্য বজায় থাকবে। অতীত ইতিহাস গাথা সম্বলিত এই মহাকাব্যের কাহিনীগুলিতে এক ধরনের এডভেঞ্চার ধর্মও

লুকিয়ে থাকে। যখন কোন কাব্যে নির্দিষ্ট জনজীবনের বসবাস ভূমির নিরিখে ভৌগোলিক , ঐতিহাসিক , ও রাষ্ট্রীক ভাবে কোন জাতির জীবনবোধ প্রতিফলিত হয় ,তখন তা জাতীয় কাব্য বলে বিবেচিত হতে পারে ।এই বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী গত বিচার করা যেতে পারে। ধর্ম ঠাকুর ও তাঁর পূজা প্রচার পদ্ধতির লক্ষ্যেই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত। প্রচলিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী অপেক্ষা এই কাব্যের কাহিনী বিশাল ও ব্যাপক উল্লেখিত দুটি মঙ্গলকাব্যের বিশেষ অঞ্চলে , বিশেষ গোষ্ঠী জীবনের ইতিহাস বর্ণিত নেই। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে কাহিনী কাঠামো উপাদান হিসাবে রাঢ় অঞ্চলের ডোম , বাগদি , দুলে ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন কথাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও মধ্যযুগের রোমাঞ্চের মত এর মূল বক্তব্য হলো যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীররস এবং ধর্ম ঠাকুরের পূজায় যারা নিয়োজিত তাঁরা হলেন রাঢ় অঞ্চলের ব্রাহ্মণ। তারা রাঢ় অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ।এই অন্ত্যজ শ্রেণির দেবতাদের ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য রচনায় এই কাব্য করা হয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী নিজে ছিলেন রাঢ় অঞ্চলের মানুষ। তিনি তাঁর কাব্যে রাঢ় ভূমির অবলুপ্ত ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। তবে এটা ঠিক যে পুচ্ছানুগ্রাহীতার ফলে তাদের পাত্র-পাত্রীদের আচরণ ও রীতিনীতি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য রাঢ় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছে। তাই কাব্যটি কে ‘national epic of Rarha’ বলা হয়ে থাকে।

এটা ঠিক যে কাব্যের কাহিনীতে পুরান এবং রাঢ় অঞ্চলের লোকশ্রুতি মিশ্রণ ঘটেছে তবে কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিফলিত। যেমন গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদ রাজ্য শাসনের সর্বেসর্বা হয়ে ভাগিনা লাউসেনের উপর অত্যাচার প্রবল অত্যাচার শুরু করে। এই ঘটনার আংশিক সত্যতা আছে যদি এর কাহিনী সত্য হয় তাহলে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী কে শুধু রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। কারণ লাউসেন কে অবলম্বন করে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তা পুরোপুরি রাঢ় বঙ্গের সীমাবদ্ধ নয় এটা কামরূপ থেকে কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত বিস্তারিত। দ্বিতীয়ত,ব্রাহ্মণ ও অভিজাত সমাজে ধর্ম ঠাকুরের উপাসনা তেমন একটা প্রভাব ফেলতে পারে না । ধর্ম ঠাকুর এখনো ডোমদের ঠাকুর বলে প্রচলিত ।তাই রাঢ়ে সমগ্র মানুষের কাব্য হিসেবে ধর্মমঙ্গলের গুরুত্ব স্বীকার করা যায় না।

রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা যায় কিনা এই নিয়ে মতামত থাকলেও এটা ঠিক যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সামাজিক উপাদান এর মত রাঢ়বঙ্গের একটি সামাজিক প্রতিচ্ছবি আছে। গৌড় এর

কথা বলা হলে গৌড় এখানে মুখ্য নয় ।যে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে সেই চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য রাঢ়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতি চিত্রণেও কবি রাঢ়বঙ্গ কে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন । যেমন পাখির বর্ণনায় তিনি রাঢ়ের পাখিদের কথা বলেছেন-

'কাক কঞ্চ কোকিল কৌতুকে কাল পেঁচা।

খঞ্জনী খঞ্জন খগ আর কাদাখোঁচা।।'

তাই কাব্যটিকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বললে খুব একটা দ্বিধা থাকার কথা নয়।

মঙ্গলকাব্য ধারায় অর্বাচীন এই শাখাটির উৎসভূমি রাঢ় অঞ্চল রাঢ় অঞ্চলের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে অবলম্বন করে এই কাব্যের কাহিনী কাঠামো রচিত হয়েছে। রাঢ় অঞ্চল হলো পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুর এর সীমানা দ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ । বর্তমান এই অঞ্চলটি হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের কিছুটা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা কাব্যটি কে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে ।বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

১) শ্রীধর্ম্মমঙ্গল –এ এমন কিছু ছবি আছে যার মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের অবলুপ্ত ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায় ।এই কাব্যে বর্ণিত স্থান ঘটনা ও চরিত্র বিচারে রাঢ় অঞ্চলের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। লাউসেনের কাহিনী সঙ্গে পাল যুগের ইতিহাসের সংযোগ আছে। স্থানীয় গ্রাম জনপদ ও নদ-নদীর যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা একান্ত ভাবে রাঢ়ভূমির। যেমন মঙ্গলকোট ,বর্ধমান, মান্দারণ, গঙ্গাবাটী ,উচালন ইত্যাদি জনপদ ও দামোদর, দারকেশ্বর, কালিন্দী ইত্যাদি নদ-নদীর কথা বলা হয়েছে। মহামান্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ নামক একসামন্ত রাজার বর্ধমান জেলার ঢেক্করী নামক স্থানে রাজত্ব করার কথা ড. নিরঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থের স্বীকার করেছেন-

"ঢেক্করীর ঈশ্বর ঘোষ যে মহা মাণ্ডলিক ছিলেন তাহার রামগঞ্জ লিপিতে সপ্রমাণ। ঢেক্করীর এক মন্ডলাধিপতি রামপালের সামন্ত রূপে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর ঘোষ, খুব সম্ভব সেন -রাষ্ট্রেরই অন্যতম সামন্ত ছিলেন।" তিনি আরো জানিয়েছেন- 'কেশব সেনের ইদিলপুর লিপিতে মহামহওক বা মহামওক নামীয় রাজপুরুষের উল্লেখ পাইতেছি ....মহামওক মনে হইতেছে সেন -রাষ্ট্রেরও রাজার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী।"

সম্ভবত এই মহামহওকই ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মহামদ চরিত্র হয়েছেন। সুতরাং এর ঐতিহাসিকতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

২) রাঢ় ভূমির বিস্তৃত অঞ্চলে আজও ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে এই ঠাকুরের উদ্ভব সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন আর্যদের আগে অনার্যরা যে সূর্য দেবতার পূজা করতেন তিনি কালক্রমে ধর্ম দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। আবার কারো মতে বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যমূর্তিই হলেন ধর্ম ঠাকুর। তিনি কখনো কালুরায় ,ডোম রায়, বাঁকুড়া রায়, প্রভৃতি নামে চিহ্নিত। সে নাম গুলির সঙ্গে রাঢ় অঞ্চলের পরিচিতি। তাছাড়া ধর্মপূজার যে ডোম , জেলে , নাপিত বাগদী প্রভৃতি তারাও রাঢ় অঞ্চলেরই লোক।আজও পর্যন্ত ধর্ম ঠাকুরের পূজায় ডোম শ্রেণীর আধিপত্য।

৩) ধর্মমঙ্গল কাব্যের একাধিক কবি ময়ূরভট্ট, মানিগ্রাম গাঙ্গুলী, রূপরাম , খেলারাম প্রমুখ কবিরা রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসী। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা তাঁদের কাব্যে রাঢ় অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরেছেন ।

৪) রাঢ় অঞ্চলের লোকেদের ভাষা ব্যবহারের চিত্তাকর্ষক নিদর্শন রেঢ়ো বুলি।শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাখাই এর উক্তিতে পাওয়া যায়-‘ জাতি রাঢ় মু রে করমে রাঢ় তু।’- ধর্মমঙ্গলের এই কবির উক্তি থেকেই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব যে, এই কাব্য স্থানীয় বীরত্ব বর্ণনা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাপন এর বাহন ছিল।

৫) শ্রী ধর্মমঙ্গল কাব্যের রাঢ় অঞ্চলের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গুলি স্থান পেয়েছে। অমার্জিত রূঢ়তা , উচ্ছ্বাস উদ্দমতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি রাঢ় সমাজের নিম্নসমাজের পরিচয়বাহী, যেমন লখাই তার পুত্রকে বলেছে-

‘মোর দুগ্ধ খেয়ে রণে ভীত হলি।

তু ব্যাটা তখনি হয়ে না মরলি।।’

৬) ধর্মমঙ্গল কাব্যে একাধিক খাদ্যের নাম আছে। যেগুলি রাঢ় অঞ্চলের মানুষের খাদ্য। যেমন-

‘শাক শুক্তা রন্ধনে সম্বরে সেই কাঠি।

বলকে পিঠালি জ্বাল মন্দ মন্দ তটি।।”

৭) রাঢ় অঞ্চলএকদা বীরের আবাসভূমি বলে পরিচিত ছিল ।এই অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরা অপার্থিব অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর না করে মনস্কাম সিদ্ধির জন্য আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেছে। সেই সূত্রে পরবর্তীকালে শক,হূণ ,মোগল, পাঠান প্রভৃতি গোষ্ঠীর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

৮) গৌড়েশ্বর এর প্রতি ইছাই ঘোষের প্রতিবাদ ও গোঁয়ারতুমি রাঢ়বঙ্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে।

বলা যায় বিশেষ অঞ্চলের অলোক জীবনের নির্ভর সাহিত্য হলেও ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দ,রূপরাম প্রভৃতি কবির হাতে আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে ।একই সঙ্গে দেশাত্মবোধ ও লোক জীবন ধারা মিশে গেছে এছাড়া ইছাই ঘোষের প্রতিবাদ কাব্যটি কে অন্য মর্যাদা দিয়েছে। তাই ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা হয়।

১২.৫: ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিকতা

প্রথমেই স্মরণ করি আশুতোষ ভট্টাচার্য তার বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন সৃষ্টি ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম ঠাকুরের প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ধর্মমঙ্গল নামক এক অতি সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য নামে এক শ্রেণীর আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল প্রধানত তাদের আদর্শের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে ইহার ভিত্তিক যেমন ঐতিহাসিক তেমনি রাঢ়ের জাতীয় চরিত্র ইহার অবলম্বন ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্যের পাশে রাঢ়ের বিশিষ্ট লোক চরিত্রের মহিমা ব্যাপ্ত হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে উক্ত সমালোচকের বক্তব্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী মূলত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা কবির কল্পনায় বিশেষভাবে পল্লবিত হয়েছে আমরা এই পল্লবী ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের চেষ্টা করব ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী ভাগে উল্লেখিত হয়েছে ধর্মপালের পুত্র গৌড়ের অধিপতি হলে সামন্ত রাজপুত্র বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মপালের পুত্রের নাম নেই

‘ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর

প্রসঙ্গে প্রসাবে পূর্ণ পাপ যায় দূর।

পৃথিবী পালিয়ে স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর

বীর্য বন্ধ পুত্র তার গৌড়ের ঈশ্বর।।'

সপ্তদশ শতাব্দীর কবি রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে সরাসরি নাম উল্লেখ নেই আর কিংবদন্তির কাহিনী হল কাব্যে উল্লেখিত গৌড়েশ্বর হলেন সিন্ধু বা সমুদ্রে ঔরসে রাণী বলল ভার গর্ভজাত জারজ সন্তান এছাড়া আরো অনেক কিংবদন্তি আছে তবে ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর কে তার পরিচয় স্পষ্ট নয়।অন্যদিকের কাহিনী ধর্মপালের পুত্র দেবপাল আনুমানিক ৮১০ থেকে ৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ বিজয়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে, আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন লাউসেন ও বিদ্রোহী হোসেনের হাতে পরাস্ত হয়েছিলেন এটা তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। বরং ইতিহাসে প্রমাণ মেলে রাঢ়ের সামন্ত রাজাদের সঙ্গে পাল রাজাদের প্রায়শই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। সম্ভবত মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য গুলি পাল রাজাদের রাঢ়ের সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ দমনে কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে এটাকে মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বলে উল্লেখ করা যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তিকে স্বীকার করলেও তার চরিত্রের যথাযথ ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে বাংলা পঞ্জিকার কলিকালের রাজচক্রবর্তীদিকের মধ্যে যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে লাউসেনের নামও উল্লেখ করা হয়। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে লবসেন গৌড়ের রাজা ছিলেন এবং জনশ্রুতি অনুসারে পাল রাজ্ যক্ষপালের মন্ত্রী সিংহাসনচ্যুত করে রাজা হয়েছিলেন। কিন্তু গবেষণায় যক্ষ পালের নাম পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বর্ধমান জেলায় অজয় নদীর দক্ষিণে ইছাই ঘোষের দেউল ও এর কাছে 'লাউসেন কুন্ড' পুকুর আছে সে অঞ্চলের ডোমেরা ১৩ই বৈশাখ এই পুকুরে স্নান করে স্বজাতির কালুবীরের তর্পণ করে। এছাড়া ধর্মের কাছে মানসিক করে রাঢ় ভূমিতে যে পুত্র সন্তান লাভ হয় তার নাম রাখা হয় লুইধর কিংবা লাউসেন। এ সকল কারণে অনুমান করা হয় লাউসেন অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না।

অন্য একটি সূত্র অনুসারে গৌড়ের রাজা দেবপাল তার বিজিত রাজ্যের সামন্ত রাজা নিযুক্ত করেছিলেন লাউসেনকে এবং তার রাজধানী ছিল ময়না নগরে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল থেকে জানা যায় মহানগর ভূমির একেবারে দক্ষিনে সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে অবস্থিত মহানগর বাটি সাগর সমীপ, এ থেকে অনুমেয় বর্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত তমলুক মহকুমার দক্ষিনভাগ মহানগর অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ময়না নামে একটি স্থান আছে। অন্যদিকে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুরই ময়না নগর। রামাই পন্ডিতের

বংশধরগণ এখানে দীর্ঘকাল বসবাস করেছেন। গ্রামের পাঁচ ধর্মশিক্ষা যাত্রাসিদ্ধি বাঁকুড়া ক্ষুদিরাম শীতল ও চাঁদ রায় প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী বিচার করে লাউসেন নিয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান নানা সময় হয়েছে এবং এ সম্পর্কে নানা অভিমত ব্যক্ত হয়েছে আবার অনেকে হরিশচন্দ্রের কাহিনী কে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তবে সর্বশেষে আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিচার করে প্রকাশ করেছেন রামাই পন্ডিত ও রঞ্জাবতী সমসাময়িক লোক তারা গৌড়েশ্বর দেবপালের সমসাময়িক বলে তাদেরকে খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর মানুষ বলে অনুমান করা যেতে পারে এর পরবর্তীকালে রামাই পন্ডিত ধর্ম ঠাকুরের পূজা পদ্ধতি রচনা করেন আর ময়ূর ভট্ট মঙ্গলকাব্য রীতি মেনে প্রথম ধর্মমঙ্গল কাহিনী মঙ্গলকাব্য রূপে তুলে ধরেন এই সূত্রেই সপ্তদশ শতাব্দীর কবিগন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

১২.৬: ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্যতা

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানত বৌদ্ধ পাল রাজবংশের রাজত্বকালে নাথ সম্প্রদায় নামে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায় এদেশে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোক শ্রুতি অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের 'নাথ সাহিত্য' নামে একটি সাম্প্রদায়িক সাহিত্য শাখা সৃষ্টি হয়েছিল ।সম্ভবত বাংলার বাইরে উদ্ভূত নাথ ধর্ম ক্রমে বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তীকালে সেন রাজত্বকালে সমাজে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটে এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাব প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। একদিকে আর্যদের আগমন ও তাদের সংস্কৃতির প্রসার; অন্যদিকে বাংলাদেশে অনার্য জাতির বসবাস ও তাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস এই দুইয়ের সংমিশ্রণে মিশ্রিত সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল ।পরিমণ্ডলে বাংলার লৌকিক দেবদেবী উদ্ভব ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং এই সকল দেবদেবীগণের আর্যীকরণ অর্থাৎ সাধারণের কাছে পূজা প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এর কাহিনী নিয়ে রচিত হলো মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ধারা মঙ্গলকাব্য গুলি।এই ধারার প্রধান প্রধান মঙ্গলকাব্য গুলি হল- মনসামঙ্গল ,কালিকামঙ্গল প্রভৃতি এবং অনেক অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা দেখব অন্যান্য মঙ্গলকাব্য গুলি অপেক্ষা ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য কোথায়।

মন্তব্য

বাংলাদেশের মধ্যযুগের মুসলমান শাসনের অধীন সমাজ ব্যবস্থা তে হিন্দু জীবনপ্রবাহ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এসময়ই চৈতন্য দেবের আবির্ভাব এ প্রেম ও ভক্তি ধর্মের প্রবাহে হিন্দুসমাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা অনেকটা স্বাভাবিক স্রোতে ফিরে আসে। এমন এক সামাজিক পটভূমিতে রচিত হতে শুরু করেছিল বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলি ।একদিকে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব ও আদর্শ ;অন্যদিকে লোকধর্মাশ্রয়ী অনার্য দেব দেবীর পূজা অর্চনা ও প্রচলিত ছড়া –ব্রতকথা- দুই এর সংমিশ্রণে গড়ে উঠল মঙ্গলকাব্যের ভিত্তিভূমি। সর্গ –প্রতিসর্গ মিল না থাকলেও দেব মাহাত্ম্য রাজবংশ বা অনুরূপ অভিজাত বংশের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলের কালকেতু গুজরাট নগর পত্তন করে রাজত্ব লাভ, ধর্মমঙ্গলের বীরপুরুষ লাউসেনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর পুরাণ অনুষঙ্গে মনসামঙ্গল কে 'পদ্মাপুরাণ' এবং ধর্মমঙ্গলের অংশবিশেষ কে 'হাকন্দপুরাণ ' ,'শূন্য পুরাণ' বা 'শ্রীধর্মপুরাণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এসব ভাবনার মধ্যেই ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য সন্ধান করা যায়।

বাংলা মঙ্গলকাব্য গুলি সংস্কৃতি পুরানাশ্রয়ী হওয়ার কারণে কাহিনী ভাগের সূচনায় দেব দেবীর লীলা এবং ঋষি বংশ রাজবংশের বিস্তারিত পরিচয় আছে। পুরাণ ও উপপুরাণ হিন্দুসমাজে বিশেষভাবে দৈবীমহিমার গ্রন্থ। এই অনুসরণে পদ্মাপুরাণের দেবী পদ্মবনে জাত মনসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যে । এই কাব্যে মনসা ও চাঁদ সদাগরের বিরোধ এবং সর্বশেষে মনসার জয় মর্ত্যে পূজা প্রচারের কাহিনী দিয়ে কাব্য শেষ হয়েছে ।অন্যদিকে মঙ্গলচণ্ডীর মহিমা মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা প্রতিষ্ঠার কাহিনী হল চণ্ডীমঙ্গল। দেবী দুর্গা চণ্ড নামক অসুরকে বিনাশ করে চণ্ডী হয়েছেন। এই কাহিনী বিবৃত। অন্যদিকে' ধর্মমঙ্গল'- এর কথা বলতে গেলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় ধর্ম সম্প্রদায় বা কাল্ট -এর কথা। বাংলাদেশের বিশেষ একটি অঞ্চলের বিশেষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বা বিশেষ এক জাতির মানুষ ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত। এখানে কাব্য ভাবনা গত দিক থেকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে ধর্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য ।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ভাগে দেখা যায় সামন্তরাজ কর্ণসেনের স্ত্রী রঞ্জাবতী ধর্ম ঠাকুরের সালে ভর দিলে পুত্র লাউসেনের জন্ম হয়েছে। সমগ্র কাহিনী লাউসেনের বীরত্বগাথা রূপ অ্যাডভেঞ্চারধর্মী রোমাঞ্চকর ।বর্ণনা কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণীয় লাউসেন যেন বাংলাদেশের রাঢ়ভূমির বীরত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এছাড়া কালু ডোম এবং লখা ডোম এর কাহিনী যেন সমগ্র রাঢ় বঙ্গের ডোম জাতির বীরত্বগাথার প্রতিনিধিত্ব করেছে । এর সঙ্গে মিশ্রিত

ধর্মঠাকুরের প্রভাব ও প্রতিপত্তি। কেননা ধর্ম ঠাকুরের আশীর্বাদে লাউসেনের জন্ম; গৌড়েশ্বর এর কাছে লাউসেন বীরত্ব প্রদর্শন করতে এলেই সংযোগ ঘটেছে কালু ডোম ও লখা ডোমের সঙ্গে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম ঠাকুরের পূজার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একেবারে আদিকাল থেকেই বাংলাদেশের অঞ্চল বিশেষ অনার্য ডোমসম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্ম ঠাকুরের পূজার প্রচলন ছিল। ঠাকুরের পৌরহিত্যে ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণদের পাওয়া যায়নি। এসকল বাংলা ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক পরিচয় কে স্পষ্ট করে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের থেকে ঐতিহাসিক বৃত্তে ধর্মমঙ্গল স্বতন্ত্র কাব্য ।কেননা ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র বর্গ গৌড়েশ্বর ,লাউসেন, ইছাই ঘোষ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে পরিগণিত। রাঢ়ের জনজীবনের সার্বিক চিত্র নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গলকে একারণেই অনেকের রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য অভিধায় ভূষিত করেছেন। সব মিলিয়ে মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় 'ধর্মমঙ্গল' স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রেখেছেন।

১২.৭: অনুশীলনী

১। ধর্ম ঠাকুরের উৎস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। ধর্মমঙ্গলের কবিদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৩। ধর্মমঙ্গল কাব্যকে কি রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা যায়, যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৪। ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচার করুন।

৫। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্বাতন্ত্র্যতা কোথায় আলোচনা করুন।

১২.৮: গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন

২. শ্রীধর্মমঙ্গল - শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু

৩. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস - ক্ষেত্র গুপ্ত

৫. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল - পীযূষ কান্তি মহাপাত্র

৭. বাঙালির ইতিহাস:আদি পর্ব - নীহাররঞ্জন রায়

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয় - ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৯. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পুরুষ - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একক ১৩। ঘনরাম চক্রবর্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য

বিন্যাসক্রম

১৩.১: কবি ঘনরাম চক্রবর্তী পরিচয় ও কাব্য প্রতিভা

১৩.২: ঘনরামের পৃষ্ঠপোষক ও রচনাকাল

১৩.৩: ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের পরিচয়

১৩.৪: ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের কাব্য নাম ও পালা বিন্যাস

১৩.৫: অনুশীলনী

১৩.৬: গ্রন্থপঞ্জি

১৩.১: কবি ঘনরাম চক্রবর্তী পরিচয় ও কাব্য প্রতিভা

বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর-কুকুড়া (কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে) গ্রামে ঘনরাম চক্রবর্তী-র জন্ম হয় ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। আজকের হিসাবে ৩৩৬ বছর আগে তাঁর জন্ম হয় । কবির পিতার নাম গৌরীকান্ত এবং মাতার নাম সীতাদেবী-

১. 'মাতা যার মহাদেবী সতী সাধবী সীতা।

কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা।।' (ঢেকুর পালা)

২. 'কবিবর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম।' (হরিশ্চন্দ্র পালা)

কবির বাবার দাদু ছিলেন কৌশল্যার বংশে পরমানন্দ ঠাকুর -

'ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।

ধনঞ্জয় সুত তার সংসারে প্রশংসে।।

তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।

তার সুত ঘনরাম গুরুপদে শ্রান্ত।।'

(শালে ভর পালা)

সুকুমার সেন ঘনরামের গুরু হিসাবে শ্রীরামদাসের কথা মনে করেছেন । তবে তাঁর গুরুর নাম শ্রীরামদাস- এটা মানা যায় না । আসলে রামভক্ত ছিলেন সেই সূত্রে লিখেছেন- 'শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।' কিম্বা- 'শ্রীরামকিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান।' যেমন 'আখড়া পালায়' পার্বতীকে জানিয়েছেন- 'শ্রীধম্মদাসের দাস আমি অতি দীন।' সুকুমার সেনের সূত্র মেনে নিলে তাঁর আর এক গুরু শ্রীধর্ম্মদাস বলতে হয়।

সুকুমার সেন তাঁর কিছুটা আত্মকাহিনি দিয়েছেন- সম্ভবত বর্তমান রায়না থানার অন্তর্গত রামবাটি গ্রামের টোলে ঘনরাম পড়াশোনা করতেন। রামবাটির সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের পূর্বপুরুষ কেউ একজন কবির গুরু ছিলেন। কথিত আছে একদিন পুজোর জন্য ফুল তুলতে গিয়ে বালক ঘনরামের পায়ে বেগুনের পাতার কাঁটা বিঁধে যায়, কাঁটা ছাড়িয়ে তিনি সেই হাতে ফুল তুলে এনে ভট্টাচার্যকে দেন। একদিন ভট্টাচার্য দেখলেন যে রঘুনাথ ঠাকুরের পায়ে বেগুনের কাঁটা লেগে আছে। পরে জানতে পারলেন যে ইষ্টদেবতা রঘুনাথ অভিমান করে গৃহত্যাগ করেছে। ভট্টাচার্যও নীলাচলগামী হলেন পথে রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁকে ছলনা করে জানালেন যে পুরী যাবার দরকার নেই। ভট্টাচার্য বাড়ি ফিরে ঘনরামকে রামায়ণ-পাঁচালী লিখতে বললেন। ঘনরাম রাম-বন্দনা লিখে।

পরের দিন দেখলেন তা ধর্মঠাকুরের বন্দনায় পরিণত হয়েছে। সেই রাতে স্বয়ং রামচন্দ্রের কাছে কবি 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' লেখার স্বপ্নদেশ পান। আসলে রাম ভক্ত কবি হিসাবে তাঁর রামায়ণ লেখারই কথা কিন্তু তিনি সম্ভবত গুরুর আদেশে ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন। তবে কোথায় বসে তিনি তাঁর ধর্মমঙ্গল লিখেছিলেন তা জানা যায় নি। তাঁর মৃত্যুর তারিখও জানা যায় নি।

ভট্টাচার্য আসলে কে? এ নিয়ে মত বিরোধ আছে । কবির উত্তরাধিকারদের ধারণ অনুযায়ী কৃষ্ণপুর কুকুড়া গ্রামের পূর্ব দিকে কলমীগোর পুকুরের পূর্ব পাড়ে কবির

একটি ফুলবাগিচা ছিল সেখানে একদিন পুজোর জন্য ফুল তুলতে গিয়ে বালক ঘনরামের পায়ে বেগুনের পাতার কাঁটা বিঁধে যায়, কাঁটা ছাড়িয়ে তিনি সেই হাতে ফুল তুলে এনে নিজেদের রঘুনাথের মন্দিরের পূজারী ভট্টাচার্যকে দেন। নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তাঁরা মন্দিরে একজন পূজারী রাখতেন। এই ভট্টাচার্য কবির গুরু হতে পারেন।

কাব্য প্রতিভা :

ঘনরাম যে প্রতিভাধর কবি ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী কাব্য রচনা করলেও তাঁর কাব্যে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। সুকুমার সেনের মতে – "ঘনরামের কাব্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যহীনতা।" গ্রাম্যহীনতা বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন? হয়তো ঔচিত্যের কথাই বলেছেন। কবি যে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন তা তাঁর পৌরাণিক প্রসঙ্গ ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। লোক অভিজ্ঞ কবি হিসাবে তিনি কাব্যে মানুষের আচার, ব্যবহার, সংস্কার ইত্যাদির ব্যবহার করেছেন। শব্দ ব্যবহারে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আগে তাঁর কাব্যে একই সঙ্গে আরবীফারসী-, সংস্কৃত, হিন্দী এবং দেশজ শব্দের প্রয়োগ বিস্ময়বহ। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল'' ছাড়া তিনি 'সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু' নামে একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখেছিলেন যেটি শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রী কালীপদ সিংহ মহাশয় সম্পাদনা করেছিলেন। বর্ধমান সাহিত্য সভা এই গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

১৩.২: ঘনরামের পৃষ্ঠপোষক ও রচনাকাল

পৃষ্ঠপোষক :

ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি তাঁর কাব্যটি রচনা করেন। রাজা কীর্তিচন্দ্র বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলাগড়ের রাজাদের। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করেন। কীর্তিচন্দ্র বিদ্যানুরাগীও ছিলেন তাই ঘনরামের মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনে রাজার নিজস্ব চতুষ্পাঠীতে পিতৃহারা ঘনরামকে পড়াশুনার সুযোগ করে দেন। পরে রাজার অর্থানুকুল্যে রচনা করনে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্য।

তিনি কীর্তিচন্দ্রের খুব প্রশংসা ও কল্যাণ কামনা করেছেন-

১। 'মহারাজ প্রতি প্রভু   দয়া না ছাড়িব কভু

নায়েকের করিবে কুশল।

গুরুপদে হয়ে যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন

বিরচিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ।।'

(স্থাপনা পালা)

২। 'অখিল বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী

কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রসগান।।'

(ঢেকুর পালা)

৩। 'ভুবনে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী

কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।'

(ঢেকুর পালা)

৪। 'শ্রীরামকিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান।

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।।'

(শালে ভর পালা)

৫।' মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।।'

(লাউসেন জন্ম পালা)

সমগ্র কাব্যে এইভাবে বারবার কবি ঘনরাম তার পৃষ্ঠপোষক বর্ধমান রাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের গুণকীর্তন করেছেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রই তাকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন।

ঘনরাম তাঁর কব্যে নায়কেরও মঙ্গল কামনা করেছেন। নায়েক' বলতে পালাকীর্তনে যারা গায়েনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে তারা। গায়েনদের কাছে এরা পৃষ্ঠপোষকের

সমান। কারণ তাদের ইচ্ছায় অনেক গায়েন সাতদিন ধরে মঙ্গলগান করার সুযোগ পেত। কবি ঘনরাম তাই তার কাব্যে বারবার নায়েকের কথা বলেছেন।

যেমন বলেছেন –

১. ‘ গানে বিঘ্ন কর নাশ পুর নায়েকের আশ

প্রণতি প্রকাশে ঘনরাম॥’

(স্থাপনা পালা)

২ . ‘ নগেন্দ্র নন্দিনী মা নায়েকে কর দয়া।

গান দ্বিজ ঘনরাম দেহ পদ ছায়া ॥’

(স্থাপনা পালা)

৩ .‘মহারাজ প্রতি প্রভু দয়া না ছাড়িবে কভু

নায়েকের করিবে কুশল।’

(স্থাপনা পালা)

৪ .‘শ্রীরাম পদদ্বন্দ্ব ভাবিয়া সদানন্দ

ব্রাহ্মণ ঘনরাম গান।

রাজার বাঞ্ছা পূর্ণ প্রভু করুন তূর্ণ।

নায়েকে হইয়ে কৃপাবান।।’

(রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা)

এইভাবে বার নায়েকের মঙ্গল কামনা থেকে মনে হয় কখনও কখনও হয়তো ঘনরাম গায়েনের ভূমিকাও পালন করেছেন। সুকুমার সেন অবশ্য বলেছেন তিনি রামায়ণের গায়েন ছিলেন ।

রচনাকাল :

কাব্যটি কবে থেকে লেখা শুরু হয়েছিল তা জানা যায় নি। তবে একটি সমাপ্তিজ্ঞাপক শ্লোকে জানা যায়-

‘শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।

মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।।

সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।।

যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি।।'

শকাব্দ অনুযায়ী প্রাচীন কবিরা কাব্যরচনার কাল নির্দেশ করতেন। এখানে রাম ৩ =, গুণ ৩ =, রস ৬ =, সুধাকর অর্থাৎ চন্দ্র=১। সাল গননা অনুযায়ী উল্টো দিক থেকে সাজালে হয় ১৬৩৩ শকাব্দ । এর সঙ্গে ৭৮ বছর যোগ করলে ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ হয় । তিথি নির্দেশ অনুযায়ী ১৬৩৩ শকাব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ কাব্যটির রচনা সমাপ্ত হয়। কাব্যটি কোথায় বসে লিখেছিলেন তা জানা যায় না।

১৩.৩: ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থের পরিচয়

সুকুমার সেনের মতে, বর্ধমান জেলায় রায়না নিবাসী মহেন্দ্র নাথ ঘোষ সর্ব প্রথম ঘনরামের কাব্যের কিছু অংশ প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় খণ্ড খণ্ড রূপে প্রথম প্রকাশিত হয় । ১২৯১ সালে বঙ্গবাসী থেকে এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল ১৩০৮ বঙ্গাব্দে । ১৩১৯ সালে শ্রী চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের বিশেষ বিশেষ অংশের প্রকাশ করেন । এখনো পর্যন্ত মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ হিসাবে আমরা যা পেয়েছি

১। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল – মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্ন প্রণীত

চতুর্বিংশতি সর্গে সম্পূর্ণ তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা, ৩৮/২ ভবানীচরণ দত্তের স্ট্রীট,

বঙ্গবাসী – ইলেক্ট্রো-মেশিন প্রেসে শ্রী নটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল। মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন শ্রী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

তারিখ দিয়েছেন ১৩ ই চৈত্র ১২৯০

২। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল – ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, ২০১নং কর্ণওয়াল স্ট্রীট,

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা, ৩৪/ ১ কলুটোলা স্ট্রীট বঙ্গবাসী স্টম মেসিন প্রেসে শ্রী বিহারীলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

৩। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

শ্রী পীযুষ কান্তি মহাপাত্র এম,সম্পাদিত .এ.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২।

এরপর থেকেই ঘনরামের ধর্মমঙ্গল শিক্ষিত সমাজে বিস্তারলাভ করে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কাব্যটির উক্ত সম্পাদকের এটিকে পুনর্মুদ্রণের কথা ভাবেন নি তাই এর জনপ্রিয়তা রুদ্ধ হয়ে গেছে। বোঝা যায় যে শেষ সম্পাদনার পর ৬৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও কেউ আর ঘনরামের কাব্যটিকে নতুন করে সম্পদনার কথা ভাবেন নি। সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচনা করলেও সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে সুকুমার সেনের নিরব থাকাটা মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে তিনি পঞ্চানন মণ্ডল ও কন্যা সুনন্দা সেনের সঙ্গে রূপরামের ধর্মমঙ্গল এবং তারই উৎসাহে জামাতা বিজিত দত্ত ও কন্য সুনন্দা সেন মানিকরাম গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল সম্পাদনা করেছিলেন। অথচ ঘনরাম জায়গা পেলেন না। আজ ঘনরামের মেলা হওয়ার জন্য আর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচিতে স্থান পাওয়ায়, যতটুকু চর্চিত হচ্ছে । আমি নিজে বেশ কয়েকবার গ্রন্থটি নতুন করে সম্পাদনার কথা ভেবেছি কিন্তু অর্থের অভাবে হয়ে উঠেনি। গ্রন্থটিকে নতুনভাবে সম্পাদিত হতে দেখলে সাবারই খুশি হওয়ার কথা।

১৩.৪: ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কাব্য নাম ও পালা বিন্যাস

কাব্য নাম :

পুথিতে অনেকলে তিনি কাব্যের নাম দিয়েছে ‘শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত’, ‘শ্রীধর্ম্মমঙ্গল’, ‘নতুন মঙ্গল’, ‘মধুরভারতী’,’মধুর মঙ্গল’, ‘অনাদিমঙ্গল’ ইত্যাদি নামেও অভিহিত করেছেন। তবে কাব্যের নামকরণে কবি ‘শ্রীধর্ম্মমঙ্গল’-এর পাশাপাশি ‘শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত’ নামটিকেও জোর দিয়েছেন।

শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত-

১। শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রস যাহাতে জগৎ বশ
বন্দিতে বাসনা করি দীন।
(স্থাপনা পালা)

২। শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত নাটে পুর আশ উর ঘটে

করপুটে বন্দিব সুছন্দে।

(স্থাপনা পালা)

৩। শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত নাটে ঘটে কর ভর।

দাসের আশয় পুর আসর ভিতর।।

(স্থাপনা পালা)

৪। বাড়ি গেল ভূপাল শীকার করি নে।

শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তন দ্বিজ ঘনরাম ভণে।।

(ঢেকুর পালা)

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল –

১। মহারাজ প্রতি প্রভু দয়া না ছাড়িব কভু

নায়েকের করিবে কুশল।

গুরুপদে হয়ে যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন

বিরচিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ।।

(স্থাপনা পালা : গীতারম্ভ)

২. এত বলি লাসবেশে দেবসভা যায়।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়।।

(স্থাপনা পালা : গীতারম্ভ)

৩. সাজিতে হুকুম হল নবলক্ষ দল।

দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ।।

(ঢেকুর পালা)

৪. কত রঙ্গ রহস্য বহিয়া গেল তায়।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়।।

(রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা)

নূতন মঙ্গল -

১. গুরুপদ ভাবি যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন

নূতন মঙ্গলরস গান।

(স্থাপনা পালা : গীতারম্ভ)

২. নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্নে গান।

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।।

(হরিশ্চন্দ্র পালা)

৩. চিন্তিয়া পরম পদ করি বহু যত্ন।

নূতন মঙ্গল গান দ্বিজ কবিরত্ন।।

(শালে ভর পালা)

মধুরমঙ্গল-

১. শ্রীগুরু পদারবিন্দে মনে করি ধ্যান।

মধুর মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।।

(স্থাপনা পালা : গীতারম্ভ)

অনাদিমঙ্গল-

১. গায় দ্বিজ ঘনরাম অনাদিমঙ্গল।

পুর নায়কের বাঞ্ছা ভকতবৎসল।।

(লাউসেনের জন্ম পালা)

ঘনরামের কাব্যে পালাবিন্যাস :

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত ‘শ্রীধর্ম্মমঙ্গল’ কাব্যটি ১২ দিনে গাওয়ার নিরিখে মোট ২৪টি পালায় বিভক্ত। সম্পূর্ণ কাব্যটিতে মোট শ্লোকের সংখ্যা ৯১৪৭টি। নিম্নে পালার নাম এবং শ্লোকের সংখ্যা দেওয়া হল -

প্রথম সর্গ = স্থাপনা পালা-২৬৭, দ্বিতীয় সর্গ = ঢেকুর পালা -২৩৮,

৩য় সর্গ = রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা – ২৫৬, ৪র্থ সর্গ = হরিশন্দ্র পালা ২৬০, ৫ম সর্গ = শালে ভর পালা-২৯৭, ৬ষ্ঠ সর্গ = লাউসেনের জন্ম পালা – ৩১৫, ৭ম সর্গ = আখড়া পালা – ৩৫৪, ৮ম সর্গ = ফলক নিমাণ পালা- ৩১৭, ৯ম সর্গ = গৌড় যাত্রার পালা – ৪০৭, ১০ম সর্গ = কামদল বধ ৩৫০, ১১শ সর্গ = হস্তি বধ পালা – ৩২৭, ১২শ সর্গ =

গোলা হাট পালা ৪৯৪ , ১৩শ সর্গ = হস্তিবধ পালা ৫১৮, ১৪শ সর্গ – কাঙ্গুর যাত্রা পালা -৩৫৯, ১৫শ সর্গ = কামরূপ যুদ্ধ পালা – ৪১৪, ১৬শ সর্গ = কানাড়ার স্বয়ংবর পালা –৬০৭, ১৭শ সর্গ কানাড়ার বিবাহ পালা – ৪৮৫, ১৮শ সর্গ = মায়ামুন্ড পালা – ৪৬৫, ১৯শ সর্গ =ইছাই বধ পালা – ৫৩৫ , ২০শ সর্গ = বাদল পালা- ২৮১, ২১শ সর্গ = পশ্চিমে উদয় আরম্ভ পালা- ১৭৬, ২২শ সর্গ = জাগরণ পালা- ১০৩১, ২৩ সর্গ – পশ্চিম উদয় পালা – ৩৩০ এবং ২৪শ সর্গ = স্বর্গারোহণ পালা – ৩৬৪ শ্লোক বিশিষ্ট।

উপরিলিখিত পালাগুলি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পাদিত ঘনরাম চক্রবর্তীর 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থের মধ্যে উক্ত পালাগুলি ছাড়াও পরিশিষ্ট অংশে ২৭৭টি শ্লোক বিশিষ্ট 'সুরিক্ষার পালা' নামক একটি সর্গের সংযোজন দেখা যায়।

১৩.৫: অনুশীলনী

১। কবি ঘনরাম চক্রবর্তী পরিচয় দিন।

২। কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩। কবি ঘনরামের পৃষ্ঠপোষকের পরিচয় দিয়ে তাঁর কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী গ্রন্থের পরিচয় দিন।

৫। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাব্য নাম ও পালা বিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

১৩.৬: গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন

২. শ্রীধর্ম্মমঙ্গল - শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু

৩. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস - ক্ষেত্র গুপ্ত

৫. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল - পীযূষ কান্তি মহাপাত্র

৭. বাঙালির ইতিহাস:আদি পর্ব - নীহাররঞ্জন রায়

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয় - ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৯. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পুরুষ - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

একক ১৪: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্টতা

বিন্যাসক্রম

১৪.১: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

১৪.২: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রন

১৪.৩: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্র

১৪.৪: ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কাব্য ভাষা

১৪.৫: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ছন্দ

১৪.৬: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে অলংকার ও চিত্রকল্প

১৪.৭: অনুশীলনী

১৪.৮: গ্রন্থপঞ্জি

১৪.১: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয়

ক. প্রথম কাহিনী

রাজা হরিশচন্দ্র ও রানী মদনা নিঃসন্তান ছিলেন বলে সমাজ থেকে অনেক বিদ্রুপ সহ্য করতে হত। মনের কষ্টে রাজা রানী একদিন এক নদীর ধারে পেলেন ধর্মের ভক্তদের। তাঁদের পূজা দেখে ও ধর্মঠাকুরের মহিমার কথা শুনে পুত্র লাভের আশায় রাজরানী ভক্তিভরে ধর্ম ঠাকুরের পূজা করলেন।পূজোয় তুষ্ট ধর্মঠাকুর পুত্র লাভের দিলেন ।তবে একটি শর্ত ছিল, পুত্র জন্মালে যথাসময়ে তাকে ঠাকুরের কাছে বলি দিতে হবে পুত্রের মুখ দেখবার আশায় রাজা হরিশচন্দ্র সে প্রস্তাব মেনে নেন। ধর্ম ঠাকুরের বরে রানীর যে পুত্র হলো তার নাম রাখা হল লুইধর। সে বড় হল। ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় লাউসেন

বিজয়ী হন। আনন্দের আতিশয্যে রাজা-রানী ধর্মের কাছে পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হলেন তারপর একদিন ধর্ম ঠাকুর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেই দিন একাদশীর ব্রত। রাজা ব্রাহ্মণ কে ইচ্ছামতো খাবার দিতে চাইলে আর যায় কোথায়? ছদ্মবেশী ধর্মঠাকুর লুইধরের মাংস আহারের জন্য তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা প্রচন্ড বেদনা বুকে চেপে অবিচলিত চিত্তে কেটে মাংস রান্না করলেন ।রাজার নিষ্ঠায় খুশি হয়ে ধর্ম ঠাকুর পুনর্জীবিত করলেন লুইধরকে। মহানন্দে রাজারানি ধর্মঠাকুরের পুজো আরম্ভ করলেন।

দুঃখে বিমর্ষ রঞ্জাবতী ধর্মনগরের গাজনের উৎসব থেকে ধর্মঠাকুরের মহিমার কথা শোনেন। ধর্ম ঠাকুরের পূজায় অপুত্রক পুত্র লাভ করেন। রঞ্জাবতী পুত্রের আশায় ধর্মের তপস্যা করে শেষ পর্যন্ত শালে ভর দিয়ে প্রাণ দিলেন। অবশেষে ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে পুত্র হবার জন্য বরদান করলেন। যথাসময়ে রঞ্জাবতীর পুত্র জন্মালো -পুত্র একজন শাপভ্রষ্ট দেবতা ।নাম লাউসেন। এই সংবাদে গৌড়েশ্বর খুশি হলেও মহামদ জ্বলে উঠলেন রাগে। লাউসেনের অনিষ্ট করার জন্য তিনি নিয়োগ করলেন সর্বশক্তি। তাঁর নির্দেশে ইন্দা মেটে নামে এক চর লাউসেনকে অপহরণ করে। পুত্রশোকে রঞ্জাবতী তখন উন্মাদ। ধর্মঠাকুর তাকে আরেকটি পুত্র দান করেন, সে পুত্রের নাম কর্পূরধবল । ধর্মঠাকুরের আদেশে হনুমান লাউসেন কে উদ্ধার করে এনে রঞ্জাবতীর কোলে তুলে দিলেন ।

লাউসেন ক্রমে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া অস্ত্রবিদ্যা বিশেষ দক্ষ হন। মল্লবিদ্যায় লাউসেন পটু। গৌড় পৌঁছেই মহামদের চক্রান্তে লাউসেন কারারুদ্ধ হন। কিন্তু দ্রুত বাহুবল দেখিয়ে গৌড়েশ্বর কে সন্তুষ্ট করে কারামুক্ত হলেন লাউসেন। ময়নাগর পেলেন লাউসেন। দেশে ফেরার পথে কালু ডোম ও লখ্যার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল। লাউসেন এদের নিয়ে ফিরলেন ময়নাগড়ে কালু হলো তাঁর সেনাপতি।

মহামদ চক্রান্ত করে লাউসেনকে দমন করতে পাঠালেন কামরূপরাজকে মহামদ ভেবেছিলেন কামরূপ রাজের হাতে পরাস্ত ও নিহত হবেন লাউসেন। কিন্তু কামাখ্যা দেবীর কৃপায় কামরূপের রাজাকে হারিয়ে তার কন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করলেন। মাহমদ

জ্বলে-পুড়ে মরতে লাগলো ।মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর শিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া কে বিয়ে করার জন্য উৎসুক হন ।লোহার গণ্ডার কেটে কানাড়াকে বিবাহ করলে লাউসেন। মহামদের ক্রোধ বাড়ল দ্বিগুণ হয়ে। অজয় নদীর তীরে ইছাই ঘোষের সঙ্গে লাউসেনের তুমুল যুদ্ধ হয়।

খ) দ্বিতীয় কাহিনী

ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কাহিনীর নায়ক লাউসেন ।ধর্মঠাকুর মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য অত্যন্ত উৎসুক। স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতীর তাল ভঙ্গ হওয়ায় শাপভ্রষ্ট হয়ে তিনি মর্ত্যে বেনুরায়ের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করলেন। নাম হল রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর বড়দি গৌড়েশ্বরের পাটরানি ।আর বড় ভাই মহামদ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী।

ঢেকুরগড়ের অধিপতি কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের অধীন একজন সামন্ত রাজা। ইছাই ঘোষও গৌড়েশ্বরের আরেক সামন্ত রাজা। ইছাই চণ্ডীর বরপুত্র । অসীম তাঁর শক্তি। প্রচন্ডভাবে ইছাই বিদ্রোহী হয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে ।গৌড়েশ্বরের নির্দেশে তাকে দমন করতে গিয়ে কর্ণসেন হলেন পরাজিত। ছয়জন পুত্র ও পুত্রবধুরা যুদ্ধে নিহত হন। কর্ণসেন শোকার্ত হলে তাঁর সঙ্গে গৌড়েশ্বর নিজ শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়েছেন। বিয়ের পর কর্ণসেন রঞ্জাবোটীকে নিয়ে ময়না গড়ে নতুন সামন্ত রাজা হন।

কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ হওয়ায় মোহাম্মদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। রঞ্জাবতী মহামদের বোন। কর্ণসেন বৃদ্ধ বলে এই বিয়েতে মহামদের ঘোর আপত্তি ছিল। গৌড়েশ্বরের সভায় কর্ণসেনকে মহামদ আঁটকুড়া অর্থাৎ পুত্রহীন বলে বিদ্রুপ শুরু করে। ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের গোষ্ঠীর কাছে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন।

এবার অন্যভাবে মহামদ লাউসেনকে জব্দ করার জন্য সচেষ্ট হন লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাতে আদেশ দিলেন মহামদ। না পারলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। হাকন্দ নামক স্থানে ধর্মঠাকুরের তপস্যা করে এই অসাধ্য সাধন করলেন লাউসেন।

লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ আক্রমণ করে ময়নাগড়। যুদ্ধে মারা যান কালু ডোম, ও লখাই ডোমণী ও তার পুত্রগণ। লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কলিঙ্গাও নিহত

হন।অবশেষে বীরঙ্গনা কানাড়ার কাছে পরাজিত হন মহামদ। দেশে ফিরে লাউসেন ধর্মের তপস্যা করে পত্নী ও অন্যান্যদের পুনঃজীবন দান করেন।মর্ত্যে ধর্ম পূজা প্রচলিত হয়। মহাপাপের জন্য মহামদের কুষ্ঠ হয়। দয়াপরবশ হয়ে বীর লাউসেন ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে সারিয়ে তোলেন মাহমদকে। পরম গৌরবে কিছুকাল রাজত্ব করে লাউসেন সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করেন। পুত্র চিত্রসেন লাউসেনের সিংহাসনের অধিকারী হন।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিষয় গৌরব অতুলনীয়। কিন্তু কবিপ্রতিভা সেই তুলনায় নগণ্য মাত্র। এর একটি কারণ সম্ভবত দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ শ্রেণীর দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে উচ্চবর্ণজাত প্রতিভাধর কবি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, বীররসাত্মক কাব্য হয়ে ওঠায় বাঙালির সংসার জীবন এবং অশ্রুভারাতুর হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবকাশ দেখা যায় নি। তৃতীয়ত, যুদ্ধ বর্ণনার অনভিজ্ঞ কল্পনা এবং পুরুষদেবতার নিরাকার কাঠিন্য কবিমনকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। চতুর্থত, চন্ডী,মনসা ইত্যাদি অন্যান্য দেবী কল্পনায় মঙ্গলকাব্যের কবিরা ভারত- পুরাণ থেকে উপাদান সংগ্রহের যে সুযোগ পেয়েছিলেন, ধর্মঠাকুর অবৈদিক হওয়ায় এই কাব্যের কবিরা কাব্য নির্মাণে সেই উপাদান স্বল্পতার অভাব বোধ করেছিলেন বলে মনে হয়। এই কাব্যধারা পঞ্চদশ শতক থেকেই ছড়া ও ব্রতকথা রূপে প্রচলিত ছিল।আঙ্গিক রীতিতে ছিল গান, পরে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সেগুলি কাব্যাকারে সংগ্রথিত হয়।

এই কাব্যধারার আদি কবির কাব্য নির্ণয়ে বিতর্ক আছে। তবে কবি মানিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, সীতারামদাস প্রমুখ পরবর্তী কবিদের কাব্যে প্রদত্ত তথ্যগত সাক্ষ্যে জানা যায় কবি ময়ূরভট্টের নাম। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ‘শ্রী ধর্মপুরাণ’ নামে ময়ূরভট্টের কাব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ভাষা বিচারে প্রমাণিত হয় গ্রন্থটি অর্বাচীন ব্যক্তির রচনা। আবার ‘সূর্যশতক’ রচয়িতা সংস্কৃত কবি ময়ূরভট্টের সঙ্গে নাম সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন- “ মনে হয় ময়ূরভট্ট কোন বাঙালি কবির প্রকৃত নাম নহে। সংস্কৃত সূর্যশতক রচয়িতা

ময়ূরভট্টের নামটিই এখানে কোন বাঙালি কবি গ্রহণ করিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন।”

রূপরাম চক্রবর্তী:- সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত ধর্মমঙ্গল কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য কবি হলেন রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। লাউসেনের জন্ম থেকে আখড়ায় তাঁর মূল্ল বিদ্যা শিক্ষা পর্যন্ত কাহিনী- অংশ বর্ণিত হয়েছে। কাব্যটির নাম ‘ অনাদি মঙ্গল’। কবির জন্ম বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত কাইতি শ্রীরামপুর গ্রাম (এই শ্রীরামপুর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর নয়)। কবির পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তী ছিলেন বড় পন্ডিত। কৈশোরে কবির পিতৃবিয়োগ হয় । দাদা রামেশ্বরের রুক্ষ মেজাজে কবি অতিষ্ঠ হয়ে গৃহত্যাগ করে পাষণ্ড গ্রামে উপস্থিত হন। সেখানে এক ভট্টাচার্যের টোলে আশ্রয় নিয়ে বিদ্যা চর্চা করেন। কোন এক কারণে গুরুর সঙ্গে বিবাদ বাদে এবং কবি গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কৃত হন। সেখান থেকে তিনি উপস্থিত হন নবদ্বীপে পলাশনের বিলের কাছে। সেখানে ব্যাঘ্ররূপী ধর্ম ঠাকুর কবিকে দেখা দিয়ে কাব্য রচনার আদেশ করেন। অসম্মত দ্বিধাগ্রস্থ কবি এরালবাহাদুরপুর গ্রামে আসেন এবং সেখানে গোপভূমের এক গোস্বামী গণেশ রায়ের গৃহে আশ্রয় পান। এই আশ্রয়ে থেকে রূপরাম কাব্য রচনা করেন।

এই কাব্যে বর্ণিত কবি রুপরামের আত্মজীবনীতে তৎকালীন সমাজের পরিচয় আছে। কাব্যে কোন কোন পুঁথিতে আছে শাহ সুজার উল্লেখ। কাব্যের রচনাকাল সংশয়াছন্ন। সমালোচকেরা ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের উল্লেখ করেছেন। সে ক্ষেত্রে মনে হয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বা অষ্টাদশ শতকের প্রথমে কবি কাব্য রচনা করেছিলেন। এমনকি আদিরূপ রাম নামে আর এক কবির নাম পাওয়া গেছে ।

রূপরাম এর কবি প্রতিভা ছিল। তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘরোয়া সুরে কথা বলা। সেই জন্য পাঠক বা শ্রোতা তাঁর কাব্যে সহজে আকৃষ্ট হয়। আবার পাণ্ডিত্যের পরিচয়ও আছে , যেমন:

'কপালে সিঁদুর পরে তপন উদয়।

চন্দন চন্দ্রিমা তার কাছে কাছে রয়।।

চন্দ্র কোলে শোভা যেন করে তাঁরা গন।

ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ।।'

চরিত্রচিত্রণেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ইছাই ঘোষের ভবিষ্যৎ পরাক্রমের কথা যেমন তার বাল্য চিত্রে আভাসিত হয়েছে, তেমনি মহামদ চরিত্রের বিকৃতি না দেখিয়ে তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্দেশ করেছেন।মহামদ তাঁর প্রিয় পাত্রী রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ কর্ণ সেনের বিবাহে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অভিমান সঞ্জাত স্নেহই তাকে লাউসেনের সর্বনাশ সাধনের প্রবৃত্ত করেছিল।

রুপরামের কাব্যে সপ্তদশ শতকের বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাসের আঞ্চলিক পরিচয় পাওয়া যায়; যেমন বিনিময় -মাধ্যম হিসেবে তখন কড়ির প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের পণ্ডিতদের টোলে অভিধান, ব্যাকরণ, কালিদাস, পিঙ্গল এর ছন্দ সূত্র, নব্যন্যায়, মাঘ, মহামতি যাস্কের নিরুক্ত, ইত্যাদি কবি ও লেখকদের রচনা পড়ানো হতো ।শিক্ষার কেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধ ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, জৌগ্রাম। সামাজিক রীতির পরিচয় পাওয়া যায় 'ষেটের ব্রত',একুশশা এবং অন্নপ্রাসন এর উল্লেখে সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় কোন রঞ্জাবতী বিবাহ উপলক্ষে মেয়েদের রঞ্জাবতী চোখে পুরুষ আকর্ষণকারী মন্ত্রপুতঃ কাজল (দুর্গাপূজায় সংগৃহীত) দানে।কবি রূপরাম কাব্যটির নাম 'অনাদ্যমঙ্গল' রূপে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের অংশ মাত্র প্রকাশিত হওয়াতে সামগ্রিকভাবে গ্রন্থ্ বিচার সম্ভবপর নয়। যতটুকু পাওয়া গেছে, তা থেকে মনে হয় সপ্তদশ শতকের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিদের মধ্যে রুপরামের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। যে লাউসেনের কাহিনী -ছড়া ও- পাঁচালী ও ব্রত কথার সীমায় আবদ্ধ ছিল, রূপরাম সম্ভবত তাকে সর্বপ্রথম মঙ্গলকাব্যের জগতে উন্নীত করেন। চরিত্র সৃষ্টি ,বর্ণনাভঙ্গি এবং আত্মকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবির কৃতিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন –"কোন কোন সময়ে তাঁকে প্রায় মুকুন্দরাম এর

মত প্রতিভাশালী মনে হয়, বিশেষত করুন রস ও হাস্য পরিহাস তিনি মুকুন্দরাম এর সমকক্ষ। তাঁর প্রতিভা ছিল বলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের পরবর্তী কবিরা অনেকেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন “রুপরামের আত্মকাহিনী মূলক অংশ বিষয়ে ডঃসুকুমার সেনের অভিমত বিশেষ মূল্যবান-“ পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্পের মতো কোনো জীবন -রস -নিটোল রচনা থাকে তবে তাহা রূপরাম এই আত্মকাহিনী।

ঘনরাম চক্রবর্তী: ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বজন পরিচিত কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম পরিচয় স্বল্প,তুলনায় তাঁর ‘অনাদি মঙ্গল’ কাব্যের আয়তন এবং ইতিবৃত্ত সুবিস্তৃত ।অষ্টাদশ শতকে আবির্ভুত সম্পর্কে সবিশেষ সংবাদ দিয়েছেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন এবং ড. সুকুমার সেন। বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরে অবস্থিত কইয়ড় পরগনার অন্তর্গত বাঁকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম হয়। পিতার নাম গৌরী কান্ত ,মাতার নাম সীতাদেবী ।কবি শৈশবে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। কবির পিতা গৌরীকান্ত তাকে রামপুরের টোলে পাঠান। সেখানে সুসংসর্গে ঘনরামের স্বভাবের পরিবর্তন হয়। তিনি উল্লেখ করেছেন:

‘অখিল বিদ্যার কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্তী

কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।

চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রস গান।।‘

মহারাজা কীর্তিচন্দ্র ছিলেন সম্ভবত কবির পৃষ্ঠপোষক।

‘শক লিখে রাম গুন রস সুধাকর’ ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখিত শ্লোক দেখে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন, ঘনরামের কাব্য সমাপ্তির কাল ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দের ২রা নভেম্বর।অবশ্য এই সময় উল্লেখ করা হয়েছিল সমাপ্তির অনতি পূর্ববর্তী মুহূর্তে। কবি সত্যনারায়ণ পাঁচালী ও রচনা করেছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি ‘কবিরত্ন’ উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কিত জীবনী কথায় ঘনরামের ব্যক্তি বিবরন বিরলদৃষ্ট। সেখানে আছে কবির গুরু ভট্টাচার্যের কথা, নীলাচল গমন, রামচন্দ্রের দর্শন লাভ। গুরুর নির্দেশমতো রামায়ণ রচনা চেষ্টা ,শেষে ধর্মমঙ্গল লেখার নির্দেশ প্রাপ্তি ইত্যাদি তথ্যসমূহ।ঘনরামের কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল তবে অনেক স্থলে ‘শ্রী ধর্ম সংগীত’, ’ মধুর ভারতী’ ইত্যাদি নামেও অভিহিত

কাব্যটি ২৪টি সর্গে ও বিভিন্ন পালায় বিন্যস্ত। মোট শ্লোক সংখ্যা ৯১৪৭টি। কাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত-

ক) হরিশচন্দ্র - লুই চন্দ্রের কাহিনী

খ) লাউসেনের কাহিনী।

কাব্যের আয়তন প্রায় মহাকাব্যের মত বিশাল। যদিও ভাব-গাম্ভীর্যে ও রচনা ভঙ্গিতে পাঁচালীর চিহ্ন সুস্পষ্ট।

কাব্যের স্থাপন পালায় 'নবীন নীরদশ্যাম জিনি কত কোটি কাম ' ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রেম জলরাশির উপর তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং শেষ প্রস্থানের চিত্ররূপ বর্ণনা জীবন্ত। কিন্তু কবি দৃষ্টি রোমান্টিক কল্পনায় ভাবস্নাত হয়নি বরং লাউসেনের পৌরুষদীপ্ত জীবনের পরিচয়, তাঁর যোদ্ধা রূপের বিবরণে এই কাব্য উদ্দীপ্ত হয়েছে। যুদ্ধ বর্ণনায় কবির ঘনরামের শব্দ সচেতন কল্পনা শক্তি পাঠককে বিস্মিত করে:

'টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ ঢাল চাল ঢ়ন ঢ়ন

ঝন্ ঝান্ ঘন রণ ন।

দিঘিতে বিপরীত চৌদিকে চমকিত

মামুদা ভাবে পরমাদ।।'

ধর্মের বরপুত্র লাউসেন যেমন বীরযোদ্ধা তেমনি মানবিক গুণে মণ্ডিত । পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ধর্ম পক্ষের নিষ্ঠা, নির্ভীকতা এবং চরিত্র রক্ষায় শুচিতায় সদা ভাস্বর। লাউসেন জননী রঞ্জাবতী স্নেহময়ী পুত্রের কল্যাণ কামনায় মগ্ন মাতৃমূর্তি:

'কালি অতি শুভ দিন গৌড়ে তুমি যাবে।

অভাগীর রন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে।।'

পক্ষান্তরে লাউসেন জায়া কলিঙ্গা কানাড়ার মধ্যে বীরত্বের দিকটিকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ।শঠতা ক্রুরতা ও প্রতিহিংসায় মহামদ চরিত্রটিও চিত্তাকর্ষক হয়েছে।দুর্মুখা দাসী , কালু সেন, লখাই ডোম ,হরিহর বাইতি প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্র নির্মাণে ও কবি ঘনরাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন অর্থলোভী হরিহরের স্ত্রী প্রতি উক্তি:

'হরিহর বলে শোনো বাইতির ঝি।

বসে কর বিলাস তোমার লাগে কি।।

ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।

অবলা অবোধ জাতি কি বুঝাবো তোকে।।

অধর্মের বাধ্য বসু ধর্মের অকার্য।

আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য।।'

লাউসেন ভ্রাতা কপূর সেনের চরিত্র নির্মাণে ও কবি দক্ষতা দেখিয়েছেন ।জামতি নগরে বন্দী লাউসেনকে দেখে স্বার্থপর কর্পূর পালিয়ে যায়। পরে লাউসেন মুক্ত হলে সে ফিরে এসে দাদাকে বলে-

'কাঁদিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।

কালি কোথা ছিলে ভাই কি বা দশা ।।

কর্পূর বলেন যবে বন্দি হলে ভাই ।

রাতারাতি গেছেনু ধাওয়া ধাই ।।

রাজার আদ্দানা করি জামতি লুঠিতে ।

লইয়াছি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে ।।

পথে শুনি বিজয়, বিদায় দেনু ভাই ।

লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ।।'

ধর্মমঙ্গল মুখ্যত বীর রসাত্মক কাব্য।তাই বীররসের প্রাধান্য এই কাব্যে বিশেষভাবে দেখা যায়; যেমন-

'মারমার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।

সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ।।

দুদল করে হানাহানি।।'

বীভৎস রসের বর্ণনায় ও শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। যেমন ডাকিনি পেত্নীরা-

'কাঁচা মাংস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে।

মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে।।'

কিন্তু করুন রসের বর্ণনায় আছে শুধু দীর্ঘশ্বাস:

'শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে।

নিশায় নিধণ রণে, পিতামাতা বন্ধু গণে

দেখিতে না পেনু শেষকালে।।'

ঘনরামের রচনারীতি সংস্কৃত- নির্ভর ও মার্জিত। তাঁর কৌতুকরসে স্থূলতা থাকলেও ভাঁড়ামী নেই, বরং তির্যকতা আছে।

' চঞ্চল চরণ চারি চলনি

নির্মল বরণ বাড়ি বিনোদ মন্দির'

প্রভৃতি অনুপ্রাস অলংকারে তাঁর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরোক্ত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও দেখা যায় ঘনরামের কাব্য ত্রুটিমুক্ত নয়। এই কাব্যের ত্রুটি দেখা যায়:

ক) বিশাল আয়তন এবং সুবিপুল ঘটনাসমূহ সুগ্রথিত করে প্রকাশের মতো উপযুক্ত কবিত্বশক্তি ও নৈপুণ্যের অভাব।

খ) অলৌকিক ঘটনা সমাবেশের ফলে কাব্যটির প্রধান চরিত্র লাউসেনের বীরত্ব ও শক্তি প্রকাশ অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হয়; যেমন তাঁর মৃত শিশুর মুখ দিয়ে কথা বলানো, নিজের মৃত সৈন্যদের জীবিত করা, পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখানো ইত্যাদি।

গ) শাস্ত্রের অতিরিক্ত দৃষ্টান্ত দানে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা অব্যক্ত থেকে যায়।

ঘ) বর্ণনার মধ্যে এক যুদ্ধ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্র ক্লান্তিকর নীরস বিবৃতি চোখে পড়ে।

তবে সমকালের রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনের বাস্তব পরিচয়ে এই কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য ।ধর্মমঙ্গল কাব্য সমূহের মধ্যে ঘনরামের গ্রন্থই প্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে।

শ্যাম পন্ডিত: ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই রাঢ় অঞ্চলের বাসিন্দা। তাই বীরভূম বর্ধমান অঞ্চল থেকেই তার অধিকাংশ পুঁথি পাওয়া গেছে। কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে ধর্ম দেবতার আরেক নাম নিরঞ্জনের নামে- ' নিরঞ্জন মন্ডল'।এই পুঁথি গুলি অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে খন্ডিত। তাছাড়া অন্যান্য কবির রচনা প্রক্ষিপ্ত অংশও তার মধ্যে বিদ্যমান। সেই কারণে রচনায় প্রাচীনত্ব এবং আঞ্চলিকতা থাকলেও অন্যান্য কবির রচনাংশ থেকে পৃথক করা অসম্ভব। শ্যাম পন্ডিত লাউসেনের আত্মবিবরণীতে বল্লাল সেনের উল্লেখ করেছেন।

ধর্মদাস: শ্যাম পন্ডিত এর কাব্যে আত্মগোপন করে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এই কবি 'ধর্মদাস' ভনিতায়। এঁর কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'। কবি নিজে ছিলেন বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। জন্মস্থান বসর গ্রাম। তবে ড. সুকুমার সেন বৈদ্য জাতিভুক্ত মন্দারণবাসি আর এক ধর্মদাস এর নাম উল্লেখ করেছেন। ধর্মদাসের 'নিরঞ্জন মঙ্গল'কাব্যে সৃষ্টি পত্তন বর্ণনা বিস্তৃত। রচনারীতি সহজ ও বাস্তবধর্মী। ইনি প্রধানত রূপরামের ধর্মমঙ্গলের আদর্শেই কাহিনী বিবৃতি করেছেন।

রামদাস আদক: ১৩১১ সনে জনৈক মধুসূদন অধিকারী 'সাহিত্য সংহিতা' পত্রিকায় 'অনাদি মঙ্গলের কবি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানেই প্রথম কবি রামদাস আদকের নাম জানা যায়। তিনি কবি রচিত পুথি সবটা সংগ্রহ করতে পারেন নি। মৌখিকভাবে সংগৃহীত বাকি অংশ শুনেছিলেন রামদাসের উত্তর পুরুষদের কাছে। আরও পরে ১৩৪৫ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে গবেষক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বসন্ত বাবুরও এই কাব্য সংস্থানের উৎস ছিল কবির বংশধরদের স্মৃতিবাহিত পয়ার-ত্রিপদীতে আবদ্ধ কবিতাবলী এবং গায়েনদের ব্যবহৃত একটি খাতা। আবার এই খাতায় রূপরামের রচনার সঙ্গে এক অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। যে কারণে ড. সুকুমার সেন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন- " ইহার বারো আনাই রূপরামের শুধু ভণিতা রামদাসের।" দ্বিতীয়ত, মধুসূদন অধিকারীর সংগৃহীত 'আত্মপরিচয়' অংশের সঙ্গে এর যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তৃতীয়ত, রামদাস তাঁর আত্মপরিচয়ে ধর্ম ঠাকুরকে বলেছিলেন:

'পাঠ করি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া

গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া।।'

কিন্তু বসন্ত বাবুর পুঁথিতে রামদাস পণ্ডিত বাগবৈদগ্ধ্যের পরিচয়ে শক্তিমান।কাজেই " রামদাস আদকের মুদ্রিত অনাদি মঙ্গল সর্বাংশে প্রাচীন কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়"।(' বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

কবি রামদাসের কাব্যের উল্লেখযোগ্য অংশ হল আত্মজীবনী।ভুরসুট পরগনার রাজা প্রতাপনারায়নের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আরামবাগের কাছে হায়াৎপুর গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। কবিরা ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। পিতার নাম রঘুনন্দন। শৈশবেই কবি মাতৃহীন। পৌষের কিস্তি খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারার অজুহাতে জমিদারের লোক চৈতন্য সামন্ত কবিকে তিনদিন কয়েদ করে রাখে। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যান মামার বাড়ি। পথে দেখেন শঙ্খচিল, মাথার উপরে মালা ইত্যাদি নানাবিধ শুভ চিহ্ন এবং সেই সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের ছদ্মবেশে সিপাহী।সিপাহী বালক- কবির মাথায় মোট চাপিয়ে তাড়না করে, কিন্তু শেষে অদৃশ্য হয়। তারপর ব্রাহ্মণ বেশে আবার ধর্ম এসে দেখা দিয়ে কবিকে বলেন:

'ধর্ম বলে রামদাস মূর্খ নও তুমি।

জারগ্রামের কালু বামন হই আমি।।

আসরে জুড়িবে গীত আমা সঙরণে।

মুখেতে ঠেকিলে গীত চাইও কর পানে।।

এত বলি ঠাকুর ধরিল তারি কর।

মহামন্ত্র লিখি দিল দ্বাদশ অক্ষর।।'

রামদাসের কাব্যে যে সন তারিখের উল্লেখ দেখা যায়, তার ভিত্তিতে মনে হয় ১৫৮৪ শকাব্দ বা ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দের ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কাব্যটি লেখা শেষ হয়েছিল। রামদাসের 'অনাদ মঙ্গল' কাব্যের ভাষারীতি পরিচ্ছন্ন ও কবিত্বময়, যেমন-

'চিনিতে রোপিয়া নিম দুগ্ধের সিঞ্চনে।

জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে।।'

কিংবা-

'যুবক স্বামীর কথা পীযূষের কণ।

বৃদ্ধ সোয়ামীর কথা ছেঁচা ঘায়ে নুন।।'

তবে ভাষায় আধুনিক স্বচ্ছতা এবং কবি রূপরামের আছন্নতায় কবি রামদাসের কাব্যের প্রকৃত স্বরূপ অজ্ঞাত থেকে গেছে সমালোচকদের কাছে।

সীতারাম দাস:- অষ্টাদশ শতকের প্রাপ্ত পুঁথির ভিত্তিতে আলোচিত এই কবির কাব্য আত্মকাহিনী অংশটুকুই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।কবির পৈত্রিক বাড়ি বর্ধমান জেলা খণ্ডঘোষের অন্তর্গত সুখ সাগর বা শম্ভুসাগর গ্রাম। তবে কবির জন্ম মাতুলালয়ে, বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস গ্রামে। পিতার নাম দেবীদাস, মায়ের নাম কেশবতী। গজলক্ষী ছিলেন গৃহদেবী।মল্লভূমিতে রচিত তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১০০৪ বঙ্গাব্দ ধরে ১৬৯৮ থেকে ৯৯ খ্রিস্টাব্দ বলে মনে করা হয়।

ডোমের ঠাকুর ধর্মের পূজাপ্রচারে ও কাব্য রচনায় প্রথমে কবি ছিলেন অনিচ্ছুক। কিন্তু ধর্ম ঠাকুরের 'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে' প্রতিশ্রুতি পেয়ে এবং স্বপ্নে গজলক্ষী অনুমতি পেয়ে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইন্দাস গ্রামে পুরোহিত নারায়ণ পণ্ডিতও কবিকে উৎসাহ দিয়েছিলেন ।কবির আত্মকাহিনীর সাক্ষ্যে ৪০দিনে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল।

সীতা রামের ক্যাবের কাহিনী অংশ নতুনত্ব বর্জিত। তবে রচনারীতি সহজ এবং বিবৃতিমূলক। কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণনা চিত্রধর্মী এবং শব্দময়, যেমন বৈশাখের মধ্যাহ্নে বনের শোভা বর্ণনা:

'বৈশাখ সময় তার কুড়চির ফুল।

ঝুপ ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল।।

কত কত কাননে হরিণী কালসার।

ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার।।'

শোনা যায়, সীতারাম মনসামঙ্গল কাব্যও লিখেছিলেন।

যদুনাথ বা যাদব নাথ পন্ডিত:ধর্মমঙ্গল কাব্য শাখার এক উল্লেখযোগ্য কবি। তাঁর জন্ম হাওড়া জেলার দোসগ্রামে (বর্তমানে ডোমজুর গ্রাম)।ড. পঞ্চানন মন্ডল এক তাঁতির বাড়ি থেকে পুঁথিটি উদ্ধার করে বিশ্বভারতী থেকে 'ধর্মপুরাণ' নামে প্রকাশ করেন। কবির পিতার নাম ধর্মদাস, পিতামহ বিনোদ দাস। কবি খুব সম্ভবত ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত।কিন্তু তবু

যাদবনাথ পণ্ডিতের কাব্যের অসাম্প্রদায়িক পরিচয় নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এখানে যেমন আছে চৈতন্য বন্দনা, চণ্ডীর বন্দনা তেমনি ধর্ম নিরঞ্জনের দশ অবতার বর্ণনায় বৃদ্ধকল্কি ও ধর্মের সঙ্গে এক হয়ে পতিশাহ রূপে দিল্লিতে শাসনের কথা:

'দশমে বন্দিনু বৌদ্ধ কল্কি অবতার।

সত্য শূন্য নাম তার মেলেস্চ আকার।।

যবন রূপে দিল্লিয়ে কৈলে পাৎসাই ঠাকুরালি।

যবন রূপে একাকার সংহারিলে কলি।।'

তাঁর কাব্যে বর্ধমান রাজ কৃষ্ণ রামের উল্লেখ দেখে মনে হয় ১১০৩ বঙ্গাব্দে বা ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাব্যটি সমাপ্ত হয়।

যদুনাথ পরবর্তী কবিদের মতো লাউসেনের কাহিনী শোনাতে চান নি। এখানে রামাই পন্ডিত এবং হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কথা বলা হয়েছে। করুনরস সৃষ্টিতে এবং লুইচন্দ্রের মাতা মদনার বাৎসল্যময়ী চরিত্র নির্মাণে কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রচনারীতি সংযত আবেগ ও পান্ডিত্যের পরিচয় উজ্জ্বল ।বস্তুত কাহিনীর নতুনত্বেই তিনি স্মরণীয়।

ময়ূর ভট্ট:- ধর্মমঙ্গলের এই প্রাচীন কবির কথা সব কবি বলেছেন। এঁর লেখা পুঁথিও পাওয়া যায়নি।তবু মনে হয় তিনি এই শাখার আদি কবি ।১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় 'শ্রীধর্মপুরাণ' নামে একটি কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে এই গ্রন্থটি ময়ূরভট্টের নয়। এই পুঁথিটি আসলে অষ্টাদশ শতকের রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ।

খেলারাম চক্রবর্তী: ১৩০২ সালে হারাধন দত্ত 'জন্মভূমি' জ্যৈষ্ঠসংখ্যার 'গড় মান্দারণ ও প্রাচীন জাহানারা দের ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে এই কবির কথা লেখেন। পুঁথিটি তিনি হাতে পাননি,তবে হুগলি জেলার আরামবাগ এর নিকট বদনগঞ্জ এর কাছে শ্যামবাজার গ্রামে এক জেলে পুরোহিতের কাছে দেখেছিলেন কাব্যের নাম 'গৌড়কাব্য'।

কাব্যের রচনাকাল ১৪৪৯ শকাব্দ কার্তিক মাস বা ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু সপ্তদশ শতকের আগে কোন ধর্ম মঙ্গলকাব্য ছিল কিনা সন্দেহ আছে। ফলে অনুমান করা হয়, এই গ্রন্থ জাল।

পরবর্তীকালে ড. পঞ্চানন মন্ডল ওই অঞ্চলে খেলারামের নাম শোনেন। গবেষকরা দেখেন ওই নামে এক কবি ছিলেন। কেননা রুপরামের কাব্যে এবং যদুনাথের কাব্যে খেলারাম নামক কবির নাম আছে। তবে খেলারাম গায়েন কবি কিনা তা নির্ণয় করা এখনো দুঃসাধ্য ব্যাপার।

অষ্টাদশ শতকে ধর্মমঙ্গলের অপ্রধান কবি গোষ্ঠী:মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য শাখার জন্ম সপ্তদশ শতক হলেও এর বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে অষ্টাদশ শতকে এই শতকের উল্লেখযোগ্য ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা হলেন যথাক্রমে

১) ঘনরামচক্রবর্তী - আদিনিবাস কৃষ্ণপুর (বর্ধমান),কাব্য রচনাকাল ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ।

২) নরসিংহ বসু – বাসস্থান বর্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রামে ,রচনাকাল ১৭১৪- ১৭ খ্রিস্টাব্দ।

৩) রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা দ্বিজরামচন্দ্র- বাসস্থান-চামোট,বিষ্ণুপুর রচনাকাল ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

৪) সহদেব চক্রবর্তী- আদিনিবাস হুগলির রাধানগর, রচনাকাল ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দ।

৫) প্রভুরা মুখোপাধ্যায়- বাসস্থানের উল্লেখ নেই রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

৬) হৃদয়রাম সাউ- বাসস্থান বর্ধমানের খুরুল গ্রাম, পরে স্থান পরিবর্তন হয় বীরভূমের উচকরণ গ্রামে। রচনাকাল ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ।

৭) মানিকরাম গাঙ্গুলী- বসবাস হুগলির বেলডিহা গ্রাম ,কাব্য রচনা কাল ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দ।

৮) রামকান্ত রায়- আদি নিবাস বর্ধমান জেলার সেহারা গ্রাম, রচনাকাল ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

এই ৮ জন কবির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দুজন -ঘনরাম চক্রবর্তী এবং মানিকরাম গাঙ্গুলী। এর মধ্যে ঘনরামের অনাদিমঙ্গল বা শ্রীধর্মমঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর ধ্রুপদী সাহিত্য বলে পরিগণিত হতে পারে। এমন কথাও কেউ বলেছেন।

মানিক রাম গাঙ্গুলী: ইনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের অদ্বিতীয় কবি না হলেও তাঁর স্থান অতৃতীয় বলা যেতে পারে। কাব্যটি লোক চিত্র জয়ী এবং বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ।বৈশিষ্ট্য গুলি হল-

ক)ধর্ম পূজার এক স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর কাব্যে আছে। ধর্মের উৎস কল্পনায় বৌদ্ধ প্রভাব কে স্বীকার করে কবি তাঁকে ‘শূন্যমূর্তি’ বলেছেন।

'শূন্যমূর্তি স্মরণ করিয়া সাতবার

অশ্ব চেপে লাউসেন হল্য আগুসার।।'

অথবা

'সবিস্ময়ে লাউসেন শূন্যমূর্তি ভাবে।

তুরঙ্গ উপরে তূর্ণ আরোহন করে।।'

বলাবাহুল্য , এই শূন্যমূর্তি হিন্দু দেব-দেবী নন, ইনি বৌদ্ধদের শূন্য বা মহাশূন্য তত্ত্বের প্রকাশ রূপ।

খ) মানিকের কাব্যে ডোম , হাড়ি প্রভৃতি অন্ত্যজ মানুষদের দ্বারা ধর্ম পূজার বিবরণ আছে।ধর্মের পুরোহিতরাও প্রায় সকলেই নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন

'কম্মকার নাপিত মালাকার।

কপিলা বাইতি বৃষ পুরোহিত আর।।'

গ)তাঁর কাব্যে কালাচাঁদ ধর্মের কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় লিখেছেন যে নুয়াদা ভাঙ্গা মোড়ের পাশে গোয়ালুগ্রামে এই কালাচাঁদ রুপী ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন । এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিতরা সকলে গোয়ালা শ্রেণিভুক্ত। মানিক রামের কাব্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ) ভাষায়, শব্দসজ্জায়, ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রয়োগে কাব্য কুশলতার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বিষয় সন্নিবেশে মৌলিকতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়েছে। মানিকরামের সমস্ত কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত পুরান -উপপুরাণের কাহিনী নানাভাবে রূপান্তরিত হয়েছে।

ঙ)হরিহর বাইতি , কালু ডোম , লখা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মানুষের জীবন চিত্র অঙ্কনে কবির চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন -ধর্মের পূজা দান উপলক্ষে লাউসেন রাজধানী ময়না ভার কালুর হাকন্দে জায়।এই সময় গৌড়ের রাজা উৎকোচ দিয়ে কালুকে বশীভূত করে ময়না দখলে উদ্যত হলে তার পত্নী লখা তাকে তীব্র শ্লেষে তিরস্কার করে এইভাবে:

'এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে।

কাঞ্চন বেচবে কেন কাঁচের বদলে।।

ধিক ধিক তোমার বীরত্বে ধিক ধিক।

ভেকের নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক।।

সুধির সেনের নুন সাধিবো কামনা।

মরণ অবধি আমি রাখিব ময়না।'

এ ধরনের চরিত্র নির্মাণে দক্ষতা তাঁর কাব্যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। মানিক গাঙ্গুলীর কাজ ত্রুটিমুক্ত নয়। সেটি হল আদিরসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর কাব্যে দেখা যায়। বিশেষ করে 'সুরিক্ষা' পালায় তাঁর লেখনী শ্লীলতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে।

১৪.২: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র চিত্রন

চরিত্র চিত্রণে ঘনরামঃ

মধ্যযুগের অন্যান্য শাখা গুলি তুলনায় মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ বেশি এবং মঙ্গলকাব্যের শক্তিশালী লেখকরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে ঘনরাম এর ব্যতিক্রম নন। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী এমনিতেই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় বিশাল ও চরিত্র বিপুল। ঘনরাম পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শে কাহিনীরচনা ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাব্যের চরিত্র বিপুলতা থাকলেও প্রত্যেকটি প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র কে সার্থক রূপ দিয়েছেন। কাব্যে দেবতার অনুগ্রহ পুষ্ট চরিত্রের মহিমা যেমন প্রকাশিত তেমনি সাধারণ মানুষগুলো কেউ তাদের সমস্ত তুচ্ছতায় ক্ষুদ্রতা ও সুখ-দুখ দিয়েই চিত্রিত করেছেন। এমনকি মনুষ্যতর চরিত্র সৃষ্টিতে প্রথম ।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল এবং চন্ডীমঙ্গলের দেবতাদের যতখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্ম ঠাকুরের ইচ্ছে ছাড়া তাঁর উপস্থিতি ও ক্রিয়া-কলাপের দিকটি কাহিনী কাঠামোর দিক থেকে অন্য দুই মঙ্গলকাব্য একটি কাহিনীকে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে পরিণত করা হয়েছে ।সেই কাহিনীর পটভূমি বিন্যাস ও

পরিণতি স্বল্পপরিসরে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণ অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে পৃথক।

লাউসেন:

চরিত্র সৃষ্টি হল আখ্যানকাব্যের অন্যতম প্রধান বিষয়। সেক্ষেত্রে ঘনরাম চক্রবর্তী যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও এই পূজা প্রচার ও দেবতার অলৌকিক ক্ষমতাকে বহন করেছেন লাউসেনের চরিত্র টি। কবি পূর্ববর্তী মহাকাব্য পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের আদর্শেই লাউসেনের চরিত্রকে সার্থক রুপায়ন দিয়েছেন। সমগ্র ধর্মমঙ্গল কাব্যে প্লট বিন্যাসে লাউসেন বেসি গুরুত্ব পেয়েছে। কবি দেখাতে চেয়েছেন যে দেবতার অনুগ্রহ পুষ্ট চরিত্রটির বীরত্ব ও মহিমা কম নয়। সেই অর্থে লাউসেন সমস্ত কাহিনীর বাহক।তাঁর অভিযানের উপর ভিত্তি করেই ধর্মমঙ্গল কাব্য বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের বীরত্ব, সততা ,নির্ভীকতা ,ধীরোদ্ধাত   প্রতিফলিত। ভক্তিতে, বিশ্বাসে , সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সে সর্বগুণে অধিকারী একটি বীর কাহিনী প্রধান অবলম্বিত চরিত্র। এই কাব্যের অন্যতম চরিত্র গুলি তার মত এতটা উজ্জ্বল নয়। কারণ মঙ্গলকাব্যের কাঠামো অনুযায়ী আসলে শাপভ্রষ্ট দেবতা। ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্য তাঁর মর্ত্যে আগমন। তাই লাউসেনের চারিদিকে দেবতাদের একটা পরিমণ্ডল আছে ।বলা বাহুল্য অধিকাংশ প্রধান চরিত্ররা দেবতা অনুগ্রহপুষ্ট। ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্রকে রাবণ বধ করার জন্য অকালবোধন করতে হয়েছিল। ঘনরাম চক্রবর্তী লাউসেন ও কর্পূর সেনকে ভাগবতে কৃষ্ণ বলরাম এর সঙ্গে তুলনা করেছেন- ‘কৃষ্ণ বলরামে যেন নাচিয়া বেড়ায় ‘। বোঝা যায় ধর্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্যমূলক রচনায় কবি লাউসেনকে কতখানি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এটা ঠিক যে লাউসেনের নির্ভীকতা ও মহত্ব আদর্শের জন্য কাব্যটি পাঠকের কাছে এত আকর্ষণীয়। লাউসেনের মাতা ছিলেন রঞ্জাবতী ভক্তিবশে পুত্রকে ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ,মৃত পুত্রকে জীবিত রূপে আবার ফিরে পান। ধর্মের কৃপায় এই পুত্রলাভ করে তিনি পুত্রের নাম রেখেছিলেন লাউসেন ।কিন্তু কাহিনী র অগ্রগতিতে বৈপরীত্যের

বিন্যাস ঘটিয়ে কবি লাউসেনকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। লাউসেন মাতা রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মহামদ লাউসেনের শত্রু ছিলেন। তিনি লাউসেন কে চুরি করলে হনুমান কর্তৃক লাউসেন উদ্ধার পায় ।ধর্মের প্রতি কৃপা থাকার জন্য বাল্যকালে লাউসেন শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন সে মল্লবিদ্যাও শিক্ষা করে উল্লেখযোগ্য যে কবি নিজে মল্লবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ।

এরপরই লাউসেনের বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কাহিনী শুরু ।মামা মহামদের সঙ্গে পরিচয় করার জন্যই তার গৌড় যাত্রা। এই অভিযানে কামদল বাঘের আক্রমন ও কুমিরের আক্রমণে তার প্রাণ বিপন্ন হলেও ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় তিনি সাহস ও শক্তি নিয়ে এগিয়ে গেছেন।গৌড় যাত্রাকালে জামতি নামকস্থানে দুশ্চরিত্রা নারীর প্রলোভনের জাল পেতেছিল।সুরিক্ষা নামে একটি পতিতা রমণীর হেঁয়ালির উত্তর দিয়ে লাউসেন তার বুদ্ধিবৃত্তি ও চরিত্র বলের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর গৌড়ে উপস্থিত হয়ে লাউসেন আবার বিপদে পড়েন। মহামদ কিছু কিছু মিথ্যা ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত করে তাকে বন্দী করে। কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন মুক্তি পান।

গৌড় প্রদেশে লাউসেনের বীরত্ব প্রদর্শন শুরু হয় যখন মহামদ গৌড়েশ্বর কে কামরুপ আক্রমণের পরামর্শ দেয় সেই যুদ্ধে লাউসেন সেনাপতি নির্বাচন হন কারণ মদের আশা ছিল কামরুপ যুদ্ধের নিহত হবেন ।কিন্তু ভক্ত রক্ষা করলেন কে তাকে বিপদে ফেলবে? প্রভূত শক্তির অধিকারী এবং শক্তিশালী লাউসেন দুস্তর ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে কামরুপ জয় করলেন তার প্রবল প্রতাপে-

‘কেউবা কাতর হয়ে দাঁতে করে কুঠা।

কেউ কেন্দে ছেন্দে ধরে পা লুটা।’

দৈবশক্তিতে বলিয়ান হলেও ঘনরাম চক্রবর্তী লাউসেনের যে বিরক্ত বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর দৈবী উদ্দেশ্য অনেক সময় চাপা পড়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লাউসেনের বীরত্ব কাহিনী।

রামের হরধনুভঙ্গ অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি পৌরাণিক ধারাকে সামনে রেখে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে অনুরূপভাবে সাজানো হয়েছে। শিমুলার কন্যা কানরা সুন্দরী হিসেবে পরিচিতা ছিলেন ।গৌড়েশ্বর কাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। এদিকে কানরা প্রতিজ্ঞা করে সে তাকেই বিয়ে করবে যে লোহার গন্ডারকে এক আঘাতে দ্বিখন্ডিত করতে পারবে সবাই ব্যর্থ হলে লাউসেন কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এক আঘাতে শিরশ্ছেদ করেন এবং সফল হয়ে কানড়া কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে লাউসেন অসম্মত হয় ।তখন দেবী পার্বতীর চুক্তি মতো যুদ্ধে দেবীর কাছে পরাজিত হয়ে কানড়াকে বিবাহ করে।

সমগ্র কাব্য জুড়ে লাউসেনের বীরত্ব প্রদর্শন কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।তবে তাঁর গৌড় যাত্রার কাহিনী এবং গৌড়ের বিভিন্ন ঘটনাগুলি কাব্যকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে ।মহামদের পরামর্শে বিরুদ্ধে পাঠানো হলে ইছাই ঘোষের সেনাপতি নিহত হন। ইছাই ঘোষ পরাজিত হন। এরপর লাউসেন ধর্মের বলে বলিয়ান হয়ে পশ্চিমে সূর্যোদয়, দেশে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন এর জন্য তপস্যায় রত হলেন ।সুতরাং ধর্মমঙ্গল কাহিনী কাঠামো শীর্ষবিন্দুতে বা মূল প্লট বিন্যাসে লাউসেনের কাহিনী গুরুত্ব পেয়েছে।

এই কাব্যের নায়ক চরিত্র লাউসেন। সাপভ্রষ্ট কশ্যপ কুমারকে ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচারের জন্যই তার মর্ত্যে আগমন। তাঁই এই চরিত্রটি চতুর্দিকে দেবদেবীর পরিমন্ডল লক্ষ করা যায়। অবশ্য সব পৌরাণিক সাহিত্য এবং প্রাচীন মহাকাব্য গুলিতে দেখা যায় সব বীর চরিত্রই দেবতার অনুগ্রহে পুষ্ট ঈশ্বরের অবতার স্বয়ং রামচন্দ্রকেও রাবণ বধ করার জন্য অকালবোধন করতে হয়েছিল। মহাভারতে কর্ণের বীরত্বের মূলে ছিল তাঁর কবচকুণ্ডল অর্জুন একান্তভাবে কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু এতে যদি তাঁদের বীরধর্মের মহিমা ক্ষুন্ন না হয় তাহলে লাউসেনের ধর্ম নির্ভরতা ও তার চরিত্র মহিলাকে খর্ব করতে পারেনা ।লাউসেন ধর্ম ঠাকুরের অনুগ্রহপুষ্ট। তাকে ধর্মঠাকুর সব রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন বটে, কিন্তু বিপদে পড়ার আগে কিছুই করেন নি। এখানে লাউসেনের মহিমা প্রকাশিত ।যুদ্ধে ধর্ম ঠাকুরের সাহায্য

লাউসেনের বৃহত্তম মহিমাকে ক্ষুন্ন করেনি, কারণ ইছাই ঘোষও দেবী পার্বতীর কৃপা পুষ্ট হয়ে যুদ্ধ করেছে।

কিন্তু এই দৈবী অনুকুলের কাহিনী বাদ দিলেও লাউসেনের মধ্যে এক মানবীয় চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়। নৈতিকতা ও আদর্শ তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে। আখড়া পালায় দেবীর ছলনা কে জয় করে তিনি জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন। 'জামতি পালা' ও ' গোলাহাট পালা'য় লাউসেনের মোহমুক্ত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও পিতা মাতার প্রতি ভক্তি ধর্ম ,পথ অবলম্বন এবং নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি আদর্শ মানবীয় গুণ এর পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে দিয়ে লাউসেনের মহিমাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। পৃথিবী ত্যাগ করে স্বর্গে যাবার অনিচ্ছা তার সাপভ্রষ্ট চরিত্রের মর্ত্য -মমতা সঞ্চার করে চরিত্রটির সামগ্রিক আবেদন অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে।

কর্ণ সেন

কর্ণসেন চরিত্রালোচনায় পীযূষকান্তি বলেছেন –কর্ণসেনের মধ্যে দিয়ে একজন সামন্তরাজ এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। গৌড়ের আদেশ তিনি সবসময় মেনে চলেছেন ইছাই ঘোষ তার সর্বনাশ করেছে- গৌড়েশ্বরের কৃপাতেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ।কিন্তু তাই বলে তাকে দুর্বল চরিত্রের পুরুষ বলা যায়না লাউসেনের গৌড় গমনে রঞ্জাবতীর আপত্তি থাকলেও তাঁর আপত্তি নেই কারণ তিনি জানেন –'পুত্রের প্রতাপে হয় পৌরুষ পিতার ।'লাউসেন তার পিতা আদর্শের দ্বারা অনেকাংশেই অনুপ্রাণিত হয়েছেন। লাউসেনের বিপদসংকুল যাত্রায় তিনি বাধা দেননি। কেবল ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়রাজের আদেশে লাউসেনের যুদ্ধযাত্রা তিনি বাধা দিয়েছেন। ইছাই ঘোষের পূর্বস্মৃতি তাঁর মনে জাগ্রত আছে বলেই তাঁর এই বাধাদান ।একপুত্র স্নেহাতুর চিরন্তন পিতার চরিত্র বৈশিষ্ট্যই এখানে তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে।

গৌড়েশ্বর

গৌড়েশ্বরএর চরিত্রটিও জীবন্ত ।লাউসেনের মতোই সে দুর্বল স্নেহশীল অথচ অন্যদিকে মন্ত্রী মহামদের পরামর্শ ও তিনি আগ্রহ্য করতে পারেননি। একটি ঘটনায় রাজার চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। লাউসেন যখন অশেষ বিক্রমে রাজার পাট হস্তি বধ করেছেন তখন লাউসেনের অপূর্ব বীরত্বে তাঁর আনন্দ হয়েছে; তিনি তাঁকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি বেদনাবোধ করেছেন-

'হরিশে বিপদের রাজা ভালোভাবে বলে।

হরির উদ্বগে অন্ন অন্তরে উথলে।।'

এখানে ভালো-মন্দ মিশিয়েই গৌড় রাজার চরিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে।

মহামদ

কলির অংশ থেকে মহামদ এর জন্ম হবে এই ভবিষ্যৎ বাণী সৃষ্টি পত্তনে করা হয়-

'জন্মেছে কলির অংশে পাত্র পাপমতি।

সে হবে তোমার ভাই, কর্ণ সেনাপতি।।'

ধর্মমঙ্গলের লাউসেনের বিপরীত ভূমিকায় সবচেয়ে সক্রিয় চরিত্র মহামদ। লাউসেনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব ও তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তই চরিত্রকে ঔজ্জ্বল্য দিয়েছে। মহামদ ধর্মমঙ্গলের কেন্দ্রবিন্দু, তাকে কেন্দ্র করে ধর্মমঙ্গলের দ্বন্দ্ব এবং ঘটনা সংঘাত অনিবার্য বেগে পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। রামায়নের রাবণ ও মহাভারতের দুর্যোধন চরিত্রের সঙ্গে মহামদ চরিত্রের তুলনা করা যায়। গৌড়েশ্বর তার অমতে তার ভগ্নির সঙ্গে বৃদ্ধ বরের বিবাহ দিয়েছে, আর এখান থেকেই তাঁর ক্রোধের উদ্রেক ।এই ক্রোধ গিয়ে পড়েছে রঞ্জাবতী তাঁর স্বামী ও তার পুত্রের উপর। তাই নিদারুণ ক্রোধে সে কর্ণ সেন কে বলেছে-

'দৈব কি হৈলা বন্ধা উগ্রসেন তুমি।

সবংশ করিতে ধ্বংস কংসরুপী আমি।।'

শ্রীমৎভাগবত এর কংস চরিত্রটির প্রভাব মহামদ চরিত্রের মধ্যে এসেছে ।লাউসেনকে হত্যা করার জন্য তাঁর পরিকল্পনাও কংসের পরিকল্পনার মতোই-‘ রোগ ঋণ রিপু নারাখিব অবশেষে’। লাউসেন কে মহামদ পরোক্ষভাবে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করেছে। লাউসেনের অবর্তমানে ময়না ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে ,এবং একেবারে অসম্ভব পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় ঘটানোর জন্য পাঠিয়েছে। এই সমস্ত নিষ্ঠুরতার আড়ালেও এক গোপন স্নেহধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

কামরূপ থেকে ফিরে এসে মহামদ প্রথমেই –‘রঞ্জাবতী ভগ্নী বলে ডাকেন সোহাগে।’ প্রিয় ভগ্নি রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়নি, পিতা মাতা আছে তাই গৌড় রাজের আদেশে। বাইরে গিয়েও মহামদ স্বস্তি পায়নি। পিতা-মাতার প্রতি তার কর্তব্যবোধ আর ভগ্নিপতি তাঁর স্নেহ শ্রীলতা ও মমত্ববোধ তার চরিত্রকে মধুর করেছে। তাঁর সব চক্রান্তের মুল এসে থাকলেও তাঁর ভগ্নি স্নেহ কম নয় ।এদিক থেকে মহামদ পাঠকের সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। তাই তাঁর নিষ্ঠুরতার মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা আছে।

ইছাই ঘোষ

ঘনরামের বাড়ির কাছাকাছি থেকে অর্থাৎ আমরা বর্ধমান জেলার থেকে ইছাইয়ের গৌড়েশ্বর বিরোধিতাকে খানিকটা সমর্থন করতে পারি। বিশেষ করে জাতিভেদ না করে তার ঢেকুর প্রতিষ্ঠা সমর্থনযোগ্য। তাছাড়া কর দিতে না পারায় তাঁর পিতা যেভাবে ,মহামদ দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে পুত্র হয়ে তার যথার্থ প্রতিবাদ করতে পেরেছে। ইছাই ঘোষের চরিত্র জটিলতা হীন। পীযূষকান্তি মহাশয়ের মতে- সে প্রথমেই কর্ণসেনকে দমন করে দেবীর সহায়তা নতুন রাজ্য স্থাপন করেছে ।পরে যখন লাউসেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেছেন তখন দেবীর সহায়তা এসে প্রচন্ড যুদ্ধ করেছে কিন্তু দেবতাদের চক্রান্তে লাউসেনের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে ।ইছাই দেবীর আনুকূল্য পেলেও দেবীর প্রতি তার সন্দেহ জেগেছিল এবং সেজন্যই তার পতন

ঘটল। এই ধরনের চরিত্র চিত্রণেই খুবই বাস্তবানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রটি খানিকটা ট্র্যাজিক চরিত্র।

কালু ডোম

ঘনরামের কৃতিত্ব হল চরিত্র গুলির বাস্তব চিত্রনে ।তাঁর চরিত্র গুলিকে তিনি নিজস্ব জগতে এবং পরিমণ্ডলে রেখেছেন অহেতুক আদর্শ বোধের অত্যুজ্জ্বল বর্ণে লিপ্ত করেন নি। তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো কালু ডোমের চরিত্র। বিভিন্ন যুদ্ধে তার বীরত্ব তার চরিত্রকে বিকশিত করেছে। তার বীরত্ব অলৌকিকতা অপ্রাকৃত বীরত্বের কাহিনী নয় ।দুর্জয় কামরূপ দেখে তাঁরও বুকে কেঁপেছে। কিন্তু পরে সে এগিয়ে গেছে এবং কামরুপ যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। কামরূপ রাজাকে বন্দী করেছে। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে ও তার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কালুডোমের প্রবল বীরত্বের মধ্যে তার দুর্বলতাগুলো রয়েছে। এই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে জাগরণ পালায় কিছু কালুর চরিত্র অসামান্য ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে তার সত্য রক্ষায়। তার বিশ্বাসঘাতক ভাই বলেছে যে শক্তিতে তাকে আনা যাবেনা ,ছলনা করে আনতে হবে তাই সে প্রথমে কালুকে দিয়ে সত্যবন্ধ করায়, যে কালুর কাছে যা চাইবে তা কালুকে দিতে হবে। কালু তাতেই রাজি হওয়ায় সে কালুকে নিজের মাথা কেটে দিতে বলেছে-

‘কি করিব কোথায় হতে পরকাল মজে।

এপাপের পরশ পাছে সে মহারাজে।।

এপাপের না হয় পাছে পশ্চিমে উদয়।

সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়।।

সত্য না লঙ্ঘিব আমি ইহা কারণ।

অতএব অধম তোর বাঁচুক জীবন।।’

লাউসেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয় তাই সে নিজের মায়ার বিনিময়ে সত্য রক্ষা করেছে। এতে লাউসেনের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠাই প্রমাণ দেয় ।লাউসেন স্বর্গারোহণ

করার সময় কালুকে সঙ্গে দেখেছে কিন্তু মাংস মদ ছেড়ে সে স্বর্গে যেতে রাজি হয়নি।মর্ত্যের প্রতি তার এই আসক্তি তার চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছে।

রঞ্জাবতী

কাব্যের শুরুতে 'স্থাপনা পালা'র গীতারম্ভে জানানো হয়েছে ইন্দ্রের নটী অম্বুবতী স্বর্গে নাচতে গিয়ে তালভঙ্গ করলে সে মর্ত্যে আসার ছাড় পায়। এই অম্বুবতীই লাউসেনের মা রঞ্জাবতী ,স্বর্গের সাপভ্রষ্ট অপ্সরা ।ঘনরামের কাব্যের মধ্যে তাকে মানবী রূপেই চিত্রিত করেছেন। একমাত্র সালে ভর দেওয়া ঘটনা ছাড়া তার চরিত্রের অন্য কোথাও অলৌকিকত্ব নেই। বাঙালি পরিবেশের এক স্নেহসন্তাপ বাস্তব জননী রূপেই চিত্রিত হয়েছে। বিবাহের পর পতিগৃহ থেকে প্রতি গৃহের পরিবার-পরিজনের জন্য তার মন ব্যাকুল হয়েছে। ভাইয়ের কুশল সংবাদ না পেয়ে সে স্বামীকে ভাইয়ের সংবাদ নেওয়ার জন্য জোর করে গৌরে পাঠিয়েছে। কিন্তু যখন শুনলো যে ভাই তাকে নিঃসন্তান বলে গঞ্জনা দিয়েছে তখনই সে বলেছে –'আজ হতে ও পথে আপনি দিন কাঁটা।' স্বামীর প্রতি মমত্ব এবং সেইসঙ্গে আত্মমর্যাদাবোধ এখানে রঞ্জাবতী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। লাউসেনের গৌড় যাত্রার সংকল্প জেনে রঞ্জাবতী আশঙ্কায় ভীত হয়ে তাকে যেতে বারণ করেছে এবং বলেছে-

'দুর্গম গৌড় যাবে আশা নাহি করি।
দেখো বাপু দাঁড়ায়ে অভাগি আগে মরি।।'

কিন্তু কোনমতেই যখন পুত্রকে নিবৃত্ত করা গেল না তখন রঞ্জাবতী তাকে বলেছে-

'কালী অতি শুভদিনে গৌড় তুমি যাবে।
অভাগীর মতে বাপু আজি কিছু খাবে।।'

এক বাঙালী মায়ের চরিত্র বৈশিষ্ট্যই তার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। শাপভ্রষ্ট দেবতার জননী হয়েও রঞ্জাবতী সারা জীবন দুঃখ আর বেদনায় কেটে গেছে। সন্তানবতীর সময় তার মত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন যে স্বামীকে ত্যাগ করে সে

স্বর্গে ও যেতে চায় না নারী হিসেবে সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। কোন দেবী চরিত্রের মহিমা তার মানবিক চরিত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারেননি। স্নেহময়ী জননীও পতিপরায়ণা নারী রূপেই এক অনির্বচনীয় মহিমায় রঞ্জাবতী চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লখাই

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ডোম সম্প্রদায়ের রমনীরা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। তবে লখাই বীর রমণীর ভূমিকা পালন করলেও সে পতিব্রতা রমণী , বীরাঙ্গনা হয়েও দেবতার ভক্তিতে অটল। কবির বর্ণনা পারদর্শীতায় লখাই মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র প্রমীলা চরিত্রের পূর্বসূরি হয়ে উঠেছে.

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুর্লভ বীরঙ্গনা চরিত্র কালু ডোমের পত্নি লখাই। পীযূষ কান্তি মহাপাত্রের মতে- এই চরিত্রটির মধ্যে নিষ্ঠা ,স্নেহশীলতা ,কর্তব্যবোধ, শুষ্ক বিচারবুদ্ধি, অসাধারণ ধৈর্য ও বিবেচনাবোধের সমন্বয় ঘটেছে।লখাই এর পরিচয় দিতে গিয়ে কালু লাউসেন কে বলেছে –গৃহিণী সনকা লখে সমর সিংহিনী।' অর্থাৎ কালুর প্রথমা পত্নী সনকা গৃহিণী আর দ্বিতীয় পত্নী লখাই সমরে নিপুণা।

লাউসেন রাজার আদেশে পশ্চিম উদয় দিত হাকন্দে গেলে কালু লখাইকে ময়না রক্ষার ভার দিয়ে যায়। অর্থাৎ একজন মহিলা দায়িত্ব পাচ্ছে যা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। যদিও বাল্যকালের সেই শক্তি না থাকলেও লখাই-এর মনের শক্তি প্রবল। তাই প্রথমে স্বাভাবিকভাবে গুরুদায়িত্ব পালনে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেও স্বামীর অনুরোধে সে অস্ত্র ধারণ করে নিজের শক্তিসত্তার পরিচয় দিয়েছে। তার বীরত্ব দেখে কালু বলতে বাধ্য হয়েছে-'শুভক্ষণে সেবেছিলে ওস্তাদের পা।'

কালু মদ্যপান করে কর্তব্য অবহেলা করেছে আর লখাই সব দায়িত্ব গ্রহণ করে মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। মহামদকে বলেছে-

'বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম।

বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।’

এই উক্তিতে সে তেজস্বিনী নারীর পরিচয় দেয়। যুদ্ধ থেকে বিরত হওয়ার জন্য মহামদ লখাইকে প্রলোভন দেখালে সে মহামদকে বলেছে-

‘ডোম হল আপন ভাগিনা হল পর।

এই যুদ্ধে এতকাল রাজার পাত্তর।।’

‘ঘাস হেন বাসি পাত্র তোর পারা বাদী’ অর্থাৎ তোর মতো শত্রুকে তৃণ বা তুচ্ছ জ্ঞান করি। তাছাড়া বলেছে,’জাতি রাঢ় আমি রে কর্মে রাঢ় তুঁ।'

একক উদ্যোগে রণসজ্জা করে সে যুদ্ধে অগ্রসর হলো। যুদ্ধ থেকে ফিরে সে প্রমত্ত নিদ্রিত কালুকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য উত্তেজিত করে, আঘাত করে-

‘বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমারা থাক সাক্ষী ।

চাপড়ে চিয়ার পতি না হব পাতকী।।’

এর পরেও কালু যুদ্ধে যেতে না চাইলে লখাই স্বামীকে গঞ্জনা দেয়। পুত্রকে যুদ্ধে যেতে বলেছে। পুত্র দ্বিধাগ্রস্থ হলে পুত্র অসম্মতি শুনে বলে –‘মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।' কর্মেও কথায় বর্তমান চরিত্রটি পাঠকের আত্মীয়তা অর্জন করতে পেরেছে।

লখাই চরিত্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বাঙালি নারী গৃহচারিনী রূপের পাশাপাশি প্রতিবাদী সত্তার সংস্থাপনে চরিত্র নতুনত্বের সৃষ্টি করেছে। বিশেষতঃ মঙ্গল কাব্য ধারায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। স্বামী পুত্রকে যেভাবে নিশ্চিত মরণের মুখে পাঠাবার সংকল্প করেছে তাতে লখাইকে সাধারণ নারী বলে মনে হয় না। এই নারীর মধ্যে যে শক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে। তাতে করে তাকে ডোম রমণী বলে মনে হয় না।

কানড়া

ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্য একটি বীররমণী হল কানড়া চরিত্র।সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানড়া যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিনী। তার ঘোষণা-‘সেজে গেলে সংহারিব সহস্র

অর্জুন'।তার পিতৃ রাজ্য আক্রান্ত হলে সে অশ্বারোহনে স্বয়ং সৈন্য চালনা করেছে। গৌড়েশ্বর তাঁর পাণিপ্রার্থী;কিন্তু সে মনে মনে বীরত্বের জন্য লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে বিজয়িনী হয়ে সে বাঞ্ছিত বরকে লাভ করতে পেরেছে।

কলিঙ্গা

কলিঙ্গা চরিত্রটির মধ্যে ঘনরাম গৃহচারিনী নারীর অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। তার স্বামী প্রেম, স্বপত্নী প্রেম , দেবভক্তি ও প্রভুভক্তি তাকে স্বাতন্ত্য বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরেনি। তবে তার মহিমা সমুদ্ভাসিত। এটা ঠিক যে ধর্মমঙ্গলে ঘনরাম নারী চরিত্রগুলিকে গৃহচারিনী রূপের পাশে প্রতিবাদী সত্তার বীর রমণী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। নারী চরিত্রের এই একটি বিশেষ দিক ধর্মমঙ্গল কাব্য গুলির গতানুগতিক ধারায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

১৪.৩: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্র

সাহিত্য ও সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রচয়িতা নিজের সামাজিক মানুষ বলে সামাজিক বিষয়েও উপাদান কে উপেক্ষা করতে পারেননি। ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য মূলত ধর্মমঙ্গল প্রচারক মঙ্গলকাব্য হলেও অষ্টাদশ শতাব্দী কবির সমকালীন সময়ের সমাজ ইতিহাস সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও এই কাব্যে সমাজ চিত্র সন্ধান করার একটু অসুবিধা আছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই সুখ-দুঃখের বর্ণনায় কবির কল্পনা মিশে যায়। এই কল্পনা থেকে যথার্থ সামাজিক প্রসঙ্গটি নির্ণয় করা কিছুটা দুঃসাধ্য বটে। তবুও কবিতার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রতিফলন ঘটাতে ভোলেননি।

প্রজাদের অবস্থান:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে শাসকবর্গের অত্যাচারের চিত্র তুলে ধরেছেন। এই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মহামদ কর্তৃক প্রজাগণ এর উপর অত্যাচারের কাহিনীতে। যার মধ্যে স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের চিত্র প্রতিফলিত। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সেইসময় প্রজাসাধারণের

ঘর-বাড়ি লুঠ করাতে, অসৎ ব্যক্তি ক্ষমতা পাওয়ার ফলে সৎ ব্যক্তিরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা লাঞ্ছিত হয়েছিল।কবির কথায়-

‘রাজ কর লোকের তে-সনি নিল বাড়া।

অতেব সকল প্রজা হলো দেশ-ছাড়া।।’

প্রজাদের দেশ ছাড়ার ফলে সামাজিক অস্থিরতা দেখা যায়।

জীবিকা:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে নগরপত্তন বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোকের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ইছাই ঘোষের ঢেকুর গড়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ,ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, বিভিন্ন ধরনের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করত।পসারি ,তামুলী , তাঁতি, তেলী , মালী , বণিক , কুমার , শাঁখারী , কর্মকার , কলু, কৈবর্ত্য , ছুতার , বাইতি , জালু , রজক প্রবৃত্তি ধারী মানুষ।এছাড়া যুদ্ধে বাদ্য বাজানোর জন্য কিরাত এবং পুরী রক্ষা করার জন্য চোয়াড় , খয়রা , কোল প্রভৃতি মানুষের কথা বলা হয়েছে। কাব্য অনুযায়ী

‘ইছাই দুর্ব্বার   করিল রাজার।

দোহাই দূস্তর দূর।।

চৌদিকে পাহাড়   বেড়ী বাড়ী গড়।

দুর্গম গহন কাটি।

করিয়া চত্বর   বসাল নগর

রাজার বসতবাটী।।

করিয়া আসন   গাড়িল নিশান

সম্মানে বসান পদ্য।

স্বধর্ম্ম মন্ডিত   বিধর্ম্ম খন্ডিত

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য।।

সমাদরে তস্য বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য।

ধন্য ধরা ধর্ম্মপাল।

সম্মুখ সমর মাঝে অকাতর

বীরবিক্রমে বিশাল।।

করি বন্দোবস্ত বসিল সমস্ত

কুলীন কায়স্থ কত।

পবিত্র চরিত্র ঘোষ বসু মিত্র

মাজ্জিত মৌলিক যত।।

সিংহ দাস দত্ত আদি যে মহত্ব

বসিল উত্তর রাঢ়ী।

গোপ অবতংশ কত রাজবংশ

কুমার করিল বাড়ী

তিন কুল রাজ পুরে সুসমাজ

মহত্ত্ব মর্যাদাবান।

গণ্য গোপ যত করিল বসত

পাল ঘোষ কলে পাণ।।'

সামাজিক অবস্থান:

ব্রাহ্মণ থেকে রজক পর্যন্ত প্রভৃতি মানুষ যেমন একই সঙ্গে বসবাস করত তেমনি হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানেরাও বসবাস করত। কবি জানিয়েছেন-

'পাইয়া মর্যাদা কত মীরজাদা।

সৈয়দ পাঠান কত।'

তারা 'পেলে এক রুটি সবে খায় বাঁটি' অর্থাৎ এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো বিরোধ ছিল না।

পারিবারিক সম্পর্ক:

ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের বাঙালির পারিবারিক সম্পর্কের মধুর ছবি এঁকেছেন। মায়ের আশীর্বাদই ছিল পুত্রের সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি-

'লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।

জননীর আশীষে জগতে হয় জয়।।'

মাতা পিতার সঙ্গে ভ্রাতার সম্পর্কটিও তুলে ধরা হয়েছে-

'শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।

শত্রুতো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব।।'

বিবাহ:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে যে বিবাহ চিত্র তুলে ধরেছেন তার মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালির বিবাহ চরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। রঞ্জাবতীর বিবাহে বিচিত্র চন্দ্রাতক সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল, নিচে সপ বিছানো হয়েছিল এবং এই বিয়েতে কুটুম্ব ও বন্ধুরা নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে মঙ্গলদ্রব্য কন্যার কপালে ছোঁয়ানোর কথা বলা আছে। বিয়ের জন্য সেই সময় ধান-দূর্বা, কুসুম,ঘৃত, দধি, চন্দন, সিন্দুর, তাম্র, রুপা,সোনা,হরিদ্রা,দর্পণ ইত্যাদি নানা উপাদানের কথা বলা হয়েছে। নানা রত্ন ও বসন দিয়ে কন্যাকে বরণ করা হত-

'বসন ভূষণ গুয়া মনআপ মালা।

সবাই জোগান রঞ্জা বরণের ডালা।।

কপালে চন্দন দিয়ে বর কে বরণ করা হত-

বিধিমতে বরণ করয়ে রঞ্জাদাসী।।'

এবং বিবাহে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল

লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার:

সেই সময়ে সমাজে নানা প্রকার লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার মানা হত। কলিঙ্গর বিবাহ বর্ণনায় বলা হয়েছে-' আটদিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।' তন্ত্র মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকে মানুষের বিশ্বাস ছিল।সন্তান কামনার নানারূপ অনুষ্ঠান ও ব্রত পালন করা হত, এমনকি মানত পর্যন্ত করা হত-

'শিবার্চনা,শান্তি কত ব্রত উপবাসে।

কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে।।'

এছাড়া দৈবজ্ঞকে হাত দেখানোর প্রচলন ছিল।সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল। কর্ণ সেনের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে- 'চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা।'

বশীকরণের জন্য ঔষধের ব্যবহার ছিল। অন্নপ্রাশনের কথা বলা হয়েছে- 'সাধে অন্নপ্রাশন করিল ছয় মাসে।' মেয়েদের সাত মাসে। কোথাও যাত্রা করলে শুভ-অশুভ ব্যাপারটি দেখা হত-

'অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্মচীল

শকুনি গৃধিনী আগে করে কিল কিল।।'

বিদ্যাচর্চা:

লাউসেনের বিদ্যাচর্চার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্যাচর্চার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর যুক্তাক্ষর, বানান শিক্ষা ও ব্যাকরণ শেখানো হত। অংক শিক্ষার পর ধাতুরূপ ও শব্দরূপ এবং বেদবানী শেখার জন্য পাণিনি পড়ানো হত।

প্রসাধন ও অলংকার:

ঘনরাম তাঁর কাব্যে নারীদের প্রসাধন ও অলংকারের বর্ণনা দিয়েছেন। 'আখড়া পালা'য় পার্বতীর প্রসাধন অলংকারের বর্ণনায় সুচিত্রিত কাঁচুলি, কপালে সিন্দুর, চোখে কাজল, ভ্রুর উপর বিন্দু বিন্দু গোরোচনা দিয়ে অর্ধচন্দ্রাকার সজ্জা, গজমতির হার, পুঁতির হার, নাকে কানে অলংকার, বাজুবন্ধ, ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। এইভাবে ঘনরাম তাঁর কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

সমাজ চিত্র:

ধর্মমঙ্গলকে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য বলা হয়।ডোম জাতির বীরত্বে, বাঙালি বীরাঙ্গনাদের চরিত্রচিত্রণে ধর্মমঙ্গল বিষয়বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ নতুন। গভীর সামাজিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ধর্মমঙ্গল কাব্য। এক একটি বাক্য প্রবচনের মত- 'কলি কালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।'

লখাইর সপত্নী সনকার মুখ দিয়ে মাত্র একটি কথায় কবি বাঙালি সংসারের যে চিত্র এঁকেছেন তা উল্লেখযোগ্য। শত্রু এসে নগর আক্রমণ করলে লখাই তার সপত্নীর কাছে নগর রক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করল। এই সপত্নী কালু ডোমের উপেক্ষিতা পত্নী, সে শোনালো-

'মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।

দাসীটে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া।।'

বাঙালি সমাজের পুরুষেরা ভ্রাতৃবৎসল তাই যুদ্ধে বড় ভাই শাকার মৃত্যুসংবাদ শুনে যুদ্ধ সজ্জা করতে করতেও ছোটভাই শুকোর চোখ অশ্রুসজল-

'শত্রু তো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব।।

যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।

হেন শোক বুকেতে বাজিলো বজ্রাঘাত।।'

প্রাচীন বঙ্গের সমাজের জাতীয় বীরের ছবিতে পূর্ণ ধর্মমঙ্গল। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল আয়তনের প্রায় মহাকাব্যের সমান।রাঢ় জাতির আশা-আকাঙ্খা এ কাব্যে মূর্ত। পৌরাণিক প্রসঙ্গ আনায় এটিকে অনেকে পৌরাণিক মহাকাব্য বলেন।রাঢ়ের সমাজ, দেবদেবী, ঐতিহ্য ও মধ্যযুগের বীরত্বের কাহিনীতে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পূর্ণ। ধর্মদেবতার পাশাপাশি ভাগবতে কৃষ্ণ ও কংসের সঙ্গে লাউসেনের তুলনা কবির মৌলিক সংযোজন। ইছাই ঘোষের আরাধ্যা দেবী চণ্ডীও এ কাব্যের অন্যতম মুখ্য চরিত্র। শাস্ত্রজ্ঞ কবি বহুশাখা কাহিনীতে ভরিয়েছেন তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য। অপ্রধান চরিত্রও আছে প্রচুর। মহাকাব্যসুলভ অলৌকিকতা ঘনরামের কাব্যে লভ্য , তাই এটিকে জাতীয় মহাকাব্য বলা সমীচীন।

১৪.৪: ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কাব্য ভাষা

মধ্যযুগের শেষভাগ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্যের ভাবা ব্যবহারের মধ্যে বৈদগ্ধ্যের ছাপ সুস্পষ্ট। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে ভাষা ব্যবহারের মধ্যে কিছু কিছু অংশে রুচিদুষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগের যেসকল কবি কাব্যরচনায় ভাষা ব্যবহারে সচেতন শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী অন্যতম। তাঁর মার্জিত রুচিবোধ ও শৈল্পিক ভাষারীতির রীতির প্রয়োগে ধর্মমঙ্গল কাব্য যথার্থ রাঢের জাতীয় মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত কাব্যভাষার আলোচনাটি তিনটি পায়ে বিভক্ত করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যায়-

ক) শব্দ চয়ন ও শব্দ বিন্যাস

খ) প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার প্রয়োগ

গ) চিঠি-পত্রাদির প্রয়োগ।

ক) ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে শব্দ চরণ ও শব্দ বিন্যাস :

ঘনরাম তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ, সংস্কৃত জাত বা ততভব শব্দ, দেশজ শব্দ, আরবি-ফারসি শব্দ সাবলীল ভাবে প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণ প্রসঙ্গে অরুণ, দক্ষ, দুহিতা, অংশুমান, অনুবন্ধ, কলধৌত প্রভৃতি তৎসম শব্দ উল্লেখযোগ্য। আর উগারে "কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গুর্জরে' (আখড়াপালা) , কাটারি, সুরজ, সম্প্রীতি প্রভৃতি সংস্কতজাত শব্দ। ইনাম, তালাক, নফর, নকিব, মাফিক, তোবা, খোদা, কসম, গোহারি, তজবিজ, তরাজু প্রভৃতি আরবি শব্দ, ইজার বেগাবি কামান, মাফিক প্রভৃতি ফারসি শব্দ এবং আটকুড়া, আদুড়, ঠেঙ্গা, ঝাঁটা, ঝাঁপা প্রভৃতি দেশজ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

খ) ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে শব্দ চরণ ও শব্দ বিন্যাস :

প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক ভাষার পুরাণ সাহিত্যে ধাঁধা বা হেঁয়ালির ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীকালে এই সকল ধাঁধাগুলিকে লোকসাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ধ্রুপদী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। সবাপ্রেক্ষা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য ঋগবেদের মধ্যেও ধাঁধার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আর প্রাচীনতম ধাঁধাগুলি ছিল সরল ভাবে লিখিত একটিমাত্র প্রশ্নে। পাদপূরণের অন্ত্যমিল তখন অনুপস্থিত ছিল। যেমন কোন পাখির ডিম নেই? উত্তর- বাদুড় প্রভৃতি ধাঁধা। ধাঁধার গঠন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে দেখা যায় একটি জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর নিয়েই গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বক্তব্য- "ধাঁধা এবং তার উত্তর উভয়ে মিলেই একটি ধাঁধার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। উত্তর ছাড়া অর্থাৎ যে সব জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই, কিংবা জিজ্ঞাসার মধ্যেই উত্তর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে তাকে যেমন ধাঁধা বলা হয় না, তেমনিই আবার যে ধাঁধার মধ্যে কোন প্রশ্ন নেই তাও ধাঁধা হতে পারে না।" (ড. শীলা বসাক, বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়)

বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চযাগীতিতে সন্ধ্যা ভাষার ব্যবহার প্রহেলিকার সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন ধাঁধার ক্ষেত্রেও প্রহেলিকাচ্ছন্ন রূপ দেখা যায়। তবে বাংলা ধাঁধাগুলি অনেকখানি চিরন্তন বাঙালি জীবনের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সমাজজীবনের পরিবর্তনের

সঙ্গে সাহিত্যে ধাঁধার ব্যবহারেরও বিবর্তন ঘটেছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে ধাঁধা ব্যবহারের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের গোলাহাট পালায় দেখা যায় সুরিক্ষার কৌশলে লাউসেন ও কর্পূর সেন বন্দী হয় এবং সেখানে মুক্তির শর্ত হিসেবে সুরিক্ষা কতকগুলি ধাঁধার উত্তর জানতে চেয়েছে। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় ধাঁধাগুলির সঠিক উত্তর প্রদান করে সুরিক্ষা কবল থেকে মুক্ত হয়েছে। ধাঁধাগুলি নিম্নরূপ-

১। কটিতে ঘাঘর ঘন রুনু ঝুনু বাজে।

কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে।।

সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা।

আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা।।

বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে ।

জনেক পুরুষ তার জট ধরে টানে।।

সুরিক্ষা কহেন কহ হেঁয়ালির সন্ধি।

বিরল বাটে বন পালাল জলজন্তু বন্দী।।

এর উত্তর শোনা যায় কর্পূরের মুখে- ‘কপূর কহেন এই ধীবরের জাল।’

২। অপর বলিছে নট বচন প্রবন্ধ।

যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ।।

গৃহস্থ জনার মৃত্যু গৃহ সাঙ্গ হলে।

উত্তর - তসর গুটির কৃমি লাউসেন বলে।।

৩। কমলে কমলরিপু জন্ম লয়ে উঠে।

দেবতার মাথার মুকুটে বৈসে ছুটে।।

উত্তর - সেন বলে সিন্ধুভর সেই অর্ধ চাঁদ।

৪। যার গর্ভে জন্ম লয় নাহি তারে মায়া।

জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া।।

বাসিনা সম্বল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।

আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ।।

সবার সে হিত করে নয় দুষ্ট ঠক।

উত্তর - কর্পূর কহেন এই জ্বলন্ত পাবক।। (আগুন)

৫। সুরিক্ষা কহেন শুন পুনঃ ওহে রায়।

জীবজন্তু নহে কিন্তু তপ্ত তপ্ত খায়।।

না পাইলে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকে।

খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি ডাকে।।

পেটের ভরে বমন করে গুঁজে নাকে মুখে।

নারীগুলা গলায় গেলায় বসে বুকে।।

যদি তায় নাহি খায় করয়ে প্রহার।

এর উত্তর - কর্পূর কহেন অবীরার কণ্ঠহার।। (চরকা)

এইভাবে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ধাঁধা না হেঁয়ালি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রবাদ-প্রবচন :

'প্রবাদ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল প্রচলিত কথা বা জনশ্রুতি। রসসংযুক্ত ব্যঞ্জনাময় সরল ও সংক্ষিপ্ত বাস্তব জীবন সংবলিত উপাদান নিয়েই প্রবাদ প্রবচনগুলি নির্মিত

হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে- “প্রবাদ গোষ্ঠী জীবনের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি।” কিংবা আরও বলেছেন- “প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দৈনন্দিন জীবন ঘটিত কোনোরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা মনের গভীর অনুভূতি থেকে জাত সহজ ভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাধর্মী প্রচলিত বাক্য, যা প্রবাদ নামে পরিচিত। মানব সমাজের উদ্ভব লগ্ন থেকেই প্রবাদের সৃষ্টি বলে অনুমান করা হয়। তাই প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহারের দিক থেকেও ঋগ্বেদ-ই ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যেও আদি রচনা চর্যাগীতি থেকেই প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। যেমন বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে প্রবাদ-প্রবচন-

“দৈবের নির্বন্ধ কভু খন্ডন না যায়।”

কিংবা

“বিধির নিবর্বন্ধ কভু না যায় খন্ডন।”

এ প্রসঙ্গে স্মরণে আসে বড়ু চন্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবচন-

‘ললাট লিখিত খন্ডণ না জাত্র’।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যেও বিধৃত প্রবাদ-প্রবচনের দু-একটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন-

“পিপিড়ার পাক উঠে মরিবার তরে”

কিংবা

“খই হইআ ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ।”

মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গল- এর ন্যায় ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যেও প্রবাদ-প্রবচনের বিশেষ ব্যবহার

দেখা যায়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে উল্লেখিত কয়েকটি প্রবচন নিচে দেওয়া হল-

১। অশ্বথামা হত ইতি গজ বলে শেষে।

ধর্মপুত্র ঠেকিল তথাপি কর্ম দোষে।

২। কেবা সে বামন হয়ে হাত বাড়ায় চাঁদে।

৩। মিছা বাণী সেঁচা পানি কতক্ষণ রয়।

৪। না পারে খন্ডাতে লোক কপালের দোষ।

৫। সকলি ভোজের বাজি মিছা অনুরাগ।।

অবিশ্বাসে বিশ্বাস অবশ্য মন্দ ফলে।

৬। মরিবার ঔষধ ভূপতি বান্ধে গলে।

৭। যমের দোসর সঙ্গে নিজ নিজ সেনা।

গ) চিঠি-পত্রাদির প্রয়োগ :

ঘনরাম তাঁর কাব্যে নতুনত্বের সঞ্চার ঘটাবার প্রয়াস নিয়েছেন। তাঁর বৃহদায়তন কাব্যে ধাঁধা বা হেঁয়ালি এবং প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারের পাশাপাশি চিঠি পত্রাদির ব্যবহার প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য। আধুনিক সাহিত্যে পত্র ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পত্র ব্যবহারের বিশেষ গুরুত্ব দেখা যায়। ঘনরাম মধ্যযুগের কবি হলেও তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে সুচারু ভাবে পত্র ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'কানড়ার বিবাহ পালা'তে উল্লেখিত লাউসেনের উদ্দেশ্যে লেখা গৌড়েশ্বরের পত্রের কথা উল্লেখ করা যায়-

'প্রথমে লিখনে স্বস্তি সবর্বগুণান্বিত।

প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত।।

শ্রীযুক্ত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।

পরম সুভাষী রাশী বিজ্ঞাপন পত্রে।।'

এছাড়া 'পশ্চিম উদয় পালা'তে কলিঙ্গার উদ্দেশ্যে লাউসেনের একটি পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। পত্রগুলির বিশেষত্ব হল পত্রের প্রথমে সম্বোধন ও কল্যাণ কামনা এবং শেষে তারিখ সম্বলিত প্রেরকের স্বাক্ষর।

১৪.৫: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের ছন্দ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্পাদনাকালে ভূমিকা অংশে কাব্যটির ঐতিহাসিকতা, কবিকল্পনা, চরিত্র চিত্রণ, কবি প্রতিভার সার্বিক বিচার করে প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন- "ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে এক অপূর্ব রত্ন"। একথা যথার্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ধমান জেলার অন্যতম কবি ঘনরামের কবি প্রতিভা স্বীকার করেও বলা যায়, মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী কাব্য রচনা করলেও নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সুপণ্ডিত হয়েও ঘনরাম সরল বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার প্রয়াস নিয়েছেন। তবে তাতে সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, দেশজ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এরমধ্যে ঘনরামের কাব্যের বিচার করতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন - "ঘনরামের কাব্যের প্রধান গুণ স্বাচ্ছন্দ্য ...।" কাব্যের ছন্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সেই স্বাচ্ছন্দ্য কবি প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ছন্দ প্রয়োগের কতকগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। মূলতঃ মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দরীতি নির্ভর ছন্দ যাতে পয়ারের সুস্পষ্ট সুর শোনা যায়। এরমধ্যে বৈচিত্র্য-

ক) একাবলী প্রয়োগ-

ভক্তের কারণে করহ শ্রম।

কোকিল ইন্দ্র তার হবে যম।।

খ) দ্বিপদী পয়ার ছন্দের প্রয়োগ-

ধর্ম বলি পাছে কেহ/না করে মাননা। = ৮+৬

আপনি করেন প্রভু/এসব ভাবনা।। = ৮+৬

গ) লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ-

পুরাণ ভারত/ শুনে যে নিযত/

ভবে এত নাই মনে / = ৬+৬+৮

রাজা দশরথ/বুদ্ধি হল্য হত /

পুত্রে পাঠাইয়া বনে।। = ৬+৬+৮

এখানে উল্লেখ করা যায় যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দ্বিপদী পয়ার হিসেবেও অংশটি তুলে ধরেছেন-

শ্রীরামে পাঠায়ে বনে /রাজা দশরথ। = ৮+৬

পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজি/পেলে স্বর্গপথ ।।= ৮+৬

ঘ) দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ-

ধর্ম ইতিহাস মতে/রঞ্জাবতী জোড় হাতে।

প্রাণনাথে করে নিবেদন। = ৮+৮+ ১০

নারীসঙ্গে পরপতি/কাননে ভ্রমনে নিতি।

দুঃখমতি পুত্রের কারণ।। = ৮+৮+ ১০

(হরিশচন্দ্র পালা)

১৪.৬: ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে অলংকার ও চিত্রকল্প

মধ্যযুগের শেষভাগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর সুবিশাল রাঢ়ের জাতীয় কাব্য ধর্মমঙ্গলে পাখ-পাখালির বর্ণনায় সুন্দর চিত্ররূপ তুলে ধরেছেন-

কাক কঞ্চ কোকিল কৌতুকে কাল পেঁচা।

খঞ্জনী খঞ্জন খগ আর কাদা খোঁচা।।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল অ্যাডভেঞ্চারধর্মী বীর রসের কাব্য। তাই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ কাহিনীর বার বার বর্ণনা দেখা যায়। বীর লাউসেনের বীর সেনাপতি কালু মদ্যপান করে অবহেলা করছে, অন্যদিকে লাউসেন স্বয়ং পশ্চিমোদয়-এর জন্য হাকন্দ যাত্রা করেছে। কালুর বীরাঙ্গনা পত্নী লখাই ময়নার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে গৌড়ের মহামন্ত্রী মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে এবং সদর্পে ঘোষণা করেছে-

বীরের বণিতা আমি লখে মোর নাম।

বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।

তেজস্বিনী নারীর উক্তি সংগ্রামের চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে। রঞ্জাবতীর বিবাহ পালাতে রঞ্জাবতীর বিবাহ প্রস্তাব নিন্দিত হয়েছে এবং দৈবকী-উগ্রসেনের প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সুন্দর চিত্রকল্প ফুটে উঠেছে-

দৈবকী হইলা রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।

সবংশে করিতে ধবংস কংসরূগী আমি।।

ঘনরামের কাব্যের নানা গুণ বিশেষভাবে কাব্যে অলংকারের সাবলীল ব্যবহার দেখা যায়। ঘনরামের কাব্যে মার্জিত ভাষায় অলংকরণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাসের বিশেষ প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

উদাহরণ- (১) ঘোর বরে ঘু ঘু যেন ঘনঘন ডাকে।

চঞ্চল চড়ুই চিল লিখে চক্রবাকে।।

(২) টনা টান ঠন্ ঠন্ ঢাল ঢাল চন্ চন্

ঝানঝন ঘন রণনাদ।

শেষোক্ত অনুপ্রাসটিতে যুদ্ধ বর্ণনার চিত্র হিসেবে কবি ভারতচন্দ্রের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিংবা আরও অনুপ্রাসের প্রয়োগ-

(৩) ঘন রণ দামামা দগড়ে পড়ে কাঠি।

তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটি।।

(৪) ছেকানুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ-

অকারাদি ক কারান্ত জানা হৈল স্বর।

ক কারাদি ক্ষ কারান্ত হল বর্ণাপর।।

(লাউসেনের জন্ম পালা)

(৫) লাটানুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ-

সুপরম শুভাশী লিখিল বিজ্ঞাপন।

তোমার কল্যাণ মোর কল্যাণ কারণ।।

(কানড়ার বিবাহ পালা)

এছাড়া যমক অলংকারের প্রয়োগও দেখা যায়-

শ্রীধর্ম্মদাসের দাস আমি অতি দীন।

পরনারী দেখিলে বিমুখ হয়ে চলি।।

লাউসেন-এর গৌড়যাত্রা প্রসঙ্গে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়-

গোবিন্দ ছাড়িয়া যেন যাইতে গোকুল।

গোপিনী সকল শোকে কান্দিয়া ব্যাকুল।।

সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।

যেন চিত্তপুত্তলি সেনের মুখে চেয়ে।।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলংকার-

রামাই নামেতে পণ্ডিত পবিত্র কায়।

রক্তবর্ণের তাম্র কড়েতে চড়ায়।।

এছাড়া শ্লেষ, বক্রোক্তি, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকারের ব্যবহার দেখা যায় ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে।

১৪.৭: অনুশীলনী

১। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী পরিচয় দিন।

২। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের চরিত্র-চিত্রন কতদূর সফল আলোচনা করুন।

৩। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সমাজ চিত্রের পরিচয় দিন।

৪। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাব্য ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগের পরিচয় দিন।

১৪.৮: গ্রন্থপঞ্জি

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন

২. শ্রীধর্মমঙ্গল - শ্রী যোগেশচন্দ্র বসু

৩. মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস- ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য

৪. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস - ক্ষেত্র গুপ্ত

৫. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৬. ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল - পীযূষ কান্তি মহাপাত্র

৭. বাঙালির ইতিহাস:আদি পর্ব - নীহাররঞ্জন রায়

৮. বাংলা সাহিত্য পরিচয় - ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৯. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত - ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১১. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পুরুষ - ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়